হাওড়া জেলার ইতিহাস

[প্রথম খণ্ড]

অচলভট্টাচার্য্য

শিবা এণ্ড কোং

১০/১, জি. টি. রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১

হাওড়া জেলার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)

অচল ভট্টাচার্য্য
১০/১, হেম ব্যানার্জী লেন, হাওড়া-৭১১ ১০২

প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারী ১৯৮০

মুদ্রক—শশধর রায়
বিবরণ প্রেস
৩৩/৪, দীনু লেন, কদমতলা,
হাওড়া-৭১১ ১০১

প্রকাশিকা—অন্নপূর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়
শিবা এণ্ড কোং
১০/১, জি. টি. রোড, হাওড়া-৭১১ ১০[illegible]

প্রচ্ছদ—বিকাশ ভট্টাচার্য

পরিবেশক—পুস্তক বিপণী
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—আর্থিক প্রসঙ্গ

শ্রীজগৎ মজুমদার
সম্পাদক—সাহিত্য ভারতী

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক—নিঃসঙ্গ অবসরে

শ্রীআভাস মজুমদার
সম্পাদক—সাহিত্য বাণী

এবং

ডাঃ শম্ভু চরণ পাল, সম্পাদক—হাওড়া বার্ত্তা

মহাশয়গণের করকমলে

যাঁদের পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে

হাওড়া জেলার ইতিহাস

ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলেই

বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

এই লেখকের আরো বই

দেশের ডাক (কিশোর নাটক)

শরৎ চন্দ্র } জীবন নাট্য
সুকান্ত }

অন্ধকারের জাহাজ (ঐতিহাসিক গল্প সংকলন

তিনটি একাঙ্ক নাটক

সবিনয়-নিবেদন

হাওড়ায় স্থায়ীভাবে বাস শুরু করা, হাওড়া-বার্ত্তা পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল মহাশয়ের অনুরোধে তাঁর পত্রিকার নিয়মিত লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত হওয়া এবং নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের হাওড়া-শাখার যুগ্ম-সম্পাদকের পদে বৃত হওয়া—এই তিনটি ঘটনাই আমাকে হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত করে। প্রথম যখন কাজ শুরু করি তখন এর ব্যাপকতা সম্যক অনুভব করতে পারিনি। একমাত্র কলিকাতা ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে ছোট জেলা হাওড়া, কিন্তু বিশাল এর ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক প্রেক্ষাপট। বিচিত্র তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগৎ। একদা ব্রিটিশ ভারতের এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীর বিপরীত হাওড়ার অবস্থান যেন প্রায় সর্ববিষয়েই তাকে কলিকাতার বিপরীত করে তুলেছে। কলিকাতা ও হাওড়া, গঙ্গানদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের এই শহর দু'টি "ইস্পাতের-ছাইফেন" দিয়ে যুক্ত হ'লেও দুই নগরীর একই গল্প নয়।

দশটা-পাঁচটা বিশ্বস্ত ভাবে উদরান্নের সংস্থান করার পর যেটুকু সময় উদ্বৃত্ত থাকে তা কোথাও রাস্তাহীন. কোথাও বা অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা সমন্বিত গ্রামের সমবায়ে গঠিত হাওড়া জেলার সর্বত্র ঘুরে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, আবার যেটুকু সংগ্রহ করেছি তারও সবটুকু প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। কারণটা মূলতঃ আর্থিক। তবু যেটুকু প্রকাশিত

হ'ল তা কেবলমাত্র সাহিত্যিক অগ্রজ ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোধ্যায়ের আগ্রহাতিশয্যে ও আনুকুল্যে।

হাওড়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়ণে সেগুলির সাহায্য নেওয়ার পরও তথ্য সংগ্রহের কাজে এত বেশী সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়েছি যে সীমিত পরিসরে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ সম্ভব নয়। তাঁদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে মাত্র কয়েক জনের নাম উল্লেখ করছি। এঁরা হ'লেন—সর্বশ্রী আভাস মজুমদার, সম্পাদক হাওড়া কাহিনী ও সাহিত্যবাণী, প্রবাল রায়—রাউতারা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শাস্ত্রী—ধার্সা, পাঁচুগোপাল রায় রসপুর, আশরাফ আলি মল্লিক—শাঁখরাইল, মুকুল ঘোষাল—মুগকল্যাণ, ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—বলুহাটী, সলিল বসু খড়িয়প, এ. ভি. এ্যামবেট—প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল সেণ্ট টমাস চার্চস্কুল, সুনীল দাস—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রতন দাস—কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, শৈলেন্দ্র নাথ মুখার্জী—নিজবালিয়া, সুদর্শন দাস ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায়—পাঁচলা, অজয় কুমার মিত্র—সহঃ জনসংযোগ আধিকারিক বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন, অভয়া ভট্টাচার্য্য—সারদা, আমতা, সনৎ কুমার বসু ও ভবতারণ বেজ—উঃ গোবিন্দপুর, জগৎ-বল্লভপুর, অজিত দাস—সালকিয়া. নীরেন সেন—বেলুড়, বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়—সাঁত্রাগাছি। তিমথিয়াম হেস্ত্রাম, অধ্যাপক বিশপস্ কলেজ কলিকাতা, সীতাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—বালী বাসুদেব মোশেল—সারেঙ্গা, ডাঃ চন্দন রায় চৌধুরী—শিবপুর, শ্রীনিশীথ রঞ্জন রায়—কিউরেটার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং

কলিকাতার গণেশ লালওয়ানী, বারনীবাস মুর্মু ও কল্যাণ ব্রহ্মচারী।

পাণ্ডুলিপি অবস্থায় গ্রন্থটির অংশবিশেষ পড়ে এবং প্রয়োজন বোধে উপদেশ, নির্দেশ ও তথ্যাদি দিয়ে গ্রন্থকারকে বাধিত করেছেন সর্বশ্রী ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নিমাই সাধন বসু, অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু, হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ প্রণেতা সুধীর কুমার বসু, ডঃ স্বপন বসু, ডঃ অতুল সুর, তারাপদ সাঁতরা, গোপাল চন্দ্র রায় ও আরো অনেকে। এঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

ধারাবাহিক ভাবে গ্রন্থটির অংশ বিশেষ সাহিত্য-ভারতী, আর্থিক-প্রসঙ্গ, নিঃসঙ্গ অবসরে, হাওড়া-কাহিনী, হাওড়া-বার্তা, সাহিত্য-বাণী, ভাবীযুগ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'বার সময় যেসব পাঠক ও পাঠিকা পত্রযোগে লেখককে উৎসাহ দিয়েছেন, গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে যাদের সাহায্য পেয়েছি এই সুযোগে তাঁদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ধন্যবাদ জানাই মানচিত্র অঙ্কনে এবং ব্লক নির্মাণে সহযোগিতার জন্য শ্রীদিলীপ বাগ ও শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যকে।

নির্দিষ্ট সময়ে মুদ্রণ কার্য্য শেষ করার জন্য শ্রীশশধর রায় ও তাঁর দুই সহকর্মীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বিদেশীর দৃষ্টিতে হাওড়া পর্য্যায়ের চিত্রগুলি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্ত্তৃপক্ষের এবং মনসামঙ্গলের পট-চিত্রটি কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের এবং তালপাতায় ছাপা চণ্ডী এবং তুলট কাগজে ছাপা দুর্গাপূজা পদ্ধতির আলোকচিত্র

শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংগৃহীত।

বিভিন্ন জায়গা থেকে সংবাদ-পুষ্প সংগ্রহের যে ইতিহাস-মালিকাটি তৈরী করেছি যদি তা পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় তবেই গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক।

স্বল্পপরিসরের আলোচনায় সকল বিষয়ের প্রতি হয়ত সুবিচার করা সম্ভব হয়নি তাই আমার স্ব-গ্রামী কবি মালাধর বসু'র ভাষায়—

"দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞী,
যদি দোষ থাকে "গ্রন্থে" ক্ষমা ভিক্ষা চাই।"

২৯.২.১৯৮০

১০/১, হেম ব্যানার্জী লেন,
শিবপুর, হাওড়া-২

বিনীত
অচল ভট্টাচার্য্য

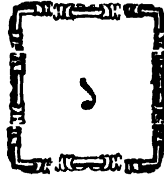
বিষয় সূচী

মানচিত্র সূচী

চিত্র-সূচী



ইতিহাস



হাওড়া নিয়ে হাজার কথা

ইতিহাসের আলোয়—উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ষোলটি জেলার মধ্যে একমাত্র কলকাতা বাদে আর সকলের চেয়ে আয়তনে ছোট হলেও হাওড়ার ইতিহাস কিন্তু ছোট নয়। সে ইতিহাসের শুরু বৃটিশ যুগ, মুঘল যুগ পেরিয়ে একেবারে সেই হিন্দু যুগে। অবশ্য হাওড়া নামে শহর আর জেলার উৎপত্তি একান্তভাবে বৃটিশ আমলে। তাই প্রথমে খোঁজ নিতে হবে হাওড়া শব্দটির উৎপত্তি হল কি করে।

"হাওড়া" এলো কোথা হ'তে

পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর পূর্বতীরে যে সময় কালীঘাট, সুতানটী ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল পশ্চিম পাড়ে

তখন সন্ধান পাওয়া যায় বেতড়, শালিখা, হারির', কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, প্রভৃতি গ্রামের, যেগুলি কালক্রমে অঙ্গীভূত হয়েছে বর্ত্তমান হাওড়া শহরের।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আওরঙ্গজেবের প্রপৌত্র ফারুকশিয়ার যখন দিল্লীর বাদশা এবং দেওয়ান মহম্মদ হাদী যখন আওরঙ্গজেব প্রদত্ত মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি নিয়ে বাংলায় নবাবী ক‹ছেন তখন বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঙ্গানদীর পূর্বতীরের তেত্রিশটি গ্রামের সঙ্গে পশ্চিম তীরের উপরোক্ত পাঁচটি গ্রামের লীজের জন্য বাদশাহ সমীপে আর্জি পেশ করেন। কোম্পানীর কাউন্সিলের বইয়ে গ্রাম পাঁচটির নামের বানান লেখা আছে—Salica, Harrirah, Cassundeah, Ramkrishnapur, এবং Battor.

বার্ষিক খাজনা ১৪৫০ টাকার বিনিময়ে বাদশাহী ফরমান পাওয়া গেলেও বাংলা মুল্লুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা মুর্শিদকুলী খাঁর নির্দেশে জমিদারেরা ইংরাজদের গ্রাম পাঁচটির অধিকার দিতে অস্বীকার করায় বাদশাহী ফরমান অনুযায়ী লীজ কার্যকর হয়নি। বাদশাহের পক্ষেও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। কারণ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই বাংলা নামে মাত্রই দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করত, কার্যত সর্ববিষয়েই স্বাধীন ছিল। এই ঘটনার অনেকদিন পর মীরকাশিম বাংলার নবাব হয়ে যখন বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার ইষ্ট-

ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেন, তখন হাওড়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে বৃটিশ এলাকায় পরিণত হয়। এই সময় হারিরা নামটি বিকৃত বিদেশী উচ্চারণে "হাওড়া"য় পরিণত হ'তে পারে, যেমন বর্দ্ধমান হয় 'বার্ডওয়ান'।

ডাঃ নীহার রঞ্জন রাযের মতে "হাওড়া" কথাটার শেষের "ড়া" শব্দটা দ্রাবিড় ভাষার চিহ্ন, যে ভাষায় "হাওড়" শব্দের অর্থ জলা জায়গা। হাওড়া শহরের একাংশ একসময় দলিলপত্রে পরগণা বোরো বলে উল্লিখিত হত। বোরো শব্দের অর্থ জলমগ্ন জায়গা। মালীপাঁচঘড়ার নিকট একটি বৃহৎ কর্দমাক্ত অঞ্চলটির সাধারণ অভিধেয় ছিল "হাওড়"। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শুধু হাওড়া শহরের অন্তর্গত ৮২ বঃ মাইল এলাকায় খানা ডোবার সংখ্যা ছিল ১৮০০টি। বাংলায় আর্যবসতি বিস্তারের পূর্বে যে আদিম অধিবাসীদের সন্ধান পাওয়া যায়, তারমধ্যে দ্রাবিড জাতির লোকেরাই হয়ত এ অঞ্চলে ছিল সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং অসংখ্য খাল, বিল, দহ, ডোবা ও জলা জায়গার অস্তিত্বহেতু দেশটির নামকরণ করেছিলেন হাওড়া।

ভাষাচার্য্য ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language গ্রন্থে বাংলা শব্দের 'ড়া' প্রত্যয়টি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন এটি অষ্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠির শব্দ। 'ড়া' প্রত্যয়টির উৎপত্তি 'ওড়াক' শব্দ থেকে হতে পারে—যার অর্থ বাড়ী। জলা জায়গার বাড়ী অর্থে হাওড়া। অর্থাৎ হাওড়+ড়া=হাওড়া। কোল ভাষা

গোষ্ঠীতে 'আড়া' শব্দের অর্থ বাঁধের পাড়। পুকুরের আড়া মানে পুকুরের পাড়—জল ঘিরে রাখার জন্য উঁচু ডাঙ্গা বা বাঁধ। শ্রীসুন্দর কুমার ভৌমিকের উক্ত মত সমর্থন করে শ্রীতারাপদ সাঁতরা সিদ্ধান্ত করেছেন হারিরা নয় অঞ্চলটির নাম ছিল হাড়িয়াড়া—হাড়ি বা হাঁড়া+আড়া—যার অপভ্রংশ হাওড়া।

Habor-এই ইংরাজী কথাটির অর্থ হোচট খাওয়া। এ অঞ্চলের ঝোপ ঝাড়, খানা খন্দে হোচট খেতে খেতে ইংরাজরা হাওড়া নামটি সৃষ্টি করে ফেলেছে কিনা একথা নিশ্চয় করে বলা না গেলেও শব্দটির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমরা যে পদে পদে হোঁচট খাচ্ছি একথা নিশ্চিত।

হাওড়া কি হাবড়া ছিল ?

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ্ ইণ্ডিয়া—বেঙ্গল, ভলুম্ ১ গ্রন্থে জেলাটির নাম Howrah [Habra] District বলে উল্লিখিত হয়েছে।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বেতড় গ্রাম থেকে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। প্রকাশক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকাটির নাম ছিল "হাবড়া হিতকারী।"

১৯১০ খৃষ্টাব্দে কলকাতার ক্রিশ্চান লিটারেচার ফর ইণ্ডিয়া নামক প্রকাশনীর সচিত্র ভারত ভ্রমণ শীর্ষক গ্রন্থ অনুসারে "কলিকাতার পশ্চিমদিকে ভাগীরথীর অপর তীরে হাবড়া।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও হাওড়ায় থাকাকালীন চিঠিপত্রে লিখতেন "হাবড়া।"

এসব সত্ত্বেও মনে হয় হাবড়া'র সাথে হাওড়া'র কোন সম্পর্ক নাই।

হাওড়া জেলা

ভাগীরথীর পশ্চিমকুল যে সময় থেকে বারাণসী সমতুল হয়েছে সে সময় থেকেই হাওড়া সেই গৌরবের অংশভাগী হয়ে আসছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে [আনুমানিক ১৪৯৫ খ্রীঃ] লেখা বিপ্রদাস পিপ্‌লাই-এর মনসামঙ্গল অনুসারে—

ডাহিনে কোতরাং কামারহাটি বামে,
পূর্বেতে আড়িয়াদহ, ঘুষুড়ি পশ্চিমে।

*　　*　　*

তাহার পূর্বকুল বাহি এড়ায় কলকাতা,
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা।

বেতড়, কলকাতা এবং হুগলীর সর্বপ্রথম উল্লেখ এই কাব্যে পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের নৌকাকে ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম থেকে

সাগর সংগমে পৌঁছাবার আগে নদীতীরবর্ত্তী নিম্নলিখিত জায়গা-গুলির পাশ দিয়ে যেতে হয়—

হুগলী, ভাটপাড়া, বোরো, কাকিনাড়া মূলাজোড়া, গারুলিয়া, পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, ইছাপুর, বাঁকিবাজার নিমাইতীর্থ [বৈদ্যবাটি] চানক, মাহেশ, খড়দহ, শ্রীপাট রিষড়া, সুখচর, কোন্নগর কোতরং, কামারহাটি, ঘুষুড়ি, চিত্রপুর, কলিকাতা, বেতড় এবং সবশেষে কালিঘাট।

ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লীর সিংহাসনে যখন আকবর বাদশা আর ইংলণ্ডের সিংহাসনে রাণী এলিজাবেথ আসীন সেই সময়ে লেখা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের [১৫৩৩-১৬০০ খ্রীঃ চণ্ডীমঙ্গলে আছে—

ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়
চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়
কলিকাতা এডাইল বেনিয়ার বালা
বেতড়েতে উতরিল অবসান বেলা।

কলকাতাকে সে সময় সকলেই এড়িয়ে চলত। কারণ গঙ্গা-নদীর পশ্চিমে হাওড়ার দিকে যখন গড়ে উঠেছে বন্দর, শহর ও লোকবসতি, পূবে তখন বনবাদাড় এবং জলাভূমি। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমতীরও যখন ছিল জলা, দহ আর ডোবায় ভর্তি তখনকার হাওড়া কেমন ছিল তার বর্ণনা আজও উপযুক্ত গবেষকের অপেক্ষায় আছে।

ভারতের উত্তরাঞ্চলের অবস্থা হিন্দুযুগে কেমন ছিল সেকথা জানার জন্য যেমন আমাদের গ্রীক অভিযানকারীদের বা বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের লিখে যাওয়া বর্ণনার সাহায্য নিতে হয়, মেগাস্থিনিসের লেখা থেকে যেমন জানতে পারি সে যুগের মগধ সাম্রাজ্যের গৌরব কথা, সেই রকম বাংলার এবং সেই সঙ্গে হাওড়ার পুরা কথা এবং পুরোকথা জানার জন্য তেমনি বিদেশীদের দোরে ধর্ণা না দিয়ে আমাদের উপায় নাই। দেশীয় উপকরণের মধ্যে আছে ধর্মবিষয়ে লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক প্রথা, গ্রাম্যছড়া, প্রবাদবাক্য, পুঁথি, সে যুগের দলিলপত্র, গাজনের গান, মনসার ভাসান এবং স্থানবিশেষের নামকরণ-কাহিনী। আরও কিছু উপকরণ আছে মাটির তলায়—যার কিছুটা বাহুরি আর হরিনারায়ণপুরের মাটি খুঁড়ে বার করা হয়েছে।

আর্যেরা ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে বাংলাদেশে পদার্পণ করেনি, অনেক ঐতিহাসিক এরকম মন্তব্য করেছেন। আনুমানিক খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মাগধীভাষায় রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র অনুসারে মহাবীর বর্ধমান রাঢ়দেশে ধর্মপ্রচারের জন্য এসেছিলেন। রাঢ়দেশে তেরদিন অবস্থানকালে এখানকার অধিবাসীরা তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করে, এমনকি তার প্রতি কুকুর লেলিয়ে দেয়। আচারাঙ্গ সূত্র প্রণেতার মতে রাঢ় বা সুহ্ম নামক দেশটি ছিল হিংস্রপশু ও বন্য মানুষ অধ্যুষিত। পালিভাষায় লেখা বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মহাবংশেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। মহাভারতের

সভাপর্বে ভীমের নিম্নবঙ্গ জয়কালে সেখানকার অধিবাসীদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে। মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠের রচনায় "সুহ্মা-রাঢ়া" বলে একটি শব্দ দেখা যায়, যেটির মর্ম্মার্থ সুহ্ম বা রাঢ় একই ভুভাগের দুই নাম।

ছ'শো খ্রীঃ—পূঃ সুহ্ম ভূমিতে ছিল শামাজাতির বাস। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে শামাজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলই সুম্ম বা সুম্মদেশ।

রাঢ় শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে কিংবা এটির প্রথম প্রয়োগ কে করেন এ সম্পর্কে এখনও সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব না হলেও আধুনিক মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরে দক্ষিণমুখী ভাগীরথী বিধৌত অঞ্চল হ'তে শুরু করে বর্তমান হাওড়া জেলা পর্যন্ত ভূভাগটি ছিল সুহ্ম বা রাঢ়দেশের অন্তর্গত অনেকে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজের বর্ণনা অনুসরণ করে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিশ্ব-কোষে লিখেছেন—বর্ধমান, ২৪-পরগণা, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া এবং মেদিনীপুরের কিছু অংশ দক্ষিণ রাঢ়দেশের অন্তর্গত ছিল মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখা থেকে আরও জানা যায় যে, গঙ্গা-নদীর পূর্বে ও পশ্চিমে লক্ষণাবতী রাজ্যের দু'টি পক্ষ (অংশ) —পূর্বে বারিন্দ বা বারেন্দ্র এবং পশ্চিমে রাঢ় বা বঙ্গদেশ। অপর একটি ঐতিহাসিক মত হ'ল—সেন বংশের রাজত্বকালে রাঢ়দেশের

দু'টি রাষ্ট্রবিভাগ ছিল—(১) বর্দ্ধমানভুক্তি, (২) কঙ্কগ্রাম ভুক্তি। বর্দ্ধমানভুক্তি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল—(ক) উত্তর রাঢ় (খ) দক্ষিণ রাঢ় এবং (গ) পশ্চিম ঘাটিকা। পশ্চিম ঘাটিকা বিভাগটি ছিল গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত অর্থাৎ মোটামুটি বর্ত্তমান হাওড়া জেলা।

বর্ত্তমানে যে ভুভাগটি হাওড়া জেলা নামে পরিচিত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের মতে সপ্তম শতাব্দীতে সেটি তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অধীন। কিন্তু তাম্রলিপ্ত নামে কোন স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব এসময়ে ছিল কিনা সেটি সন্দেহের বিষয়। হিউয়েন সাঙের ভারত পর্য্যটন কালে উত্তর ভারতের অধীশ্বর ছিলেন থানেশ্বর রাজ হর্ষবর্ধন, আর পূর্ব ভারতে তখন সগৌরবে রাজত্ব করছিলেন গৌড়রাজ শশাঙ্ক। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা'র মতে [Epigraphia Indica] সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও বর্দ্ধমান থেকে উত্তরে পুরী আর দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত ভুভাগের অধীশ্বর ছিলেন মহারাজ শশাঙ্ক। অতএব নিঃসন্দেহে হাওড়াসহ সমগ্র তাম্রলিপ্তই ছিল মহারাজ শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে শশাঙ্কের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ ৬টি ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি ভাগের নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ। হুগলী, হাওড়া, বর্দ্ধমান জেলার উত্তর ও মধ্যাংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা ছিল কর্ণসুবর্ণ বিভাগের অন্তর্গত। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অনেক দিনের কথা আর জানা যায় না, তবে রাঢ় অঞ্চলাধিপতিই যে ছিলেন হাওড়া এলাকার ভুস্বামী একথা নিশ্চিত।

সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর কোন সময়ে সুহ্ম বা রাঢ় দেশের দক্ষিণাংশে ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের উদ্ভব হয়। দশম শতাব্দীতে ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যে শ্রীধরাচার্য্য নামে একজন ভারত বিখ্যাত দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর রচিত "ন্যায়-কন্দলি" গ্রন্থে ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ পাণ্ডুদাসের উল্লেখ আছে।

একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্রদেব ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য আক্রমণ করে বর্ত্তমান মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলার অধিকাংশ স্থান অধিকার করেন। উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় প্রথম নরপতি চোর-গঙ্গদেব দ্বাদশ শতাব্দীতে আপার মন্দার রাজ্য আক্রমণ করে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার মান্দারণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায় যে, তার বিজয় অভিযানের পথে পড়েছিল বর্ত্তমান উলুবেড়িয়া মহকুমা এবং এর অধিকাংশ স্থান তার রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। উড়িষ্যার জগন্নাথ মন্দিরে রক্ষিত ভূর্জপত্রের পুঁথি থেকে জানা যায় যে, হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমা পর্যন্ত ছিল পরবর্ত্তী এক গঙ্গবংশীয় নরপতি অনঙ্গ ভীমদেবের রাজ্যসীমা আর হাওড়া সদর মহকুমাটি ছিল রাঢ় অঞ্চলাধিপতির অধীন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যার শেষ পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা মুকুন্দদেব হরিচন্দন হাওড়া জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশকে পদদলিত করে হুগলী জেলার ত্রিবেণী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার পাঠান সুলতান সুলেমান কররাণির সেনাপতি তাঁকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করে চিল্কা পর্য্যন্ত এলাকা অধিকার করেন। ঠিক কোন সময়ে সমগ্র হাওড়া জেলা সম্পূর্ণরূপে মুসলিম অধিকার আসে বলা

শত্রু। বাংলায় মুসলিম অনুপ্রবেশকারীরা যে সময় হুগলী জেলার ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রামে পাকাপোক্ত ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসে গেছেন, সে সময়ও ত্রিবেণী বা সপ্তগ্রামের কাছাকাছি অবস্থিত ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।

যখন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) গৌড়-বাংলার সুলতান, তখন উড়িষ্যায় রাজত্ব করছেন প্রতাপরুদ্রদেব—যাঁর রাজত্বকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুরী ভ্রমণ করেন। চৈতন্যদেবের উড়িষ্যা থেকে মেদিনীপুর হয়ে রূপনারায়ণ নদ পেরিয়ে বাংলায় আসার সময়কার হাওড়ার অবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য-ষোড়শ পরিচ্ছেদে।

তবে ওড্র দেশ সীমা প্রভু চলি আইলা।
তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা॥
দিন দুই চারি তেহোঁ করিল সেবন।
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ॥
মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার।
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার॥
পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার।
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার॥
দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে।
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে॥

সুতরাং পিছলদা-ভাগীরথী-রূপনারায়ণ সঙ্গমের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং উলুবেড়িয়া মহকুমার দক্ষিণাংশে অবস্থিত হুগলী নদীর ফোর্ট মর্ণিংটন পয়েন্টের দুই মাইল উত্তর-উত্তর-পূর্বে অবস্থিত পিছলদহ গ্রাম পর্য্যন্ত ছিল গৌড়রাজ হুসেনশাহের রাজ্যের বিস্তৃতি। রূপনারায়ণ নদের অপর পাড় ছিল উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত। বাংলা-উড়িষ্যার সীমান্তবর্ত্তী পিছলদহ গ্রামে ছিল সুলতানী পুলিশ চৌকী।

পাঠান নায়ক সুলেমান কররাণির পুত্র দায়ুদ খাঁর পতনের পর বাংলাদেশে আকবরী শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। হুসেনশাহ মতান্তরে আকবরের আমলে বাংলার বারভূঁইঞাদের অন্যতম যশোররাজ প্রতাপাদিত্য শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কাছাকাছি কোন জায়গায় থানা মাকুয়া নামে একটি মাটির দুর্গ নির্মাণ করান। থানা শব্দের অর্থ সীমান্ত রক্ষার ঘাঁটি। মোঘল আমলের শেষ দিকে ইউরোপীয় জাতি সমূহ যে সময় হুগলী নদীতে আনাগোনা শুরু করেন সে সময় হয়ত এই দুর্গটিই অথবা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে একই জায়গায় তৈরী অপর একটি দুর্গ ইতিহাসের পাতায় স্থানলাভ করে।

আকবরের অন্যতম মন্ত্রী টোডরমল্ল ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ কল্পে যখন বাংলাদেশে জরীপ কার্য্য সমাধা করেন তখন বর্ত্তমানে হাওড়া জেলা হিসাবে পরিচিত অঞ্চলটিকে সাতগাঁও ও সুলাইমানাবাদ এই দুই সরকারে ভাগ করা হয়। L. S. S. O.'Malley এবং Monomohan Chakraborty সম্পাদিত ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে তিনটি আকবরী মহলের বর্ণনা এই রকম—

১। সরকার সাতগাঁও—

ক) পুরা (পরবর্ত্তীকালে বোরো, আরও পরে হাওড়া শহর।)

খ) বালিয়া গ) মজঃফরপুর ঘ) খারর (বর্ত্তমানে খালোড়)

২। সরকার সুলাইমানাবাদ (সুলেমান কররাণির নামানুসারে)—

ঙ) বাসনধরি চ) ভোসাট (বর্ত্তমানে ভুরশুট) ছ) ধার্সা।

৩। সরকার মান্দারণ— জ) মণ্ডলাঘট পরগণা।

টোডর মল্লের জরীপ অনুসারে বোরো বা পুর'র খাজনা ছিল ৬, ৫২, ৪৭০ দাম। [৪০ দাম=১ টাকা]। ১৭৬৫ তে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী পাওয়ার সময় এটি ছিল মহম্মদ আমিনপুর জমিদারীর চাকলা হুগলীর অন্তর্গত। ব্রিটিশ আমলে একসময় কায়স্থ বংশীয় রামেশ্বরের অধস্তন বাঁশবেড়িয়া এবং সেওড়াফুলির জমিদারেরা ছিলেন এলাকাটির জমিদার।

আবুল ফজল কৃত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ অনুসারে সরকার সাতগাঁও ৫৩টি মহলে বিভক্ত ছিল। হরিপদ কেরানীর কলমের খোঁচায় আকবরী আমলের মহলগুলির নামে এযাবৎ বহু পরিবর্তন ঘটলেও একটি মহলের নাম আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে, সেই নাম সালকিয়া।

কালক্রমে সুলাইমানাবাদ সরকারের অন্তর্গত ভুরশুটরাজ্য স্বাধীনতা হারিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের করদ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। এইভাবে হাওড়ার একমাত্র স্বাধীন রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

মুঘল যুগের ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন প্রতাপ নারায়ণ। প্রতাপ নারায়ণের রাজসভায় বহু জ্ঞানীগুনীর সমাবেশ ঘটেছিল। তার মৃত্যুর পরই ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দ্র রাজ্যটি গ্রাস করেন। জেলায় অপর কোন প্রভাবশালী রাজা ত দূরের কথা জমিদারের উল্লেখও ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। যে সব ছোটখাট জমিদার ছিলেন তারা সকলেই বিনা আপত্তিতে মুঘল ফৌজদারদের সালাম জানাতেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারত-ইউরোপ যাতায়াত ব্যবস্থায় একটি যুগান্তরকারী পরিবর্তন ঘটে—আফ্রিকা মহাদেশের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে। এই পরিবর্তনের ঢেউ পূর্বভারতে প্রথম আছাড় খায় হাওড়া জেলায়। নবাবিষ্কৃত জলপথ বেয়ে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাংলায় ব্যবসা করতে প্রথমে আসে পর্তুগীজরা। পর্তুগীজদের প্রথম ঘাঁটি ছিল বেতড়। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে ভেনেসিয়ান নাবিক সিজার ফেড্রিক হাওড়ায় এসেছিলেন। তার লেখা থেকে সেকালের বেতড়ের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। ফেড্রিক সাহেবের মতে বেতড় ছিল সপ্তগ্রামের সহায়ক বন্দর। কলকাতায় ঘর তোলায় আগে শেঠ-বসাকদের বাসস্থান ছিল বেতড় গ্রাম। ব্রিটিশ ইণ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর উৎসাহেই এঁরা গঙ্গা পেরিয়ে কলকাতায় আসেন। ব্যবসাপত্র বাড়লে পর্তুগীজরা ক্রমে শালকেতে একটি ঘাঁটি করে।

পর্তুগীজরা যে সময় মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাংলায় বাণিজ্য করতে আসে, অপর কোন ইউরোপীয় দেশ সে সময় বাংলার বন্দরে জাহাজ ভেড়াবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। তবু পর্তুগীজদের জাহাজগুলি সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত না গিয়ে বেতোড়ে এসেই থেমে গেল কেন উত্তরকালের মানুষদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে স্মরণ করেই সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে সিজার ফ্রেডরিক [Ceasar Frederici] লিখে গেছেন, বেতোড়ের কাছে সরস্বতী ও দামোদরের জলধারা গঙ্গায় পড়ে ব-দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। পর্তুগীজদের সমুদ্রগামী জাহাজগুলি নদীপথে আর এগোবার সুযোগ না পেয়ে সেখানেই নোঙর করত। কেবলমাত্র ছোট ছোট জলযানগুলিই সপ্তগ্রাম বন্দরে যেত।

কয়েক বছরের মধ্যেই পর্তুগীজদের অনুসরণ করে ক্রমে ক্রমে ডাচ্ ইংরাজ, ফরাসীরাও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গঙ্গাজল স্পর্শ করতে শুরু করে। ফলে কলকাতার দিকে সুতানটীর ঘাটে একটা-দুটো করে জাহাজ ভেড়া শুরু হল। গঙ্গার পূবপাড়ে পথ বলতে তখন মাত্র একচিলতে আঁকাবাঁকা রাস্তা, উত্তরকালে যেটির নামকরণ হয় চিৎপুর রোড। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে তার অনেক আগে থেকেই পাঞ্জাব পর্য্যন্ত রাজপথ তৈরী করে গেছেন শেরশাহ। তৈরী হওয়ার সময় রাস্তাটির নামকরণ হয়েছিল সড়ক-ই-আজম, এখন গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। সবচেয়ে আগে আসা সত্ত্বেও পর্তুগীজরা ব্যবসাতে সুবিধা করতে পারল না। ব্যবসা করে বড়লোক হতে

না পেয়ে তারা জলদস্যুতা করে পয়সা রোজগারের পথ ধরল। বাংলার আরও অনেক জেলার মতন হাওড়ার লোকজনেরাও বিদেশী জলদস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। নদী তীরবর্ত্তী ৪০।৫০ লীগ দূরের গ্রাম থেকেও লোক ধরে এনে বিদেশী জলদস্যুরা উড়িষ্যা ও দক্ষিণাত্যের বন্দরগুলিতে ইংরাজ ও ফরাসীদের কাছে বিক্রী করত। এই কাজে পর্তুগীজরা আরাকাণী মগদের কাছ থেকে প্রচুর সাহায্য পেত।

একসময় হাওড়ার বাতাসে ভাসমান পর্তুগীজ অনাচারের কথা অনেক পথ পেরিয়ে দিল্লীতে বাদশাহের কানে গিয়ে পৌছাল। শাজাহান বাদশা তখন এই মুল্লুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস। বাদশাহী ফরমান বেরুল—কাশিম খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হল। এটি প্রকাশ্য দরবারের ঘোষণা। আড়ালে ডেকে নিয়ে বাদশাহ কাশিম খাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দেন কি কাজের জন্য তাকে বাংলায় পাঠান হচ্ছে—হুগলীর কুঠি দখল করে পর্তুগীজদের ধ্বংস করবে, সাদা চামড়ার স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলকে বন্দী করে দিল্লীর দরবারে পাঠাবে, হয় মুসলমান নয় ক্রীতদাস করে।

কাশিম খাঁ বাদশাহী নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কাজে যোগ্যতার পরিচয় দেন। বাংলা মুল্লুকে পা দিয়ে তিনি দেখলেন, পর্তুগীজরা যত না স্থলচর, তার চেয়ে বেশী জলচর।

ডাঙ্গায় তাদের আড্ডা ভাঙ্গলে, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে করে নদী পেরিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। তাতে তাদের তাড়ানো যাবে, কিন্তু ধ্বংস করা যাবে না। বাদশাহী নির্দেশ মত পর্তুগীজদের ধ্বংস করার জন্য কাশিম খাঁ হুগলী থেকে কিছু দূরে ডাঙ্গায় সৈন্য সমাবেশ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যতক্ষণ না পরিকল্পনা মাফিক ঢাকার [বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী] দক্ষিণে শ্রীপুর থেকে ঈশা খাঁর [আকবরী আমলে বারভুঁইঞার এক ভুঁইঞা] নাতি মাসুম খাঁ পরিচালিত নৌ-বহর কলকাতার দশমাইল দক্ষিণে সাঁকরাইলে এসে পৌছায়। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন মাসুম খাঁ সাঁকরাইলে আসার পর, নৌকোর সেতু তৈরী করে মোগল বাহিনী নদী পার হয়ে বেঁতোড় থেকে হুগলীর দিকে নদীর দু'পাশে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে কামান সাজিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় বসে যায়। অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসাবে ডাঙ্গার এপাড় থেকে ওপাড় পর্য্যন্ত লোহার শেকলও বাঁধা হয়। পর্তুগীজ জাহাজের সমুদ্র যাত্রার পথ বন্ধ করে কাশিম খাঁ হুগলীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৫ই সেপ্টেম্বর শহরটি দখল করেন।

হুগলীর পর্তুগীজ ঘাঁটি ধ্বংস হল। কাশিম খাঁ বাদশাহের মর্য্যাদা বাড়ালেন। কিন্তু হাওড়ার মানুষকে স্বস্তি দিতে পারলেন না। নদী তীরবর্তী গ্রামগুলি থেকে মানুষ চুরি করা পুরোদমে চলতে লাগল।

জলদস্যুদের দমনের জন্য ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেন এলাকায় অবস্থিত মেকিয়া কেল্লা বা থানা মাকুয়া দুর্গটিকে মজবুত করে গড়া হয়। Valentijn-এর ম্যাপে দুর্গটির উল্লেখ আছে। ষ্ট্রেনসাম মাষ্টার [Streynsham Master] এটিকে ফোর্ট ট্যাম্নি বলে উল্লেখ করেছেন। এই দুর্গও হাওড়া বাসীদের শান্তি দিতে পারেনি। অবস্থা এমন পর্য্যায় পৌঁছায় যে, দুর্গের দক্ষিণে নদীতে কেউ চান করতে বা রাত্রে আলো জ্বালাতে সাহস পেত না। মেকিয়া বা মাকুয়া কেল্লায় মুঘল সৈন্যরা পাহারা দেওয়া শুরু করার বিশ বছর পর বাংলার শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁর সাথে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য ব্যাপারে বিবাদ চরমে ওঠে। এবার পর্তুগীজ নয় ইংরাজ।

এসময় দেশব্যাপী আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ও নবাব সরকারের মোগল কর্মচারীদের অবৈধ অর্থ চাহিদা মেটাতে গিয়ে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কারবারে লালবাতি জ্বলার উপক্রম হয়। কোম্পানীর এজেন্ট উইলিয়াম হেজেস ব্যবসা বাণিজ্যের অচলাবস্থা অবসানের আলোচনা চালাবার জন্য ঢাকায় গিয়ে শায়েস্তা খাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আলোচনা নিষ্ফল হয়। এদিকে নবাবের কর্মচারীরা ক্রমাগত কোম্পানীর নৌকা আটক করে মালপত্র ক্রোক করতে থাকায় হুগলীতে মুঘল-ইংরাজ সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে হেরে গিয়ে ইংরাজরা প্রথমে সুতানটী পরে আরও দক্ষিণে উলুবেড়িয়াতে এসে আশ্রয় নেয়। পালিয়ে আসার পথেও

কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক সাহেব শত্রুকে জব্দ করতে ছাড়েন নি। শালকের সরকারী নূনের গোলা ধ্বংস করে শিবপুরের থানা দুর্গ থেকে মুঘল সৈন্যদের বিতাড়ন করে উলুবেড়িয়ায় নেমে তিনি এখানেই নতুন করে ঘাঁটি করা যায় কিনা চিন্তা করতে লাগলেন। ১৬৮৭ খ্রীঃ -এ নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের সন্ধি হলে তারা উলুবেড়িয়ায় কুঠি ও ডক তৈরীর অনুমতি পায়। ইতিমধ্যে জব চার্ণকও মনে মনে উলুবেড়িয়াকে বাংলায় ইংরাজদের প্রধান কর্মকেন্দ্র করার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলেছিলেন। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে হলফ্ করে বলা না গেলেও অনুমান করা যায় রাইটার্স বিল্ডিং আর বিধানসভা কলকাতার বদলে হাওড়াতেই তৈরী হ'ত আর প্রতিদিন সকালবেলা হাওড়া ষ্টেশন থেকে অফিস যাত্রী বোঝাই বাসগুলি কলকাতার দিকে না গিয়ে উলুবেড়িয়ার পথে ছুটত। কিন্তু আওরঙ্গজেবের নির্দেশে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ যেদিন জব চার্ণককে আবার সুতানটী গ্রামে ফিরে আসার জন্য ডেকে পাঠালেন, সেদিন সৌভাগ্য সূর্য্য পূর্বে কলকাতার দিকে উঠল, পশ্চিমে হাওড়ার দিকে অস্ত গেল।

পূর্ব পরিকল্পনা নাকচ করে দিয়ে বেঙ্গল কাউন্সিলও উলুবেড়িয়ার বদলে সুতানটীর পক্ষে মত প্রকাশ করে লেখেন—
Our General Letter by the Beaufort and Diaris of that year where in we have laid down our reasons for the altering our opinion about

ulubarreah and pitching on chuttanuttee as the best and fittest up the river on the Maine, as we have since experienced and like-wise been satisfied that ulubarreah was misrepresented to us by those sent to survey it.

কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মত ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট লোক-লস্কর, গোলা-বারুদ, কামান-বন্দুক, নৌকা-জাহাজ বোঝাই করে জব চার্ণক উলুবেড়িয়া ছেড়ে আবার সুতানটী গ্রামে ফিরে এলেন।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল চন্দ্রকোনা মহকুমার চেটো-বরদার জমিদার শোভা সিংহ যে সময় মুঘল রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বর্দ্ধমান শহর লুণ্ঠন ও রাজস্ব আদায়কারী রাজা কৃষ্ণরামকে হত্যা করেন সে সময় একবার হাওড়ার একাংশে অশান্তির ছায়া পড়ে। হুগলী দখল করতে না পারলেও শোভা সিংহের ১৮০ মাইল লম্বা রাজ্যখণ্ডের মধ্যে হাওড়া জেলার বহু গ্রাম ছিল। অবশ্য অল্প দিনের মধ্যেই রাজা কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতীর হাতে শোভা সিংহ নিহত হলে বিদ্রোহের অবসান ঘটে।

দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ ও নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে ১২ বছরের মধ্যে বাংলার ভূমিরাজস্ব দু'বার নতুন করে ঠিক করা হয়। রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য উলুবেড়িয়া মহকুমা

ও হাওড়া সদর মহকুমার বেশির ভাগ গ্রাম বর্ধমান জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হাওড়া সদর মহকুমার অবশিষ্ট অংশ অঙ্গীভূত হয় হুগলী জেলায় অবস্থিত মহম্মদ আমিনপুর নামক জমিদারীর।

১৭৪১-৪২ খ্রীঃ -এ মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণে রাজমহল থেকে মেদিনীপুর এবং জলেশ্বর পর্যন্ত ভূভাগ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। মেদিনীপুর যাওয়ার পথে মারাঠা সৈন্য হাওড়া সদর মহকুমা ও থানা মাকুয়া অধিকার করে। বর্গীর ভয়ে বহু হাওড়াবাসী নদী পার হয়ে ২৪-পরগণা জেলায় আশ্রয় নেয়।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন ইংরাজদের দমনের জন্য নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতায় আসেন। সিরাজের হাতে হেরে পালাবার পথে ইংরাজরা মেকিয়া কেল্লা দখল করে। কেল্লা দখল করা সম্পর্কে ১৭৫৭ খ্রীঃ -এর ১লা ফেব্রুয়ারী লেখা প্রত্যক্ষদর্শী এক ইংরাজ কর্মচারীর চিঠির অংশ বিশেষ—We sailed from Tanna Forts about two miles below Calcutta the 1st of January, but they abandoned them on our approach. The salisbury was left a guard-ship there.

জলদস্যুর উৎপাত, বর্গীর হাঙ্গামা, যুদ্ধ বিগ্রহ সত্ত্বেও হাওড়া জেলার সুলাইমানাবাদ সরকার ছিল সবসময় ধনে জনে সমৃদ্ধশালী।

ফারুকশিয়ারের ফরমান অনুযায়ী হাওড়ার ৫টি গ্রামের লীজ পেলেও দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর বিরোধিতায় ইংরাজরা হাওড়ার মাটিতে শক্ত হয়ে বসতে পারেনি। পলাশীর যুদ্ধের পর নামে নবাবী বজায় থাকলেও কাজে বাংলার ভাগ্যবিধাতা হন ইংরাজরা। তবে হাওড়া পুরোপুরি তাদের কব্জায় আসতে আরও কিছু সময় লাগে। নবাব মীরকাশিম ১৭৬০ -এর ১১ই অক্টোবর যেদিন বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার রাজস্ব আদায়ের ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর দেন তখন হাওড়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত বলে একান্তভাবে ব্রিটিশ এলাকায় পরিণত হয়।

বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা বৃত্তিদানের প্রতিশ্রুতিতে বাদশাহ শাহ আলম ১৭৬৫ খ্রীঃ -এর ১২ই আগষ্ট বিহার উড়িষ্যা সহ সুবা বাংলার দেওয়ানি অর্থাৎ সুবা বা প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় ক্ষমতা কোম্পানীকে দেন। কোম্পানী বর্ধমান জেলায় এই কাজের প্রথম পরিদর্শক (Supervisor) নিযুক্ত করেন ভেরেলেষ্টকে।

১৭৮৭ -তে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য হুগলী জেলার কিছু অংশ বর্দ্ধমান থেকে কেটে নিয়ে যশোর ও নদীয়া জেলার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। হুগলী জেলায় অবস্থিত হাওড়া জেলার কিছু অংশ এই সময় নদীয়ার অন্তর্গত হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় একটি যুগান্তরকারী পরিবর্তন ঘটিয়ে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস মুঘল

যুগের টোডরমল্লের অনুরূপ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অস্থায়ী রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গেই হুগলী জেলার উদ্ভব হয় বর্ধমানের বুক চিরে। বর্ধমান জেলাকে দু'ভাগে ভাগ করে উত্তরাংশকে বর্ধমান এবং দক্ষিণাংশকে হুগলী জেলা নাম দেওয়া হয়। প্রথমে সমগ্র হাওড়া জেলা ছিল হুগলীর মধ্যে। পরে আমতা ও বাগনান থানা থাকে হুগলী জেলায়, হাওড়া যুক্ত হয় কলকাতার সঙ্গে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুর থানা (বর্তমান ডোমজুর) এবং ১৮১৯ খ্রীঃ-এ কোতরা থানা বর্তমান শ্যামপুর) ও উলুবেড়িয়াকে ২৪-পরগণা জেলা থেকে বের করে হুগলী জেলার সঙ্গে যোগ করা হয়। ১৮২২ -এ হুগলী ও হাওড়ার উপর থেকে বর্ধমান কালেক্টরীর কর্তৃত্ব লোপ পায়। ১৮৪৬ -এ হাওড়া, সালকিয়া, বাগনান, রাজপুর, উলুবেড়িয়া, কোতরা এবং আমতা থানা একজন ম্যাজিস্ট্রেটের শাসনাধীন এলাকায় পরিণত হয়। শুরু হয় জেলা হিসাবে হাওড়ার স্বতন্ত্র মর্য্যাদার। ১৮৯৪ -এ সিংটি পুলিশ ফাঁড়ি হাওড়া জেলার অন্তর্গত হয়।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার লেখার সময় ও' ম্যালী সাহেব কাগজপত্র দেখে হিসাব দিয়েছেন জেলাটি পূর্ব-পশ্চিমে ২৮ মাইল এবং উত্তর-দক্ষিণে ৪০ মাইল লম্বা।

উলুবেড়িয়া ও জবচার্ণক

উলুবেড়িয়াকে ঘিরে জবচার্ণক অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু হাওড়া বাসীরা কেউ সে স্বপ্নের ফল উপলব্ধি করতে পারেননি। জবচার্ণক এবং নবাবের বক্সী আবদুল সামাদের মধ্যে যে চুক্তিতে জবচার্ণকের বার দফা দাবী স্বীকার করে নেওয়া হয়, তার একটি হল উলুবেড়িয়ায় কুঠি তৈরীর অধিকার। ঢাকা থেকে ২১, ৭, ১৬৮৭ তারিখের নবাবী পরওয়ানায় এই দাবী স্বীকৃত হয়। ২৭, ৮, ১৬৮৮ তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকবর্গ জবচার্ণককে উলুবেড়িয়ায় কুঠী এবং ফোর্ট সেণ্টজর্জ দুর্গ তৈরীর অনুমতি দিয়ে আশা প্রকাশ করেন, কালক্রমে জায়গাটি হয়ে উঠবে—"a famous and well governed English colony."

জবচার্ণক উলুবেড়িয়ায় কুঠী তৈরীর কাজ শুরু করার পর স্থানীয় অধিবাসীরা নবাব সরকারে আপত্তি পেশ করেন—গঙ্গারতীরে ইংরাজ কুঠী থাকলে মেয়েদের আবরু রক্ষা করা দায়। প্রজাপুঞ্জের দরখাস্ত পাঠমাত্র নবাব সরকার থেকে কুঠী তৈরীর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে বেতড় বন্দরের অবনতি ঘটেছে। আরাকানীমগ জলদস্যুদের উৎপাতে কাপড় ব্যবসায়ীরা বেতড় ছেড়ে সুতানটীতে

এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। সে যুগের ব্যাঙ্কার বা মহাজন শেঠ বসাকরা গোবিন্দপুরে [বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গের নিকট] ঘর বাঁধতে শুরু করে দিয়েছেন। দৈবের বিপাক। এইসময় হাওড়ার দিকে সুমাত্রা নামক একটি জাহাজ ডুবে যায় এবং নদীর পশ্চিম কূলে চড়া পড়া শুরু হয়। জাহাজী কর্ত্তারা রায় দিলেন অগভীর জলে বড় জাহাজ ভেড়ান যায় না, গোবিন্দপুর সুতানটীর দিকেই জাহাজ ভেড়ান সুবিধাজনক, কোম্পানীর মন তখন কেবলমাত্র মুনাফার দিকে। তাই উলুবেড়িয়ার বদলে সুতানটির স্বপক্ষে রায় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি।

জব চার্ণক সাহেব সরকারী নির্দেশ ও উপরওয়ালাদের আদেশ মত উলুবেড়িয়ার কুঠি-বাড়ী পুড়িয়ে সুতানটীতে চলে এলেন। সেই কুঠী-বাড়ী পোড়ান ধোঁয়া—পরবর্ত্তীকালে ভারতের শেফিল্ড বলে চিহ্নিত হলেও—হাওড়াকে আজও কালো করে রেখেছে।

A Historical and Topographical Sketch of Calcutta প্রণেতা H. J. Rainy-র অনুমান গঙ্গার পশ্চিমকূল (হাওড়া) স্বাস্থ্যকর হওয়া সত্ত্বেও বর্গীর হাঙ্গামার আশঙ্কায় ইংরাজরা সুতানটীতে চলে আসেন। কারণ যাই-ই হ'ক, ফল সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত—কলকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি আর হাওড়ার অবনতি।

হাওড়া শহর

উত্তর-দক্ষিণে ৭ মাইল লম্বা ও পূর্ব-পশ্চিমে ১-½ থেকে ২½ মাইল লম্বা হাওড়া শহর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলিকাতার বিপরীত দিকে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে ২১.৩৫০ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৩৮.২১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

চতুঃসীমা—উঃ—বালীপৌরসভা, পূঃ—হুগলীনদী, দঃ—নদী ও বোটানিকেল গার্ডেন, পঃ—বালী মিউনিসিপ্যালিটি, লিলুয়া ইউনিয়নবোর্ড এবং হাওড়া জেলা পরিষদের অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম।

শহরটি পাঁচটি থানায় বিভক্ত—হাওড়া, ব্যাটরা, গোলাবাড়ি, মালিপাঁচঘড়া, এবং শিবপুর [বোটানিকেল গাডেন বাদে]।

রেললাইন শহরটিকে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুইভাগে ভাগ করেছে। উত্তরে আছে ৯টি মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড আর দক্ষিণে ২১টি।

সামগ্রিকভাবে সালকিয়া নামে পরিচিত উত্তরাংশে আছে—ঘুষুড়ী, মালিপাঁচঘড়া দশানি বাগান (ত্রিপুরা রায় লেন সন্নিহিত অঞ্চল), বাঁধাঘাট, হরগঞ্জ, ব্যানার্জীবাগান, বাবুডাঙ্গা, ধর্মতলা, নন্দীবাগান, গোলাবাড়ি, নস্করপাড়া, পিলখানা, ভোটবাগান, বামনগাছি, চাঁদমারি, জেলিয়াপাড়া এবং টিণ্ডেলবাগান।

দক্ষিণাংশে আছে—পঞ্চাননতলা, জোলাপাড়া, উঃ ও দঃ ব্যাঁটরা, কাঁড়ারবাগান (পার্বতী সিনেমা সন্নিহিত এলাকা) কদমতলা, টিকাপাড়া, ঘোলাডাঙ্গা, (হাওড়া হাটের বিপরীত দিকস্থ এলাকা) চক্রবেড়িয়া, বেতড়, সাঁত্রাগাছি, সাতঘড়া, উঃ ও দঃ বাকসারা, নবনারীতলা, চ্যাটার্জীহাট, পদ্মপুকুর, আন্দুল-মাঝের হাট, ভড়পাড়া শ্রীহরি নপাড়া, সানাপাড়া, শালিমার, শিবপুর, বাজে শিবপুর, বেতাইতলা, কাসুন্দিয়া, খুরুট, রামকৃষ্ণপুর এবং তেলকলঘাট।

আবার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে শহরটিকে চারভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে হুগলী থেকে জি. টি. রোড পর্যন্ত কল-কারখানা, ষ্টেশন, গুদাম প্রভৃতির অবস্থান।

দ্বিতীয় ভাগে—নরসিংহ দত্ত রোড, বেলিলিয়াস রোড এবং নেতাজী সুভাষ রোড বরাবর মুখ্যতঃ ছোট কারখানা, দোকান, বস্তি এবং কিছু অভিজাত পল্লী।

তৃতীয় ভাগে আছে উক্ত এলাকার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে অবস্থিত মধ্যবিত্ত পল্লী আর চতুর্থ ভাগে জলা অঞ্চল, যেমন—লিলুয়ার জলা, ডুমুরের জলা, কাসুন্দিয়া জলা, পদ্মপুকুর জলা প্রভৃতি। জলাগুলি ক্রমশঃ ভরাট হয়ে আসছে এবং সেখানে গড়ে উঠছে নতুন বসতি।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বালি, লিলুয়া বালটিকুরী, ব্যাঁটরা, জগাছা প্রভৃতি অঞ্চলগুলি হাওড়া শহরের অংশীদার ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে

উক্ত অঞ্চলগুলি শহর থেকে বাদ পড়ে শহরতলীর সৃষ্টি করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মপুকুর কাসুন্দিয়া এবং ডুমুরের জলাকে শহরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লিলুয়া ইউনিয়নের বেলগাছিয়া, বেলগাছিয়া কিসমেট, বামনগাছি, খালিয়া, কোনা, এবং চকপাড়াকে শহর এলাকার অন্তর্গত করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত বেশী মাত্রায় অনুন্নত বিধায় খালিয়া, কোনা এবং চকপাড়া অঞ্চলকে আবার আবার শহর এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে লিলুয়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগে শহরটি দশটি মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা দশ থেকে বেড়ে হয় তিরিশ।

কলকাতার বুকে ইংরাজরা প্রথম যে দূর্গটি তৈরী করেছিল সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণকালে সেটি ভূমিশয্যা গ্রহন করে। সেই জায়গায় পরবর্তীকালে গড়ে উঠল জেনারেল পোষ্টঅফিস ও রেলঅফিস। হাওড়ায় নবাবের যে দূর্গটি ছিল ইংরাজরা সিরাজের হাতে হেরে কলকাতা থেকে পালাবার পথে আংশিক ভাবে সেটি ধ্বংস করে যায়। পরবর্তীকালে ভাঙা দূর্গের ভিতের উপর গড়ে উঠেছে বোটানিকেল গার্ডেনের সুপারিনটেন্‌ডেন্‌টের কোয়ার্টার।

১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া ময়দানসহ শহরের মধ্যাঞ্চলের ইংরাজ ভুমধ্যাকারী ছিলেন মিঃ লিভেট। কিছুদিন জমিদারী

চালাবার পর লিভেট সাহেব হিসাব করে দেখলেন জমিদারীর আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। তখন তিনি কালবিলম্ব না করে করে জমিদারী থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য কোম্পানীর কাছে দরখাস্ত পেশ করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে কোম্পানী নির্দ্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য প্রজাবিলি করতেন। সে সময় ক্রমাগত কর হার বেশী হ'তে থাকায় বহু প্রজাও মালগুজারি দিতে অপারগ হয়।

শেওড়াফুলীর জমিদার বংশের এক শরিক হাওড়া শহরের জমিদারীর দশআনা অংশ কিনে বালীতে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের এক কর্ত্তা হরিশ্চন্দ্র রায় ছিলেন শূদ্রমণি মনোহর রায়ের বংশধর। মনোহর রায় ছিলেন কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী পাটুলির জমিদার। স্বেচ্ছায় জনৈক ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর বকেয়া খাজনা নবাব সরকারে জমা দিলে মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁকে শূদ্রমণি' উপাধি দেন। অবশিষ্ট ছ' আনা-র জমিদার ছিলেন কালীপ্রসাদ রায়। পরবর্ত্তীকালে শোভাবাজারের রাধাকান্তদেব দশআনা জমিদারীর এবং মাহিয়াড়ীর কুণ্ডুরা ছ' আনা জমিদারীর সালকিয়া অংশটির মালিক হ'ন।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে হাওড়া ময়দান পার হয়ে শালকের দিকে পা বাড়ালে এখন যেখানে রেললাইন পড়ে নবাবী আমলে সে জায়গার কিছু উত্তরে ছিল নবাবের একটি সৈন্য ব্যারাক।

কাছাকাছি জায়গায় ছিল চাঁদমারী। আপজনের ম্যাপে [১৭৯২ ৯৩] জায়গাটিকে বেঙ্গল আর্টিলারীর পূর্বতন অনুশীলন কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করা আছে।

কাছেই চার্চরোড এবং জি. টি. রোডের সংযোগস্থলে একটি গাছের তলা নির্দ্দিষ্ট ছিল অপরাধীদের ফাঁসি দেবার জন্য। জায়গাটির ফাঁসিতলা নামটি আজও লোকমুখে প্রচলিত আছে। চাঁদমারীর দক্ষিণে এবং ফাঁসিতলার উত্তরে পিলখানা। পিলখানায় ছিল নবাবের হাতিশালা।

জি. টি. রোড ও নেতাজী সুভাষ রোডে সংযোগস্থলটি মল্লিক ফটক নামে পরিচিত। মল্লিকরা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে আন্দুল থেকে রামকৃষ্ণপুরে এসে দশআনা জমিদারীর এলাকাভুক্ত কিছু সম্পত্তি কিনে বসবাস শুরু করেন। ফটকটি এই বংশেরই কেউ তৈরী করান। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁদের সম্পত্তি কলকাতার মতিলাল শীলের নিকট বাঁধা পড়ে।

দঃ ব্যাঁটরায় চক্রবর্ত্তীবংশের নরসিংহদেব অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইছাপুর ও আরও তিনটি গ্রামের মালিক হ'ন বার্ষিক একটাকা করে খাজনায়। সাঁত্রাগাছিতে মূলত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের বাস। বিদেশীদের মধ্যে হাওড়ার প্রথম বাসিন্দা আর্মেনিয়ানরা। গঙ্গার ধারে তাদের অনেকগুলি বাগানবাড়ী ছিল।

হাওড়া রেল.ষ্টশনের নিকট ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতা হাওড়া সংযোগকারী একটি ভাসমান সেতুর উদ্বোধন হয়। সেতুটি নৌকার সারির উপর স্থাপিত ছিল। দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৩০ ফুট। ৪৮ ফুট চওড়া গাড়ীর রাস্তা বাদে দু' পাশে ৭ ফুট করে চওড়া ফুটপাথ ছিল। জাহাজ চলাচলের জন্য সেতুটি মাঝে মাঝে খোলা হত। আমাদের চোখের সামনে থেকে ভাসমান সেতু বিদায় নিলেও এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার পাতায় এখনও রয়ে গেছে—

The city (হাওড়া) is opposite Calcutta with which it is connected by a floating bridge.

কলকাতা ও হাওড়া-ভাগীরথীর দুই তীরের এই শহর দু'টি সেতুদ্বারা সংযুক্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হ'লেও আজও বুদা এবং পেষ্ট-এর মতন একাত্ম হ'য়ে বুদাপেষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি।

কয়েকটি প্রাচীন স্থান

[ক] ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজ্য

হাওড়ার একমাত্র স্বাধীন রাজ্য ভুরিশ্রেষ্ঠী বা ভুরিশ্রেষ্ঠ অথবা ভুরশুটের অবস্থান ছিল এই জেলার উত্তর-পশ্চিম এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ জুড়ে, গড়ভবানীপুর, পেঁড়ো,

বসন্তপুর, ডিহিভুবশুট, পাবভুরশুট, দোগাছিয়া প্রভৃতি দামোদরের পশ্চিমতীরবর্তী হাওড়া জেলার গ্রামগুলি এবং হুগলী জেলাস্থ আটপুর, রাজবলহাট, গুলিটা প্রভৃতি গ্রামগুলি ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ভুরি (বহু) শ্রেষ্ঠী (বণিক) 'র বাস হেতু রাজ্যের নাম ভূরিশ্রেষ্ঠী, পাঠান্তরে ভুরশিট, ভুরশুট, ভুবসৃষ্টি, ভুরুন্ট প্রভৃতি। ৯১৩ শকে জনৈক ধীবর শাসনকর্তাকে পরাজিত করে কায়স্থ বংশীয় পাণ্ডুদাস ভুরশুটের রাজা হন। আইন-ই-আকবরীতে দক্ষিণ রাঢ়াধিপতি শূর বংশীয় যামিনী শূরকে (আনুমানিক ৯৬৫-৯৯৫ খ্রীঃ অঃ) যামিনী ভানু বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাণ্ডুদাস ছিলেন যামিনী শূরের সামন্ত রাজা। পাণ্ডুদাস স্থাপিত রাজধানী পাণ্ডুয়া-নগরীর বর্তমান নাম পেঁড়ো। তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন ন্যায় কন্দলি গ্রন্থপ্রণেতা দার্শনিক প্রবর শ্রীধরাচার্য্য। পাণ্ডুদাসেব হীনবল বংশধরগণের হাত থেকে রাজ্যটি অধিকার করেন শনিভাঙর নামক জনৈক জেলে বা বাগদী রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল হুগলী জেলার দিগাকস গ্রামে। কথিত আছে রাজধানীর নিকটবর্তী অরণ্যে এক দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তিনি নরবলি সহকারে পূজা দিতেন। একবার দেবীর সম্মুখে বলির জন্য একটি অষ্টম বর্ষীয় ব্রাহ্মণ বালক নীত হলে শনিভাঙরের কাপালিক গুরুদেব স্নেহবশত তার প্রাণরক্ষা পূর্ব্বক তাকে পুত্রবৎ লালন পালন করেন ও যুদ্ধবিদ্যা শেখান। এই বালকই উত্তরকালে শনিভাঙরকে পরাজিত করে ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজা হন। নাম চতুরানন মহানিয়োগী। পুত্র না থাকায় চতুরাননের পর তাঁর জামাতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজ্য লাভ করেন। এরপর কৃষ্ণরায়, তারপর ক্রমান্বয়ে

দর্পনারায়ণ বা দক্ষিণ রায়, প্রতাপনারায়ণ এবং সবশেষে নরনারায়ণ। নরনারায়ণ জীবিতকালেই অথবা তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আনুমানিক ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র ভুরশুট অধিকার করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণের সভাকবি ছিলেন বৈদ্যবংশীয় ভরত মল্লিক—ইনি চন্দ্রপ্রভা (রচনাকাল ১৬৭৫ খ্রীঃ) রত্নপ্রভা ও আরও কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতা।

এই রাজবংশের ভুরশুট পরগণায় তিনটি গড় ছিল। ভবানীপুর (প্রধান অংশ), পাণ্ডুয়া এবং দোগাছিয়া। শেষ দুই গড়ের মালিকরা রাজ্যের দু আনার অংশীদার ছিলেন। পাণ্ডুয়া শাখায় জন্মগ্রহণ করেন কবি ভরতচন্দ্র। কৃষ্ণ রায়ের ভাই শ্রীমন্তনারায়ণ রায় গড়-ভবানীপুরের ৪ মাইল পূর্বে পেঁড়ো গ্রামে বসবাস শুরু করেন।

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে ভুরশুট মহাল'কে সুলাইমানাবাদ পরগণার অন্তর্গত এবং এর ভূমি রাজস্ব ১৯,৬৮,৯৯০ দাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। [৪০ থেকে ৪৪ দামে একটাকা।] ১৯৬১তে লেখা হুগলী জেলার সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক অনুসারে—

Bhursut (Bhurishrestha)—on the bank of Damodar river, Bhursut was once the capital of south Rarh and a famous port.

দঃ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠ জনপদবাসী ব্রাহ্মণগণের কৌলিন্য ও বিদ্যাবত্তার খ্যাতি এমনই প্রচারলাভ করেছিল যে খ্রীষ্টির একাদশ

শতকে চান্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার সভাকবি কৃষ্ণমিশ্র তাঁর প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি এঁদের অনুকরণেই অঙ্কিত করেন।

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার রাজবলহাট ছিল ভুরিশ্রেষ্ঠের অন্যতম প্রধান নগরী। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা সদানন্দ রায় দামোদর ও রণ নদের মধ্যবর্ত্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগটি পরিষ্কার করে রাজাপুর নগরের ও একটি হাটের পত্তন করেন। রাজবল্লভী দেবীর প্রতিষ্ঠার পর এ জায়গার নাম হয় রাজবলহাট। ভুরশুট রাজবংশের বসন্তপুর শাখার সম্পত্তির বিবরণে দেখা যায় যে, রাজবলহাটে সাতবিঘা ভূমির রাজার গড়বাটি এবং রাজবল্লভীর নামে পাঁচশত বিঘা দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা রুদ্রনারায়ণ একটি মন্দির তৈরী করিয়ে সেখানে দেবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৫৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সংগে বাংলার পাঠান নায়ক সুলেমান কররাণির বিবাদের সময় ভুরিশ্রেষ্ঠের রাজা মুকুন্দদেবের পক্ষাবলম্বন করলে সাতগাঁও সুলেমান কররাণির হস্তচ্যুত হয়। ভুরশুটের রাজীবলোচনের [পরবর্ত্তী কালের কালাপাহাড়] বীরত্বে মুগ্ধ সুলতান মুকুন্দদেবকে সাতগাঁও'র অধিকার দিয়ে সন্ধি করার পর রাজীবলোচনকে রাজধানী'তে আমন্ত্রণ জানান। যেখা'ন সুলতান কন্যা রাজীবলোচনের প্রণয়াসক্তা হওয়ায়, রাজীবলোচন সুলতানের নির্দেশে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। তিনি মুসলমান হওয়ার পর হিন্দুমন্দির ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করার জন্য

কালাপাহাড় আখ্যা লাভ করেন। কালাপাহাড় বহু জায়গায় হিন্দুমন্দির ধ্বংস করলেও ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের কোন ক্ষতি করেন নি।

পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁনের সহিত যুদ্ধে ভুরশুটের রাজা রুদ্র নারায়ণের বিধবা পত্নী রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্বের সংবাদে মুগ্ধ হয়ে আকবর তাঁকে রায় বাঘিনী উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ [প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৯] এবং রায়বাঘিনী ও কালাপাহাড় (প্রবাসী—পৌষ ১৩৬১) প্রবন্ধদ্বয়ে উক্ত কাহিনীদ্বয়ের বিরোধিতা করেন। শ্রী ভট্টাচার্য্যের মতে ভুরশুটের সাথে কালাপাহাড়ের সম্বন্ধ নাই। এমনকি ভুরশুটের রাজীবলোচনও কালাপাহাড় নন এবং রাণী ভবশঙ্করী ও রায়বাঘিনীও একই লোক নন।

বেতড়-বন্দর

বেতড় বলতে এখন বোঝায় বাকসারার অন্তর্গত একটি ভূভাগ। শিবপুরের সানা পাড়ার দক্ষিণে শালিমারের নিকট জি. টি. রোড ও আন্দুল রোডের সংযোগ স্থলে বেতাইচণ্ডীর মন্দির। চাঁদ সদাগর বাণিজ্য যাত্রার পথে নেমে বেতাইচণ্ডীর পূজা করেছিলেন। এই সব দেখে ষোড়শ শতাব্দীর বেতড় বন্দরের কোন ধারণাই করা যায় না। এ প্রসঙ্গে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কালিদাস দত্তের মন্তব্য—"........

গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষণসেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্বারা তিনি বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরকের অধীন বিড্ডর শাসন নামে একখানি গ্রাম ব্যাসদেব শর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উহাতে প্রদত্ত ভূমির নিম্ন-লিখিতরূপ চতুঃসীমা দেওয়া আছে—দক্ষিণে লেংঘদেব মণ্ডপী সীমা উত্তর—ধর্মনগরী সীমা, পূর্ব-জাহ্নবী সীমা এবং পশ্চিম—ডালিম্ব-ক্ষেত্র সীমা। এই চতুঃসীমা হইতে বুঝা যায় যে বর্ধমান ভুক্তির অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরক নামক বিভাগটি পূর্বদিকে জাহ্নবী বা ভাগীরথী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড চতুরক বর্তমান হাওড়া জিলার অন্তর্গত বেতড় নামক স্থান এবং উহারই নামানু-সারে ঐ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।"

হাওড়ার অন্য কোন জায়গার উল্লেখ করার আগে ভেনিসবাসী সিজার ফ্রেডরিক (Ceasar Federici) ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বেতড় বা ব্যাতর সম্পর্কে যা লিখে গেছেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার অনুসারে তার অংশ বিশেষ হ'ল—

A good tides rowing before you come to Satgaon you shall have a place which is called Buttor, and from thence upwards the river is very shallow and little water. Every year at Buttor they make and unmake a village necessary to their uses and this village standeth

as long as the ships there and till they depart for the Indies ; and when they are departed, every man goeth to his plot of houses and then setteth fire on them, which made me to marvel. For, as I passed upto Satgaon—I saw this village standing with a great number of people, with the infinite number of ships and bazars, and at my return coming down with my captain of the last ship, for whom I tarried, I was amazed to see such a place so soon razed and nothing left but the sign of burnt houses.

সপ্তগ্রামে তিনি দেখেন বেতড়ের বহু বণিক সেখানে সমবেত হয়েছেন The merchants gather to-gether for their trade from Buttor. [Cal. Review—Vol-VI P-402]

১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মামুদশা—শেরখাঁর বিরুদ্ধে লড়বার জন্য গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা সিলভেরিয়া'র কাছে সাহায্য চাইলে নবাবের সাহার্য্যার্থে ৯টি রণতরী বোঝাই পর্তুগীজ সৈন্য বাংলাদেশে হাজির হয়। পর্তুগীজদের সাহায্যের প্রতিদান স্বরূপ নবাব তাদেরকে সপ্তগ্রামে বাণিজ্যের অনুমতি দেন। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে ঘাঁটি করে। আরও বছর পঁচিশেক

পরে তৈরী হয় বেতড়ের ঘাঁটি। সে সময় বেতড় ছিল সপ্তগ্রামের অন্তর্গত আর ২০০ বছর আগের দলিলে দেখা যায় শিবপুর গ্রাম বেতড়ের অন্তর্গত।

ষোড়শ শতাব্দীতে সরস্বতী-দামোদরের মিলিত জলস্রোত বেতড়ের কাছে গঙ্গায় পরে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করত। পর্তুগীজদের বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজগুলি এখানে এসেই নোঙর করত। এখান থেকে মাল-খালাস করে ছোট ছোট জলযানে ভর্ত্তি করে সেগুলি সপ্তগ্রাম বন্দরে নিয়ে যেত এবং সেখান থেকে মাল এনে বড় বড় জাহাজে ভর্ত্তি করা হ'ত। জায়গাটি আগে বেতবনে ঘেরা ছিল বলে সংস্কৃতে বেত্রধারা নামকরণ হয়েছিল—যার অপভ্রংশ বেতড়।

বেতড় শুধু বাণিজ্যস্থল নয়, ধর্মস্থলও। সম্ভবতঃ পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপতিগণের রাজত্বের শেষভাগে বেতড়ে শক্তি উপাসনার এই উপপীঠ আবিষ্কৃত হ'য়ে গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমকে তীর্থস্থানে পরিণত করেছিল।

কালীঘাটে কালীবন্দ, বেতোড়ে বেতাই।

পুরুটে ঠাকুর বন্দো, আমতায় মেলাই।

মক্কাযাত্রীদের যেমন পথিমধ্যে বিশ্রামস্থল জেড্ডা, সপ্তগ্রামে বাণিজ্যযাত্রা পথে বেতড়ও তাই ছিল।

More prominent, of course mention is made of Batore on the otherside of the river, with

its ancient temple of Bataichandi, where the merchant come down to pay his homage to the goddess and where he and his man take some rest to do some shopping and prepare their mid-day meal. It was to Satgaon what zedda is to Mecca—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—জার্ণাল অব্ এশিয়াটিক সোসাইটি—১৮৯২।

আশ্চর্য্যের ব্যাপার। প্রতি বছর বেতোরে যে হাট বসত বেচা কেনা শেষে বাড়ী ফেরার আগে সে সব ঘর পুড়িয়ে ফেলা হ'ত। হেজেসের ডায়েরীর কয়েকটি লাইনে ঘটনাটি লিপি বদ্ধ আছে—Have then, in Garden Reach, was the great anchoring place of the portuguese and at Batore, near sibpur, every year when the ships arrived from Goa innumerable thatched houses were erected markets were opened and all sorts of provisions and stores were brought to the water side. But no sooner the last boat cameback from Satigaon and her cargo safely shipped abroad, then they set fire to the temporary houses and improvished almost as suddenly as Alladins palace when carried off by the Jinnes.

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Jeo de Barrs এবং Bleav বেতোড়ের উল্লেখ করেছেন কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগে আঁকা Van den Brocke-এর ম্যাপে বেতোড় অদৃশ্য। অনুমান ১৭শ শতাব্দীর মাঝ মাঝি সরস্বতী, রূপনারায়ণ, আদিগঙ্গার মুখ আলাদা হ'বার পর বেতোড় বন্দরের বিলুপ্তি ঘটে। এই সঙ্গে বন্ধ হয় পর্তুগীজ জলদস্যুতা। বেতোড়ের সামনে সরস্বতীর মজা চড়ায় জেগে ওঠে শালিমার।

থানা দুর্গ

বেতোড় বন্দরের সাথে থানা দুর্গের কাহিনী অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। থানা দু'র্গর অবস্থান ছিল শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর ডান দিকে। জায়গাটি এখন সাঁকরাইল থানার একেবারে উত্তর-পূর্ব মৌজা—জে. এল. নং-৪০ এর অন্তর্গত।

অনেকের মতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন রডাকে নৌ-সেনাপতি করে এবং সুন্দরবন থেকে বেতোর পর্য্যন্ত জল পথের ধারা অনুসরণ করে যে পাঁচটি দুর্গ নির্মান করান তার একটি হল বেতোড়ের বেত্র চণ্ডিকার মন্দিরের অল্প দক্ষিণে থানা দুর্গ।

"Batore, the door to the trade of Satgaon, situated at the confluence of the Saraswati and the Ganges........It was to control its trades that Rudda [1570-1600] the commander of Pratapaditya's fleet had caused a fort to be erected at Tanna."—census report of 1901, Vol-Vii, Chap iv, Page-14.

অপর একটি মত হ'ল গৌড়সুলতান হুসেনশাহ নির্মিত দুর্গটি মগ অধিকারে আসার পর লোকে মুখে এটি থানা মাকুয়া বা মাগুয়া নামে অভিহিত হ'তে থাকে। দুর্গটি যে হুসেনশাহ নির্মিত ১৭৮১-তে এক তদন্তে তা প্রকাশ পায়।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে মানসিংহ ষষ্ঠ মোগল সুবাদার হিসাবে বাংলায় আসেন। তার সময়ে হুগলীতে ফৌজদার ও থানাদুর্গে থানাদার নিযুক্ত হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে সাঁকরাইলের কাছ থেকে হিজলী পরগণা পর্য্যন্ত সরস্বতী নদীর মুখ কেটে চওড়া করায় ইউরোপীয় বাণিজ্য পোত সমূহের আসা যাওয়ার পথ সুগম হয়। হুগলীর ফৌজদার এই সকল বণিকদের কাছ হ'তে শুল্ক আদায়ের ভার দেন থানাদুর্গের থানাদারের উপর। সুষ্ঠু ভাবে কাজ চালাবার জন্য থানাদার মাটির তৈরী থানাদুর্গকে ভালভাবে মেরামত করান। গঙ্গার অপর পাড়ে আর একটি ছোট খাট মাটির কেল্লা তৈরী করে এপারের

কেল্লা থেকে ওপারের কেল্লা পর্য্যন্ত লোহার শেকল বাঁধা হ'ল। এইভাবে বিদেশী বাণিজ্য জাহাজ আটকে শুল্ক আদায় করা হ'ত। হাওড়ার দিকের দুর্গটিকে বলা হ'ত থানা মাকুয়া অর্থাৎ বড় থানা, অপর পাড়ের দুর্গটির নাম ছিল মেটিয়াবুরুজ বা মাটির কেল্লা। বোটানিকেল গার্ডেনের দক্ষিণে এখনও একটি পাড়াকে থানা মেগো বা মাকুয়া বলা হয় আর মাটির কেল্লা না থাকলেও মেটিয়াবুরুজ নামটি সগৌরবে বিরাজমান।

১৬৮২ খৃষ্টাব্দে বাংলায় ইংরাজরা একটি বাণিজ্য-বিভাগ খুলে উইলিয়াম হেজেসকে-এর গভর্ণর বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। হেজেস সাহেব থানা দুর্গ সম্বন্ধে তাঁর ডায়েরীতে লিখে গেছেন —Great Tanna was built where now stands the house of the superintendent of the Botanical Gardens, about 3 miles below Calcutta and distant from Hooghly about 20 miles by land.

ইংরাজদের সাথে মোগল সুবাদারের গোলমাল মেটাবার কাজে যাকে পাঠান হয় সেই ষ্ট্রেনশ্যাম মাষ্টার [Streynsham Master] নিজের চোখে থানা দুর্গটি দেখে লিখে গেছেন—"In Tannah stands an old fort of mud walls which was built to prevent ye incurssion of ye Arracanese, for it seems about ten or twelve years since that they were so bold that none durst

inhabit lower down the river than this place. The Arracanese usually taking the peoples of the shores to sell them at Tiple [Tipperah ?]

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তার ভাই হিম্মৎ সিংহ পাঠান সেনাপতি রহিম খাঁ'র সাহায্যে বেতোড় আক্রমণ করে থানা দুর্গ অধিকার করেন। দুর্গ উদ্ধারের জন্য হুগলীর মুঘল ফৌজদার ইংরাজদের সাহায্য চাইলে ইংরাজরা টমাস নামে একটি রণতরী পাঠান। ইংরাজ রণতরীর ভয়ে বিদ্রোহীরা দুর্গ ত্যাগ করেন।

পরবর্তীকালে ইংরাজরাই আবার দুর্গটিকে ধ্বংস করেন। মোগল ফৌজদারের তাড়ায় সুতানুটি থেকে পালাবার সময় জব চার্নক কিভাবে দুর্গটির কিছু অংশ ধ্বংস করেন, হেজেসের ডায়েরীতে তার বর্ণনা আছে—At the end of December 1686 Bower Mull, Mullick Barcundar, Mir Facca and 4 Munsubdars come to settle with Charnock. They delayed saying syesthakhan had ordered them to get the approval of the Nawab. In February charnock stormed the Fort Thana.

মারাঠা নায়ক রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত নবাব আলীবর্দী খাঁ'র আমলে বাংলা আক্রমণ করেন। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে একদল মারাঠা সৈন্য থানা দুর্গ দখল করলে দুর্গ উদ্ধারের জন্য নবাব ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থী হন। ইংরাজ রণতরী গঙ্গায়

আসামাত্র মারাঠা বীরেরা দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে যান। নবাব সিরাজ-দ্দৌলা যখন ইংরাজদের ফোর্ট উইলিয়াম ধ্বংস করতে কলকাতায় আসেন, ইংরাজরা তখন থানা মাকুয়া অধিকার করে। সে সময় দুর্গে ১৩টি কামান ও ৫০ জন সৈন্য নদী মুখ রক্ষার জন্য ছিল।

ইংরাজদের দুর্গ অধিকার সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন—

"ইংরাজেরা ১৩ই জুন প্রাতে দুইখানি যুদ্ধ জাহাজ ও দুইখানি ক্ষুদ্র তরণী পাঠাইয়া এই দুর্গ আক্রমণ করেন। অকস্মাৎ অগ্নি বৃষ্টিতে স্তম্ভিত হইয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধকার্য্যে অনভ্যস্ত সিপাহী সৈন্য হুগলী অভিমুখে পলায়নপর হইল। ইংরাজগণ কামানের কতক-গুলিকে অকর্মন্য, কতকগুলিকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। পরদিন হুগলীর ফৌজদার ২০০০ সিপাহী পাঠাইয়া ইংরাজদের তাড়াইয়া দেন। তৃতীয় দিন ৩০ জন ইংরাজ ফৌজ জাহাজ হইতে গোলাগুলি ছুড়িয়াও আর তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না। অতঃপর ইংরাজরা প্রত্যাবৃত্ত হইল। নবাব সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হইলে নদীমুখ দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন বা পারাপার হইতে সহজে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ইংরাজরা থানার এই দুর্গ অধিকারের পরিকল্পনা করেন।"

সিরাজের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় থানা দুর্গে ২০০ জন সিপাহী ছিল। এডমিরাল ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাতা উদ্ধারে আসছেন

খবর পেয়ে হুগলীর ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে থানা দুর্গ মেরামত ও মজবুত করার আদেশ দেন। নন্দকুমার ঠিক করলেন থানা দুর্গ ও মেটেবুরুজের মধ্যের গঙ্গা ইট দিয়ে বুজিয়ে দেওয়াই হবে উপযুক্ত কাজ। এই উদ্দেশ্যে দু'টি জাহাজ ইঁট বোঝাই করাও শুরু হয়। কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই ক্লাইভ থানা দুর্গ অধিকার ও ধ্বংস করেন। Tanna fort taken by Job Charnack and destroyed by Clive and Watson 1st January 1757 —Hedges Diary, Vol. III, Page CC XV. অতএব ক্লাইভ কর্তৃক থানা দুর্গ অধিকারকেই পলাশীর যুদ্ধের ইঙ্গিত বলে ধরা যায়।

১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মীরজাফরের সাহায্যে ডাচ নৌবহর যবদ্বীপ থেকে সাঁকরাইলে এসে কিছু সৈন্য নামাবার উদ্যোগ করলে ক্লাইভ কর্ণেল ফোর্ডকে থানা দুর্গে পাঠান। মুষ্টিমেয় সৈন্য ও দুখানি জাহাজের সহায্যে ফোর্ড ডচ নৌবহর ধ্বংস করেন। থানা দুর্গের শেষ এই সময়েই। এরপর যুদ্ধের জন্য আর কোথাও থানা দুর্গের উল্লেখ পাওয়া যায় না। শুধু হুগলীর ফৌজদারের হাজার খানেক সৈন্য-দুর্গের বাইরে কিছু দিনের জন্য যেখানে তাঁবু ফেলেছিল সেই সৈন্য পল্লী এখনও সেনাপাড়া [বা সানাপাড়া] নাম নিয়ে অতীতের স্মৃতিকে জাগিয়ে রেখেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট কিড ট্যাপিওকা চাষের জন্য কোম্পানীর কমিটি অব রেভিনিউ—

এর ২৯. ৮. ১৭৮২ তারিখের আদেশ বলে দুর্গের ভিতরের ৩৪ বিঘা জমির দখল পান। কিড সাহেব দুর্গের প্রাচীর ভেঙে গড় ভরাট করে দুর্গের ভিতের উপর যে দুটি ৮ কোনা বাড়ী তৈরী করেন তারই একটি হ'ল বর্তমান গার্ডেন স্থাপরিন্টেটডেন্টের কোয়ার্টার।

ভোট বাগান—পুরাণগিরি

ভোট-বাগান কোন বাগানের নাম নয়। বরং বলা যায় এটি আধুনিক অর্থে ভারতের প্রথম বৈদেশিক দূতাবাস ও বাণিজ্য মিশন। ভোট মানে হল তিব্বত। হাওড়া ষ্টেশন থেকে ৫১/৫৬ বাসরুটে ঘুসুড়ির কালীতলার অদূরে ৫নং গোঁসাইগাট রোডে অবস্থিত ভোট-বাগান প্রতিষ্ঠাকালে ছিল ভারত পর্য্যটনকারী তিব্বতী লামাদের আশ্রয়স্থল। প্রতিষ্ঠা ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময় গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পাঞ্চেন লামার অর্থানুকুল্যে। ভোট বাগানের কথা উঠলেই, মনে পড়ে পুরাণগিরির কথা—যাকে বাদ দিয়ে ভোট-বাগান প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনাই করা যায় না।

আমরা ইবন বতুতা—মার্কোপোলোর কাহিনী পড়তে বসে পুরাণগিরির কথা ভুলে যাই। সত্যই গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

পুরাণগিরি [১৭৪৩—১৭৯৫] দশমীর শৈব সম্প্রদায় ভুক্ত একজন সন্ন্যাসী। তিনি তিনবার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেরোন। প্রথমবার সেতুবন্ধ রামেশ্বর হয়ে সিংহল ও মালয়। মালয় থেকে

দেশে ফিরে কোচিন, দ্বারকা ও হিংলাজ হয়ে কাবুল। কাবুলে থাকাকালীন তিনি গজনীতে আহম্মদ শা আবদালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কাবুল থেকে খোরাসান ও হীরাট হয়ে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে বাকু শহর ঘুরে আস্ত্রাখান এবং সবশেষে মস্কো। মস্কোতে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পর ইরাণের তাব্রিজ ও ইস্পাহান হয়ে বসরা ও মস্কট ঘুরে সুরাট। দ্বিতীয়বার তিনি যান বালখ-বোখারা-সমরকন্দ হয়ে কাশ্মীর ঘুরে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্তরী। তৃতীয়বার তিনি নেপাল হয়ে দুর্গম ও অপরিচিত পথে মানস সরোবর ও ব্রহ্মপুত্র নদের উৎস স্থান পরিভ্রমণ করে তিব্বতে যান। দলাইলামা নাবালক থাকায় সে সময় তিব্বতের সর্বময় কর্তা ছিলেন তাশীলামা। তাশীলামার সঙ্গে পুরাণগিরির অন্তরঙ্গতা-ই ভোট-বাগান প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভুটান রাজের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ বাধলে—তাশীলামা সে বিরোধ মেটাবার উদ্দেশ্যে পুরাণগিরি মারফৎ হেষ্টিংসের কাছে একটি চিঠি পাঠান। পুরাণগিরিকে হেষ্টিংস আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দূত হিসাবে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে লাসায় পাঠান। ইংরাজ শাসকদের কাছ থেকে পুরাণগিরিই সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় যিনি বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা লাভ করেন। কোম্পানী যখন তিব্বতের সংগে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিঃ জর্জ বোগলের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি-দল পাঠান তখন পুরাণগিরির সহায়তাতেই বোগলে মিশন সাফল্য লাভ করে। সম্ভবতঃ ১৭৭৯-এর মাঝামাঝি পুরাণগিরি তাশীলামার

সংগে পিকিং যান। পুরাণগিরি লিখিত পিকিং যাত্রার কাহিনী ইংরাজীতে অনূদিত হয় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে।

তাশীলামার অনুরোধে পুরাণগিরির তত্ত্বাবধানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে হেষ্টিংস ঘুসুড়িতে ১০০ বিঘা ও ৫০ বিঘা দুই খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন জমির ব্যবস্থা করে দেন। তিব্বতী বণিক, তীর্থযাত্রী ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই ছিল মঠ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। সে সময় তিব্বত ও চীন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শের জন্য গভর্ণর জেনারেলগণ ভোট-বাগানে যেতেন। ভোট-বাগানের মঠে পাঞ্চেন লামাকে দেওযা ফার্সী ভাষায় লেখা সনদে হেষ্টিংসের স্বাক্ষর আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। প্রতিষ্ঠার সময় [১৭৮০] কিরকম ছিল বলা যায় না, তবে এখন মঠ বলতে আছে একটি দালান, যার স্থাপত্যকর্মে আজ আর তিব্বতীয়ানার কোন ছাপ নাই। দালানটি আগে দোতলা ছিল। মঠের এলাকার মধ্যে ভুতপূর্ব মহান্তদের দশটি ছোট বড় সমাধি মন্দির আছে। যে সমাধি মন্দিরটি সবচেয়ে বড় সেটির নির্মাণকাল ১৭৯৫-এর মে মাস অর্থাৎ ১২০২ বঙ্গাব্দের ২৬শে বৈশাখ। এখানেই সমাধিস্থ হয়েছেন ইতিহাস বিখ্যাত এবং অধুনা বিস্মৃত পুরাণগিরি—যার আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৫২ বছর।

স্থানীয়ভাবে ভোট-বাগানের বর্তমান পরিচিতি মহাকাল মঠ বা শঙ্কর মঠ। বর্তমান মোহান্ত শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী দিব্যাশ্রম ১৩৫৯ সালে মঠের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর যোগানন্দেশ্বর নামে একটি

শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্য দেবের পূজা-উৎসবের প্রবর্ত্তন করেন।

বোটানিকেল গার্ডেন

বোটানিকেল গার্ডেন সাধারণ লোকের কাছে এখনও কোম্পানীর বাগান নামে পরিচিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে এই অঞ্চলে বাস করতেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট কিড (১৭৪৬-৯৩)। তিনি নিজের বাংলোর চারপাশে একটি উদ্যান রচনা করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল কিড গভর্ণর জেনারেল স্যার জন ম্যাক ফারসনের নিকট তাহার উদ্যান ও থানা মাকুয়া সন্নিহিত জলা জায়গাটিতে একটি দেশী বিদেশী ফলের গাছ, মশলাপাতির গাছ এবং টিক গাছের চাষের উদ্দেশ্যে একটি বাগান তৈরীর পরিকল্পনা পেশ করেন। টিক গাছের তক্তা সে সময় জাহাজ সারাইয়ের কাজে লাগত। প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ১১. ৭. ১৭৮৭ তারিখে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ বাগান তৈরীর অনুমতি দেন। বাগানের অবৈতনিক সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত করা হয় কিড সাহেবকেই। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে কিড সাহেব ২৭৩ একর বা ৮১৯ বিঘা জমির একটি বাগান তৈরী করেন। নাম হয় রয়াল বোটানিক গার্ডেন।

ভারতে পরবর্তীকালে চা, সিঙ্কোনা, মেহগনি প্রভৃতি গাছের চাষ এবং পাট ও অন্যান্য তন্তুর ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যে চাষ

শুরু হয়, তার প্রথম পরীক্ষা হয় এই বাগানের মাটিতে। কিড সাহেব চীন থেকে চা চারা এবং আন্দিস্ থেকে সিঙ্কোনা গাছ আনিয়ে এখানে পোঁতেন।

পরবর্তী সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট ভারতীয় উদ্ভিদ বিদ্যার জনক ডাঃ উইলিয়াম রক্সবার্গ বেতনভুক কর্মচারী হিসাবে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর কাজে যোগ দেন।

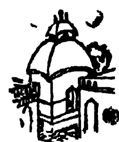
একসময় বাগানের সৌন্দর্য বিশপ হেবারকে মিল্টন বর্ণিত স্বর্গশোভার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

বর্তমানে বাগানটির গাছগুলির মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ২০০ বছরের পুরাতন একটি বটবৃক্ষ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ গাছের মূল গুড়িটিকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। এখন গাছটির পরিধি ১৩২৮ ফুট, উচ্চতা ৯৮ ফুট। বটগাছটি একটি তালগাছের কাণ্ডের উপর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। প্রবাদ একজন সন্ন্যাসী এই বটমূলে সিদ্ধিলাভ করেন। বটগাছটির কাছেই ছিল একটি আম গাছ। সাধারণের বিশ্বাস ছিল আম গাছটি সিরাজদ্দৌল্লার আমলের। দেশ বিদেশের গাছ ছাড়া বাগানে ২৬টি লেক ও কয়েকটি মনুমেন্ট আছে। বাগানের ভিতরের পীচের রাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১০ মাইল। একমাত্র বুড়ো বটগাছের নামে উৎসর্গীকৃত গ্রেট বেনিয়ান এভেনিউ ব্যতীত বাগানের অপর সকল রাস্তার নামই সাহেবদের নামে, যেমন কলেট এভেনিউ, রক্সবার্গ এভেনিউ ইত্যাদি।

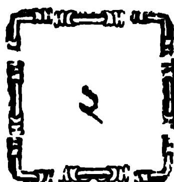
২৬-১-১৯৫০ তারিখে বাগানটির নতুন নামকরণ হয় ইণ্ডিয়ান বোটানিকেল গার্ডেন। বাগানের মালিকানা আগে ছিল রাজ্য সরকারের এখন কেন্দ্রীয় সরকারের। বাগানটি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছে বোটানিকেল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার উপর। বাগানের মধ্যে এঁদের একটি কার্যালয় আছে। সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের (Central National Herbarium) কার্যালয়ও বাগানের মধ্যে।

শীতকালে ছুটির দিনগুলিতে এখানে পিকনিক করার জন্য হাওড়া, কলকাতা ও সন্নিহিত অঞ্চল হতে বহু জনসমাগম হয়। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্যাভিলিয়ান আছে, যেগুলি ভাড়া দেওয়া হয়। একটি রেষ্ট হাউসও আছে।

—: :—



ভূগোল



যে কোন জাতির ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় ভৌগলিক জ্ঞান অবশ্য প্রয়োজনীয়। ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সাহিত্য চর্চ্চার উপরও বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাই বর্তমান অধ্যায়ে সংক্ষেপে হাওড়ার ভৌগলিক পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা।

অবস্থান

পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার বিপরীতে হুগলী নদীর পশ্চিম পাড়ে হাওড়া জেলার অবস্থান—উত্তর গোলার্ধে ২২°১২´ থেকে ২২°৪৮´ অক্ষাংশের এবং ৮৮°২৩´ থেকে ৮৭°৫০ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে। ২২°৩৫´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°২১´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় শহর হাওড়ার।

সীমা

হাওড়া জেলার উত্তরে—হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও আরামবাগ মহকুমা, পূর্বে—ভাগীরথী নদী যার অপর পাড়ে কলকাতা এবং ২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর, আলিপুর ও ডায়মণ্ড হারবার মহকুমা, দক্ষিণে—মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা, পশ্চিমে—রূপনারায়ণ নদ, মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও ঘাটাল মহকুমা এবং হুগলী জেলার আরাবাগ মহকুমা। জেলাটির সীমারেখা কখনও প্রাকৃতিক কখনও বা কৃত্রিম। পূর্বে ও দঃ পূর্বে গঙ্গানদী, পশ্চিমে ও দঃ পশ্চিমে রূপনারায়ণ নদ এবং উঃ পূর্বে ও উঃ পশ্চিমে বালীখাল ও দামোদর নদের কিছু অংশ ইহার প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশক।

আয়তন

ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসাবে জেলার আয়তন ৫৭৫ বর্গমাইল বা ১৪৮৭ কিলোমিটার। ১৯০১ খ্রীঃ থেকে প্রতি দশবছর অন্তর লোক গনণার সময় জেলার আয়তনের যে পার্থক্য দেখা যায় এবং সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসাবের সঙ্গে এই হিসাবের গরমিল কতখানি আদমসুমারীর রিপোর্ট দেখলেই সেটা বোঝা যাবে।

আদমসুমারীর বছর	আয়তন (বর্গমাইল)	
১৯০১	৫১০	
১৯১১	৫১০	
১৯২১	৫৩০	
১৯৩১	৫২২	
১৯৪১	৫৬১	
১৯৫১	(১) ৫৬০·১	
	(২) ৫৬৮·২	সার্ভেয়ার জেনারেলের হিসাবে
১৯৬১	(১) ৫৭৫	
	(২) ৫৬০·১	

১৯৭১-এর সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক অনুসারে জেলাটির আয়তন ১৪৭৪ বঃ কি. মি. অর্থাৎ পঃ বঙ্গের সমস্ত জমির আয়তন ১০০ হ'লে হাওড়ায় জমির পরিমাণ ১·৮১।

লোক সংখ্যা

যদি ধরা যায় ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে পঃ বঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল ১০০, তাহ'লে হাওড়ার লোকসংখ্যা হ'বে ৬·৫০ জন।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী জেলার লোক সংখ্যা ২৪, ২০, ০৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৩, ১৮, ২৭০ জন এবং স্ত্রীলোক ১১. ০১. ৮২৫ জন। মোট জনসংখ্যার ১৪. ০৬. ০৬৩ জন গ্রামবাসী, অবশিষ্ট ১০. ১৪, ০৩২ জন শহরবাসী।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলায় যখন লোক গণনা হয়, তখনও হাওড়া বলে কোন জেলার জন্ম হয়নি। হুগলী জেলার মধ্যে একটি শহরের নাম ছিল হাওড়া। হিসাব করলে দেখা যাবে যে সময় হাওড়া শহরের লোকসংখ্যা ছিল মোটামুটি ৭০,০২৫ জন।

উনবিংশ শতাব্দীতে জল নিকাশী ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ থাকায় ম্যালেরিয়া, কলেরা আর আমাশার [মায়ের দয়া মার্জনীয়] ডিপো হিসাবে খ্যাত হাওড়া জেলার লোকসংখ্যা কিন্তু ক্রমবর্ধমান —যদিও ১৮৭২ ৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মহামারীর আকারে বর্ধমান জ্বর নামে একপ্রকার অসুখে হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের মত হাওড়ারও বেশকিছু বাসিন্দা দেশের মায়া কাটান। ঘটনাটি সম্পর্কে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্টে লেখা হয়—Nearly one-half of the Bengali immigrants come from the Burdwan Division, Hooghly sending 48000, Midnapore 29000 and Howrah 15000.

দশবছর পরেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জন গনণায় দেখা যায় সারা বাংলায় কলকাতা প্রথম, দ্বিতীয় হাওড়া, তৃতীয় হুগলী। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্য্যন্ত হাওড়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির রেখাচিত্রটি এইরকম—

সাল	জনসংখ্যা
১৮৭২	৬৩৫ ৮৭৮ জন
১৮৮১	৬.৭৫.৩৯৪ ,,
১৮৯১	৭.৬৩.৬২৫ ,,
১৯০৩	৮.৫০.৫৪৪ ,,

এইসঙ্গে বর্তমান শতকের শুরু থেকে হাওড়া কলকাতা এবং সমগ্রপশ্চিমবঙ্গে শতকরা হিসাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি তুলনা-মূলক তালিকা এখানে দেওয়া হ'ল—

সাল	সমগ্র পঃ বঙ্গ	হাওড়া	কলকাতা
১৯০১—১১	+ ৬ ২৫	+ ১০·৯৭	+ ৮·৮৬
১৯১১—২১	— ২ ৯১	+ ৫·৭১	+ ৩·৬৩
১৯২১ – ৩১	+ ৮·১৪	+ ১০·১৭	+ ১০·৬৬
১৯৩১—৪১	+ ২২·৯৩	+ ৩৫·৬২	+ ৮৬·০০
১৯৪১ – ৫১	+ ১৩·২২	+ ৮ ১২	+ ২৪·৫০
১৯৫১ ৬১	+ ৩২ ৮০	+ ২৬·৫১	+ ৮·৪৮
১৯৬১ -৭১	+ ২৭·২০	+ ৮·৭২	+ ৭ ৩১

১৯০১ খ্রীঃ কে ভিত্তি বৎসর ধরে ১৯৬১ খ্রীঃ পর্যান্ত পশ্চিমবঙ্গ ও হাওড়ায় প্রতি দশকে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির রেখাচিত্র আঁকলে সেটি হ'বে নিম্নরূপ –

জনসংখ্যা বৃদ্ধির খতিয়ান

এলাকা	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১	১৯৬১
পশ্চিমবঙ্গ	১০০	১০৬	১০৩	১১২	১৩৭	১৫৫	২০৬
হাওড়া	১০০	১১১	১১৭	১২৯	১৭৫	১৮৯	২৪০

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলার দু'টি মহকুমার মধ্যে জনসংখ্যা

বণ্টনের হিসাবটি ছিল এইরকম—

মহকুমার নাম	আয়তন (বঃমাঃ হিসাবে)	সংখ্যা শহর	সংখ্যা গ্রাম	জনসংখ্যা	জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বঃ মাঃ	স্বাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা
হাওড় সদর	১৭৩	২	৩৬৫	৪'৩১'২৫৭	২৪৯৩	৫২১৩৬
উলুবেড়িয়া	৩৩৭	—	১০৮৬	৪১৯২৫৭	১২৪৪	৪৫৮৩৫
সমগ্র জেলা	৫১০	২	১৪৫১	৮.৫০'৫১৪	১৬৬৮	৯৮০০১

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমস্থমারী অনুসারে হাওড়া জেলায় শহর ও গ্রামের সংখ্যা যথাক্রমে ২৩ ও ৭১৯৮—যার মধ্যে ১১টি গ্রাম বসতি-হীন। শহরগুলির নাম, আয়তন ও লোকসংখ্যার হিসাবটি হ'ল নিম্নরূপ—

ক্রমিক সংখ্যা	শহরের নাম	শহরের মান	আয়তন (বঃকিঃ মিটার)	অধিবাসীর সংখ্যা
১	হাওড়া	মিউনিসিপ্যাল	২৮'৮৩	৫'১২'৫৯৮
২	বালী	ঐ	১১'৮১	১'০১'১৫৯
৩	বালী	মিউনিসিপ্যাল বহির্ভূত	১১'৬৮	২৯'৭৩৭
৪	উলুবেড়িয়া	ঐ	৫'০৩	১৮'৫০৯
৫	ফোর্টগ্লষ্টার	ঐ	২'৪১	১৩'৭৮৫
৬	চেঙ্গাইল	ঐ	৪'০৪	১৪'৮৩১

ক্রমিক সংখ্যা	শহরের নাম	শহরের মান	আয়তন (বঃকিঃমিটার)	অধিবাসীর সংখ্যা
৭	বাউড়িয়া	মিউনিসিপ্যাল বহির্ভূত	৩·০৩	৮·৪৯২
৮	বানীতবলা	ঐ	৩·০৮	৪·৯৭৯
৯	সাঁকরাইল	ঐ	২·৪২	১১·৮৪৪
১০	সারেঙ্গা	ঐ	৪·৩০	১০·৭০৪
১১	মাণিকপুর	ঐ	২·৪১	৭·৮৪৪
১২	ঝোড়হাট	ঐ	১·৪৫	৬·৪৩৮
১৩	বান্নুপুর	ঐ	০·৫২	৫·৬৫৪
১৪	আন্দুল	ঐ	০·৫২	৪·৬৯০
১৫	ডোমজুড়	ঐ	৩·৮৩	৮·৬৭০
১৬	কোলেরা	ঐ	৪·৬৪	৮·৪৭৯
১৭	মহিয়াড়ী	ঐ	২·১২	৭·০৭৯
১৮	নিবরা	ঐ	৩·৪৭	৬·৫৯৯
১৯	সাঁত্রাগাছি	ঐ	১·৬৩	৮·৭০৯
২০	উনশানি	ঐ	৫·৩১	৬·৬৩৫
২১	জগাছা	ঐ	১·৪০	৪·৭৫৮
২২	পাঁচলা	ঐ	৪·৫১	৯·১০২
২৩	আমতা	ঐ	৪·৪৩	৮·০৮৬
২৪	বুড়িখালি	ঐ	১·৮৬	৫·৭০৩

১৯৬১ খৃষ্টাব্দে হাওড়ায় ও পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮০৮ ও ৮৭৮ জন। দশ বছর পরে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই সংখ্যা ৮৩৮ ও ৮৭২ জনে পরিণত হয়। ১৯৭১ এর সেন্সাস হ্যাণ্ডবুকে চকপাড়া, জগদীশপুর, দঃ ঝাপড়দহ, বাঁকড়া, ডুইল্যা, ম্যাশলা ও পোদরাকে মিউনিসিপ্যাল বহির্ভূত শহরের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীতে প্রকাশ প্রতি কিলোমিটারে ১৬২৫ জন লোকের বাস। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে কলকাতা বাদে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলা এমন কি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব থেকেও লোক এসে হাওড়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। আবার দেশভাগের পর পূর্ব-বাংলার বহুলোকও হাওড়াবাসী হয়েছেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রাজ্য ও হাওড়া জেলার লোকসংখ্যার তুলনামূলক বিচারের চিত্রটি নিম্নরূপ—

এলাকা	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	লোকবসতির ঘনত্ব	
				১৯৬১	১৯৭১
হাওড়া জেলা	২৪'২০'০৯৫	১৩'১৮'২৭০	১১'০১'৮১৫	১৩৬৯	১৬২৫
সমগ্র পঃ বঃ	৪'৪৪'৪০'০৯৫	২'৩৪'৮৮'২৪৪	২'০৯'৫১'৮৫১	৩৯৮	৫০৭

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী অনুযায়ী জেলায় মোট মৌজার সংখ্যা ৮৩১। এর মধ্যে বসতিযুক্ত-৭৮৭, বসতহীন-১১। শহরাঞ্চলের অন্তর্গত মৌজার সংখ্যা তেত্রিশ। ১৯৭১-এর সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক অনুসারে ডোমজুড় থানার চক মহিষজোল, জগৎবল্লভপুর থানার চকপাটমুড়া, বাগনান থানার কলেপাইরি এবং আমতা থানার জোতসাদর, মারয়াচক, পশ্চিম জয়পুর, সাহাপুর, মানিকারা প্রভৃতি গ্রামগুলি জনবসতিহীন। জেলায় মিউনিসিপ্যালিটি আছে দু'টি, জেলা পর্ষদ একটি, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ১৫৩ এবং গ্রাম পঞ্চায়েৎ ১০৫৩টি। ১৪টি সমষ্টি উন্নয়ণ কেন্দ্রের অবস্থান ব্লক অনুযায়ী নিম্নরূপ—আমতা ১ ও ২ নম্বর, বাগনান ১ ও ২ নম্বর, বালী, জগাছা, জগৎবল্লভপুর, পাঁচলা, সাঁকরাইল, শ্যামপুর ১ ও ২ নম্বর, উদয়নারায়ণপুর এবং উলুবেড়িয়া ১ ও ২ নম্বর ব্লক।

অধিবাসী

যদিও পাশেই মেদিনীপুর জেলায় পুরানো ও নব্য প্রস্তর যুগের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তথাপি হাওড়ায় সেই আমলের লোক বসতির স্বরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মত বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি। একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হ'ল বাগনান থানার হরিনারায়ণপুর গ্রামে একটি তিন কোনা কালচে-সবুজ রঙের পাথরের নবাশ্মর আয়ুধ এবং দু'একটি হাড়ের বর্শা। অনুমান অসংখ্য খালবিল নদীনালা ভর্তি অঞ্চলটির আদিম অধিবাসীরা

ছিল জেলে ও নাবিক সম্প্রদায়ের। এই নাবিকগোষ্ঠী শুধু ভারতীয় পণ্য সম্ভাবই বিদেশেব হাটে নিয়ে যেত না—জ্ঞাতসারেই হ'ক বা অজ্ঞাতসারেই হ ক সেইসঙ্গে বিদেশে রপ্তানী করত ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা। বস্তুতঃ বিদেশে তারাই প্রথম ভারতের [বেসরকারী] রাষ্ট্রদূত। মেদিনীপুব ও হাওড়া জনপদ যে সময় তাম্রলিপ্ত বা সুহ্মরাজের অধীন ছিল, তখন স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী ছিলেন কৈবর্ত্ত সম্প্রদায় সম্ভূত এবকম মনে করাব যথেষ্ট কারণ আছে। হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ প্রণেতা শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের মতে হুগলীর ন্যায় হাওড়াবও আদিম অধিবাসীরা ছিলেন বাগ্‌দী সম্প্রদায়ভুক্ত। আবার উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত আমতা থানা এলাকায় জেলে ও নাবিক সম্প্রদায়েব আধিক্য, লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, মেলা প্রভৃতিতে এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব বিচার করে শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায় ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের হাওড়া জেলার হ্যাণ্ডবুকে মন্তব্য করেছেন, জেলে ও নাবিক সম্প্রদায়ই হাওড়ার আদিম অধিবাসী। এখানকার লোকেরা শনিভাঙ্গর এবং ক্ষিঙ্গা নামক দু'জন প্রাচীন রাজার কথা বলে। এই দু'জন রাজাই নাকি জেলে সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ। ভূরশুট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গড়-ভবানীপুরের চতুরানন মহানিয়োগী দিলাকাস-এর রাজা [হুগলী জেলার] রাজা শনিভাঙ্গরকে পরাজিত করেন। শনিভাঙ্গর জাতিতে বাগ্‌দীও হতে পারেন। ক্ষিঙ্গে রাজার ঢিপি আছে আমতা থানার খড়িয়প গ্রামের বসু পরিবারের বাড়ীর পাশেই।

মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থানকারী গ্রীকদূত মেগাস্থি-নিসির মতে গঙ্গারিডি রাজ্যের মধ্যে হাওড়াও ছিল। এ সম্পর্কে Mr. J. A. Lang লিখেছেন—The Gangaridae were undoubtedly Hindus and they were mainly Composed of Bagdis who can still be indentified as the original stratum of the population in the deltaic portion of the district and are allowed by the Hindus of pure Aryan race to represent the great aboriginal section which was admitted with the people of Hinduism in distinction from all the rest who are classified as chuars.

বাংলা ভাষায় অভব্য ব্যক্তিদেরকে চুয়ার নামে অভিহিত করা হয়। জৈন পুঁথি আচারাঙ্গ সূত্র এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মহাবংশ অনুসারে রাঢ় বা সুহ্ম এলাকার অধিবাসীরা অভব্যই ছিল। মহাভারতের সভাপর্বে ভীমের নিম্নবঙ্গ জয়কালে সেখানের অধিবাসীদের ম্লেচ্ছ বলা হয়েছে।

ডঃ জে, এইচ, হাটন জাতি, ভাষা ও কৃষ্টির বিচারে মানবজাতিকে আট ভাগে ভাগ করেছেন। তাঁর হিসাবে বৈদিক আর্যগণের বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশের পূর্বেকার বাঙ্গালীরা এ্যালপাইন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, ভাষা আর্যেতর। পরবর্তীকালে এরা ক্রমশঃ আর্য ভাষাভাষী হ'য়ে পড়েন।

১৮৭২-এর আদমশুমারী অনুসারে হাওড়া-হুগলী অঞ্চলে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল কৈবর্ত, দ্বিতীয়—বাগ্‌দী, তৃতীয়– ব্রাহ্মণ, চতুর্থ—গোয়ালা এবং পঞ্চম—সদ্‌গোপ। বাঙলীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় দিতে গিয়ে ডঃ অতুল সুর মন্তব্য করেছেন যে, "মেদিনীপুর ও হাওড়া-হুগলী অঞ্চল কৈবর্তদের, এবং বর্ধমান, হুগলী-হাওড়া এলাকা বাগ্‌দীদের আদি বাসস্থান। হাওড়ায় ব্রাহ্মণদের আগমন যজমানদের অনুসরণে ও আমন্ত্রণে যজন-যাজন ক্রিয়া এবং অধ্যাপনার জন্য। এছাড়া তাঁতী, কেওড়া, কুমোর, তাম্বুলী, বারুই, কাঁসারী প্রভৃতির বাস হাওড়ায় অনেকদিনের। আদিতে বাংলার সমাজ যখন কৌমভিত্তিক ছিল তখন কর্বট নামক যে জাতির কথা শোনা যায়, তাদের বংশধরগণ হইলেন কৈবর্ত। বর্তমানে চাষী কৈবর্তরা অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর কৈবর্তগণ মাহিষ্য নামে পরিচিত।"

হাওড়ার অধিবাসীদের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষদিকে অথবা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ১৯০১ খ্রীঃ-এ হাওড়ার লোকসংখ্যা যখন ছিল ৮,৫০,৫১৪ জন তখন মোট জনসংখ্যার ৭৯% অর্থাৎ ৬,৭২,৫৪৪ জন ছিল হিন্দু, ২০·৬% বা ১,৭৫,১২৩ জন মুসলমান, ৫৭৯ জন দেশী খ্রীষ্টান-সহ মোট খ্রীষ্টান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ২৫৮৮ জন, বাদবাকী ২৫৯ জন অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

১৯৭১-এর সেন্সাস হ্যাণ্ডবুক অনুসারে হাওড়া জেলায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বলম্বীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৭৮ ও ৪৬৯ জন এবং হাওড়া শহরে ১৭১৬ জন শিখ বসবাস করেন।

দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গাগত বহুব্যক্তি হাওড়ার অনেক জায়গায় বসবাস শুরু করেছেন। এঁদের সৃষ্ট নতুন বসতিগুলির কয়েকটি হ'ল—বাউরিয়া (১), বাউরিয়া (২), বালি সাঁপুইপাড়া, বালি অভয়নগর, নিশ্চিন্দা (১), নিশ্চিন্দা (২), উঃ বাকসারা, দঃ বাকসারা, শ্যামসুন্দরচক, শেকরাহাট, জগৎবল্লভপুর এবং সুলতানপুর।

উপাধি

অন্যত্র প্রচলিত সাধারণ উপাধি ব্যতীত হাওড়ায় প্রচলিত বৈশিষ্টাপূর্ণ কয়েকটি উপাধি হ'ল—ঘোষ, গণ্ডার, ও ছাগল। এ বিষয়ে রামপ্রসাদ মজুমদারের [সমকালীন, বৈশাখ ১৩৭৬] মত—অনেকে এগুলিকে "টোটেম" শ্রেণীর উপাধি অর্থাৎ আদিম বাসিন্দাদের পূজ্য বা মাননীয় উপাস্যের প্রতীক বলে মনে করেন; তবে এমন হওয়াও সম্ভব যে কোন রাজা বা সামন্তাদির মহিষশালা প্রভৃতির তদারক করা বা ঐ সমস্ত প্রাণী বশ করতে বা তাদের নিয়ে যারা ব্যবসায় করতেন তাদের উপাধি ওরূপ হয়।

উপজীবিকা

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪২ জন ছিল কৃষিতে নিযুক্ত, শিল্পে ২৬, ব্যবসায়-বাণিজ্যে ২·৩ এবং অন্যান্য

পেশায় ৩·৭ জন। এ হিসাব যে সময়ের তখন চাকরী পাবার আশায় হাওড়ায় শুধু বাংলার অন্যান্য জেলাগুলি থেকে নয়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকেও লোকের আসা শুরু হয়ে গেছে।

উনিশ শতকের শুরুতে ইংরাজী শিক্ষা শুরু হওয়ার পর কলকাতার সাহেবী সওদাগরী অফিসে বা কুঠীতে দালাল, বেনিয়ান, মুন্সী বা কেরানীর কাজ সহজেই পাওয়া যেত। আত্মীয়তা বা নিদেনপক্ষে গ্রাম সম্পর্কে কাকামামার সুপারিশেও চাকরী হত। একই অফিসে পর্য্যায়ক্রমে তিন পুরুষ চাকরী করেছেন হাওড়ায় এরকম পরিবারের সংখ্যা অনেক।

শিবপুর এলাকার অধিবাসীদের উপজীবিকা সম্পর্কে ইম্প-রিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া'য় লেখা আছে—এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ সরকারী ও বেসরকারী অফিসের কেরানী এবং বিভিন্ন কারখানা ও রেলপথের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক। বলাবাহুল্য শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাঙ্গালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

The mills of Howrah and the coal mines of Asansol are alike worked with British Capital, by coolies from Bihar and the U. P. and the shop-keepers, who are enriched by the trade they bring, are also for the most part foreigners.

বর্তমানে হাওড়ার শিল্প-আত্মা ব্রিটিশ মূলধনের কবল মুক্ত

হলেও হাওড়াবাসীদের অবস্থার কোন হেরফের হয়নি।

১৯৭১-এ সরকারী হিসাবমতে জেলার উপজীবিকা চিত্রটি ছিল নিম্নরূপ—

	অধিবাসীর সংখ্যা	কায়িক পরিশ্রমকারী	চাষী	কৃষি শ্রমিক	অন্যান্য কর্মে নিযুক্ত
পুরুষ	১৩,১৮,২৭০	৬,৩৩,৮২২	৭৪,৩৮৯	১,২৩,৪৯৫	৪ ৩৫,৯৩৮
স্ত্রী	১১,০১,৮২৫	৩০,৮৩৮	১৩২৪	২১২০	২৭,৩৯৪
মোট	২৪,২০,০৯৫	৬,৬৪,৬৬০	৭৫,৭১৩	১,২৫,৬১৫	৪ ৬৩ ৩৩২

ভূ-প্রকৃতি

ভূপ্রকৃতি অনুসারে হাওড়া জেলা নিম্নগঙ্গা সমভূমি অঞ্চলের পরিণত ব-দ্বীপ এলাকার অন্তর্গত। জেলার অঞ্চল বিশেষে, প্রধানতঃ দক্ষিণ অংশে এখনও নূতন পলি জমা হ'চ্ছে। উত্তরাংশের মাটি কর্দ্দমাক্ত,—এঁটেল-দোঁয়াশ এবং দক্ষিণে বেলে-দোঁয়াশ। পলিমাটিতে বেলে, এঁটেল, পেঁকো এবং ধসা বা জলময় মাটির আধিক্য। সঞ্চিত পলিমাটির পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়; সাঁত্রাগাছি অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী—৭১৪ ফুট গভীর এবং শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেন অঞ্চলে সবচেয়ে কম ৬৯০ ফুট। সমুদ্র দক্ষিণে সরে যাওয়ায় একসময় মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, যশোর, ফরিদপুর প্রভৃতি এলাকা জুড়ে একটি অগভীর উপহ্রদের উদ্ভব

হয়। ভাগীরথী সরস্বতী, দামোদর, রূপনারায়ণ ও অন্যান্য নদ-নদী বাহিত পলিমাটিতে ভরাট হয়ে অঞ্চলগুলি ক্রমশঃ বাসযোগ্য হয়ে উঠে। ১৮৩৫-৪০ খ্রীষ্টাব্দের খননকার্যে ৪৮১ ফুট নীচেও কোথাও পার্বত্যভূমি, কোথাও বা উপকূলীয় ভূ-ভাগের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ভূপৃষ্ঠের ৩০ ফুট নীচের অর্থাৎ সমুদ্রতলের ১০ ফুট নীচের কাঠের অস্তিত্ব আবিষ্কার হওয়ায় অনেকে মনে করেন কোন সময় এটিই ছিল স্থলভাগের উপরিতল।

ফার্গুসনের ন্যায় ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের অভিমত, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ উত্তর থেকে শুরু করে প্রথমে পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণে অবশেষে পূর্বদিকে বাঁক নিয়েছে। সিদ্ধান্তটি অভ্রান্ত হ'লে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে বালী প্রভৃতি হাওড়ার গ্রামগুলির উৎপত্তি কলকাতার আগেই। বালী অঞ্চলের কয়েকটি জায়গার নাম বোঁদের বিল [অর্থাৎ বোঁদমাটির জলময় অঞ্চল], বিল জয়পুর, নাবাল দুর্গাপুর, বাঁহগাছি [এত নীচু জায়গা যে বান এলে গাছে আশ্রয় নিতে হয়] প্রভৃতি। ভূ-তাত্ত্বিকগণের অনুমান এই সমস্ত জায়গা একসময় নদী-গর্ভে ছিল। পশ্চিম হাওড়ার উপর দিয়ে কোন সময় খর-স্রোতা নদীবহমান ছিল, পুরানো সরকারী কাগজপত্রে এরূপ অনুমান ব্যক্ত করা হয়েছে। সে সময় হয়ত উঁচুডাঙ্গার মাঝে মাঝে গ্রাম দেখা যেত। হাওড়া শহরের শিবপুরের চেহারাটা ছিল সে আমলে বড়-সড় একটা দ্বীপের মতন। দ্বীপের মত এই সমস্ত পারস্পরিক সংযোগ বিহীন গ্রামগুলি একটি সমতলক্ষেত্রে

পরিণত হয় যখন পলিমাটির দ্বারা এলাকাটি ভরাট হয়।

হাওড়া জেলা সমুদ্রতল থেকে স্থানবিশেষে ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু। হাওড়া ময়দান এলাকা সবচেয়ে বেশী উঁচু—২০ ফুট এবং বোটানিক্যাল গার্ডেন এলাকা সবচেয়ে কম ১৫ ফুট মাত্র।

নদ-নদী

হাওড়া জেলার প্রধান নদ-নদীর সংখ্যা তিন—ভাগীরথী, দামোদর ও রূপনারায়ণ। বস্তুতঃ ভাগীরথী ও রূপনারায়ণ নদী-দ্বয়ের দোয়ারের দক্ষিণাংশই হাওড়া জেলা। ভাগীরথীর শাখানদী সরস্বতী এবং দামোদর নদের শাখানদী কৌষিকী ও কানা দামোদর জেলার অন্যতম জল নিকাশের পথ।

অনেক, অনেককাল আগেকার কথা। হাজার বছর আগে হলেও হতে পারে—যখন ত্রিবেণী থেকে শিবপুর পর্যন্ত ভূভাগ ছিল একটি বড-সড দ্বীপ। দ্বীপের পূর্বে ভাগীরথী আর পশ্চিমে সরস্বতী খরস্রোতে প্রবাহিত ছিল।

ভাগীরথী

ভাগীরথী নদী হাওড়া জেলার পূর্বসীমা দিয়ে প্রবাহিত। ইহা গঙ্গা বা হুগলী নদী নামেও পরিচিত। নদীটি বালীর নিকটে হাওড়াকে স্পর্শ করে ঘুসুড়ী, হাওড়া ষ্টেশন এলাকা, রামকৃষ্ণপুর হয়ে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অদূরে শালিমার পয়েন্ট

হয়ে সাঁকরাইল, বাউরিয়া, উলুবেড়িয়া সব শেষে শ্যামপুর থানাকে স্পর্শ করেছে। এই দৈর্ঘ মোটামুটি আট মাইলের মত। গঙ্গা—কলতা পয়েন্টের বিপরীত দিকে দামোদর এবং হুগলী পয়েন্টের বিপরীত দিকে রূপনারায়ণের সাথে মিলিত হয়েছে। নাবিকদের কাছে আতঙ্ক স্বরূপ জেমস ও মেরী বালুচড়ার অবস্থান এই দুই পয়েন্টের মাঝে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাজকীয় জেমস এবং মেরী জাহাজটি এই জায়গায় ডুবে যাওয়ার পর এটি জেমস ও মেরী বালুচড়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ভাগীরথী সারা বছরই নাব্য। তবে ক্রম'গত পলি পড়ায় নদীমুখ ক্রমশঃ অগভীর হ'তে থাকায় নিয়মিত ড্রেজার দিয়ে মাটি কাটার ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়। হাওড়া শহরের প্রান্তবর্তী গংগানদীর অনেক জায়গায় চড়া পড়েছে। এই প্রসঙ্গে ঘুসুড়ির চড়া'র নাম করা যায়।

পশ্চিমকুলে চড়া পড়ায় গংগা ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরে গেছে। শিবপুর কাহিনী প্রণেতা শ্রীঅন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে—বেশীদিনের কথা নয়—প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শিবপুরে স্নানের ঘাট ব্রহ্মময়ীতলা হ'তে কতদূর সরে গেছে—তা ধীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারা যায়—এ অঞ্চলে গঙ্গা কিভাবে মজে আসছে।

বৈদিক সাহিত্যে ভাগীরথীর উল্লেখ না থাকায় মনে হয় আর্যদের নিকট নদীটি খুব বেশী প্রয়োজনীয় ছিল না। মনসা-

মঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের অনুসরণ করে বলা যায়, সেকালে ব্যাপারীরা হিজলীর পথে সরস্বতী নদী পরিত্যাগ করে আদিগঙ্গার পথে যেত। কারণ সে সময় সরস্বতী গঙ্গার চেয়ে গভীরতর থাকায় সরস্বতী নদীতে বড় বড় জাহাজে যাতায়াতকারী পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয় ছিল।

অনুমান কোন সময় গঙ্গা জি, টি, রোডের ৪০০ ফুট পশ্চিমে ছিল। ১৮০০-১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গঙ্গা ১০০ ফুট পূর্বে সরে গেছে। নদী পূর্বে সরে যাওয়ায় পলিপড়া জমিতে গড়ে উঠেছে, ঘুসুড়ি, রামকৃষ্ণপুর ও শিবপুরের নদী তীরবর্ত্তী এলাকাগুলি। রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের স্থলবেষ্টিত বাঁশতলা শ্মশানঘাটটি এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে সাক্ষ্য দেয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সালকিয়ার ১৫ ফুট মাটির নীচেয় ডিঙি নৌকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে।

গঙ্গার গতি বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। এক সময় ত্রিবেণী থেকে গঙ্গার একটি ধারা সপ্তগ্রাম, হুগলী, শ্রীরামপুর হয়ে প্রাচীন বেতোড় বন্দরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হত। অপর একটি ধারা সরস্বতী নামে ডুমা নিশিপুর, চণ্ডীতলা, আন্দুলের পথ বেয়ে বেতোড়ের দক্ষিণে গঙ্গার সাথে মিলিত হত। দুই জলপথের প্রাচীন সংযোগস্থলটির আধুনিক নাম সাঁকরাইল। গঙ্গার প্রধান জল নির্গমন পথ হিসাবে সরস্বতী যখন বেগবতী ছিল তখন সংযোগ স্থলটি ছিল আরও কিছুটা দক্ষিণে।

হাওড়া, মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গা নদীটি যে, সরস্বতী যখন তরুণী ছিল তখন তার নিম্নাংশ ছিল সে কথার সমর্থক শ্রীকালিদাস দত্তের মতে—সেকালে একটি ছোট খাল ভাগীরথীর শাখা হিসাবে এখনকার খিদিরপুরের কাছে আদি গঙ্গা নদী থেকে বেরিয়ে সাঁকরোলে সরস্বতীর সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রবাদ যে, নবাব আলীবর্দী খাঁ-র শাসনকালে ইংরাজরা কলকাতায় জাহাজ যাতায়াতের সুবিধার জন্য ওটি প্রশস্ত করে ভাগীরথীর জল ঐ পথে প্রবাহিত করেছিলেন। গঙ্গার এই অংশ কৃত্রিম বলে হিন্দুরা আজও এখানে শবদাহ করেন না এবং ঐ জলে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের ফল হয় না বলে বিশ্বাস করেন। সাঁকরোল পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত খাল কোন সময়ে কে কাটিয়েছিলেন তা আজও জানা যায়নি। ডি, ব্যারোর ম্যাপ দেখলে বোঝা যায়, খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও সেটি বর্তমান ছিল। [পৌণ্ড্র-বর্ধন ভুক্তি ও বর্ধমান ভুক্তি—অমৃত, ২১/১০/৭৭]

গঙ্গায় পলি

১৮১৩ খ্রীঃ-এ কোন এক পাইলট জাহাজের অধ্যক্ষ মন্তব্য করেছিলেন, কাচারি ঘাটে [বর্তমান হাওড়া ষ্টেশন ঘাটে] আর আগের মতন বড় জাহাজ ভিড়তে পারে না, কারণ নদীতে চড়া পড়েছে।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রমুখ মনিষীদের সিদ্ধান্ত, গঙ্গার পলি জমার ইতিহাস বহু প্রাচীন। আনুমানিক ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে যখন পলি পড়ে গংগার মুখ বন্ধ হয়ে যায় তখন রাজা ভগীরথ বিপুল আয়াসে পলি সরিয়ে গঙ্গাকে নবজীবন দান করেন। রাজা ভগীরথ যে কাজ শুরু করে গেছেন আজও তা শেষ হয়নি। এখন এই কাজের ভার কলিকাতা পোর্ট কমিশনার বা পোর্ট ট্রাষ্টের হাতে। গঙ্গায় পলি জমা হ্রাস ও জলপ্রবাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রচিত ফরাক্কা প্রকল্পকে সরকারী পরিভাষায় কলিকাতা বন্দর সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প আখ্যা দেওয়া হলেও কলিকাতার পশ্চিমে অবস্থিত হাওড়ারও লাভ এতে কম নয়।

হাওড়া, বালী, বেলুড়, শিবপুর, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি জেলার প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলি এই নদীর তীরে অবস্থিত।

সরস্বতী

সরস্বতী হুগলী নদীর শাখা। হুগলী শহরের কয়েক মাইল দূরে ত্রিবেণী থেকে বার হ'য়ে বলুহাটী গ্রামের নিকট হাওড়া জেলায় প্রবেশ করে ডোমজুড় ও আন্দুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে সাঁকরাইলের নিকট হুগলী নদীতে পড়েছে। বর্তমানে ইহা আন্দুল পর্যন্ত নৌ-বাহন যোগ্য, অবশ্যই ছোট নৌকায়। এক সময় যে এটি বড় নদী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় উঁচু পাড় এবং পাড়ের কাছে মাঝে মাঝে বড় বড় নৌকার ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে পাওয়ায়।

মজা নদীটির ধারে মাঝে মাঝে দহ নামক বড় বড় পুকুর আছে। দহ নামযুক্ত অনেক গ্রামও আছে, যেমন—মাকড়দহ, ঝাপড়দহ, বন্দরদহ প্রভৃতি।

সরস্বতী নদী সম্পর্কে হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ প্রণেতা শ্রীসুধীর কুমার মিত্রের মন্তব্য—পঞ্চদশ শতকের আগে ভাগীরথী সরস্বতী খাত দিয়াই সমুদ্রে প্রবাহিত হত। আবার দামোদরের দক্ষিণবাহী প্রবাহ পথই এক সময় সরস্বতীর প্রবাহ পথ ছিল তাহা অনুমিত হয় ডি, বারোসের নক্সা এবং মেজর হার্স্টের রিপোর্ট হতে। পরে সরস্বতী এই পথ পরিত্যাগ করে সোজা দক্ষিণ বাহিনী হয়ে রূপনারায়ণ পত্রঘাটার প্রবাহ পথে কিছুদিন প্রবাহিত হত। সেই সময় রূপনারায়ণের নিম্নপ্রবাহ সরস্বতীর প্রবাহ পথ ছিল। অষ্টম শতকের পরই সরস্বতী ভাগীরথীর এই এই প্রাচীনতর প্রবাহ পথের মুখ এবং নিম্নতর প্রবাহ শুকিয়ে যায়। ফলে তাম্রলিপ্ত বন্দরের অবলুপ্তি ঘটে।

১৫৬৫ খ্রীঃ-এ ফ্রেডারিক সাহেব সুস্পষ্ট ভাষায় মন্তব্য করে গেছেন—"বেতোড়ের উত্তরে সরস্বতীর প্রবাহ অত্যন্ত অগভীর হয়ে পড়েছে, সেজন্য ছোট ছোট জাহাজও সপ্তগ্রাম পর্যন্ত যাওয়া আসা করতে পারে না।" সরস্বতী নদী তীরের আন্দুল, ডোমজুড়, সাঁকরাইল প্রভৃতি জায়গাগুলি উল্লেখযোগ্য।

দামোদর

বিহারের ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের প্রসিদ্ধ শহর রঁাচীর প্রায় ৫০ মাঃ [৮০ কিঃ মিঃ] উত্তর-পূর্বে দু'হাজার ফুট [৬০৯.৬ মিটার] উচ্চতায় দামোদর নদের উৎপত্তি। উৎপত্তিস্থল থেকে মোহনা পর্যন্ত মোট দৈর্ঘ কম-বেশী ৩৩৭ মাইল। নদটি বিহার থেকে পঃ বঙ্গের বর্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ডিহি ভুরশুটের নিকট আকনা গ্রামের কাছে হাওড়ায় প্রবেশ করে আমতার দক্ষিণ দিয়ে মাদারিয়া খালের সঙ্গে মিশেছে। তারপর আরও ৩ মাইল দক্ষিণে গাইঘাটা খাঁড়ি, বাগনান, উলুবেড়িয়া খাল পার হয়ে কলকাতার ৪৮.২৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণে শ্যামপুর থানার শিবগঞ্জে এসে ভাগীরথী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। লোকের মুখে দামোদর-ভাগীরথী সঙ্গম এলাকাটির প্রচলিত নাম ভাঁড়ারদ-মোন।

একসময় দামোদর নদ আসানসোল পর্য্যন্ত নাব্য ছিল। তখন রাণীগঞ্জের কয়লা ও অন্যান্য জায়গার বহু কৃষিপণ্য দামোদর নদ পথে কলকাতায় আসতো। পরবর্তীকালে হয় জোয়ারের সময় আমতা পর্যন্ত নৌ-বাহন যোগ্য।

এ যাবৎ বহুবারই নদীটির গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। বৃষ্টির জলে পরিপুষ্ট ও স্ফীত দামোদর নদের বন্যা এক সময় রাঢ়-বঙ্গের আতঙ্ক ছিল। সেকালের লৌকিক ছড়া—'ধেয়ে এল

দামোদর' কথাটির মধ্যে এই দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি চিহ্ন বর্তমান। দামোদরের বন্যা শীর্ষক একটি কবিতার [জনৈক ধর্মোপাষক রচিত] উল্লেখ ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গসাহিত্য পরিচয় গ্রন্থে আছে। কবিতার কয়েকটি পংক্তি হল—

অবধান কর ভাই শুন সর্বজন,
মন দিয়া শুন সবে কহি এ বিবরণ।
সন হাজার বাহাত্তর (১০৭২) সালে প্রথম আশ্বিনে,
দামোদরে আইল বান শুন সর্বজনে।
আড়া চারি জল হইল পর্বত উপর।
মনুষ্য ডুবাতে মন কৈল দামোদর॥

বার্ষিক প্লাবনের জন্য চীনের দুঃখ হোয়াংহো নদীর ন্যায় দামোদর নদকে বলা হ'ত বাংলার দুঃখ। বর্ষার জলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বালি ও পলি বহনের জন্য নদীটির গতিপথ ক্রমশঃ ভরাট হতে থাকার জন্যই এই দুর্দৈব। দামোদরের তাণ্ডবলীলা সম্পর্কে জনৈক বিদেশী লেখকের মন্তব্য—"যুগ যুগ ধরে দামোদর অশ্রুনদ বলে পরিচিত ছিল। ভারতীয় চিন্তাধারায় দামোদর নদ ভয়াবহ আর গঙ্গানদী হল কল্যাণদায়িনী। সেই দামোদরের জলে যখন বর্ষার ঢল নামতো, তখন দামোদরের সঙ্গে বরাকর, কোনারের জল মিশে, বিহারের উচ্চভূমি ছাপিয়ে বাংলার নিম্নভূমিকে ডুবিয়ে বিহার থেকে ২৬০ মাইল পথ উজিয়ে আসতো কলকাতা শহরের দরজা পর্যন্ত।"

বন্যা রোধে দামোদর নদে বাঁধ দেওয়ায়, বর্ধমান ও হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। স্বাধীনতার পর বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রথম অংশ সম্পূর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় অংশে নিম্ন দামোদর পরিকল্পনার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় কয়েক বৎসর যাবৎ হাওড়া জেলার কিছু অংশে বন্যার প্রকোপ প্রকাশ পায়।

দামোদর নদের দু'টি প্রধান শাখা। একটি শাখার নাম দামোদর। এটির প্রবাহ পথ হাওড়া জেলার উত্তরাংশ, মূল দামোদর নদ হ'তে বার হয়ে ১৪ মাইল পথ পরিক্রমার পর আমতার তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে আবার মূল দামোদর নদে মিলিত হয়েছে। অপর একটি শাখা, যেটি মূল দামোদর নদ হ'তে বার হয়ে ভাগীরথীতে পড়েছে তার নাম কানা দামোদর বা কৌষিকী। এই জেলায় নদটির দৈর্ঘ্য ৪৫ মাইল এবং তীরবর্তী বিখ্যাত জায়গাগুলির মধ্যে আছে আমতা, শ্যামপুর, মহিষরেখা প্রভৃতি।

কানা-দামোদর

কানা দামোদর বা কৌশিকী জগৎবল্লভপুর থানার ইছানগরী গ্রামে হাওড়ায় প্রবেশ করে ২০ মাইল পথ অতিক্রম করে উলুবেড়িয়া শহরের এক মাইল উত্তরে হুগলী নদীতে পড়েছে। তীরস্থ প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের মধ্যে আছে, জগৎবল্লভপুর, মাজু প্রভৃতি।

বর্ত্তমানে এটি কানা হলেও অতীতের চোখে নদটির গতি চাঞ্চল্যের প্রমাণ আছে। যথা, কবি কঙ্কনের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে—

আমোদর দামোদর ধাইল দারকেশ্বর

খরতর লহরী ধাইল গোদাবরী

ধায় কানা দামোদর

চণ্ডীর আদেশে শিলাশিল বরিষে

কান্দে সাধু মাথায় হাত দিয়া।

দামোদরের গতি পরিবর্ত্তনের ইতিকথা

একসময় দামোদর হাওড়ার ৩৯ মাঃ উত্তরে এবং ত্রিবেণী থেকে ৩ মাঃ দূরে নয়াসরাই-এর কাছে হুগলী নদীর সাথে মিশত। পরবর্ত্তীকালে দামোদরের প্রধান স্রোত কানা দামোদর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। ডি, ব্যারোস এবং ব্লেভ (Bleave-1650) দামোদর নদের দু'টি মুখের কথা উল্লেখ করেছেন—মুখদ্বয় পিস্তোলার নিকট [বর্ত্তমানে ফোর্ট মর্নিংটন পয়েন্টের পিছলদা গ্রাম] দৃশ্যমান। একটি মুখ বর্ত্তমান দামোদর, যেটি ফলতা পয়েন্টে হুগলী নদীতে পড়েছে। দ্বিতীয় মুখ সিজবেড়িয়া খাল, যার মধ্য হ'তে কানা দামোদর হুগলী নদীতে পড়েছে। দামোদর সপ্তদশ শতাব্দীর

শেষদিকে আঁকা-ম্যাপে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর Jan Perdo-র বর্ণনায় "একটি বৃহৎ জাহাজের নদী" আবার রেনেলের ম্যাপে (১৭৭৯-৮১ এটি ক্ষীণকায়া নদী। ষোড়শ শতাব্দীতে আঁকা ডি, ব্যারোসের ম্যাপে দামোদর নদের গতিপথের গৌরবজনক অধ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এই পথের ধ্বংসাবশেষ হ'ল বনস্পতি খাল ও দুধ খাল এবং ছোটময়রা, বড়ময়রা, জগন্নাথপুর, মানসমারি, ধাপ ও মিলকি গ্রামগুলিতে অবস্থিত লম্বায় ½ মাইল ও চওড়ায় ¼ মাইলের বড় আকারের পুকুরগুলি। বাগনানের ১½ মাইল দূরবর্তী গোবর্ধন গ্রামের একটি এলাকার এক সময়ের পরিচিতি ছিল "জাহাজ ঘাটা"।

রূপনারায়ণ

হুগলী জেলার বন্দর নামক স্থানে দ্বারকেশ্বর ও শিলাই নদী একত্র হ'য়ে রূপনারায়ণ নামে পরিচিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে হাওড়া জেলার প্রায় ৩৫ মাঃ সীমারেখা বেষ্টন করে প্রবাহিত। নদীটি উত্তর ভাটোরা গ্রামের নিকট এই জেলাকে স্পর্শ করে মুণ্ডেশ্বরী নদী, পাঁশুলী খাল, বাক্সী খাল প্রভৃতির জলে পুষ্ট হয়ে হুগলী পয়েন্টের কাছে হুগলী নদীতে পড়েছে। কোন কোন জায়গায় নদীর বিস্তার ৩ মাইল।

বৈদেশিক নাবিকগণ বিভিন্ন সময়ে রূপনারায়ণের বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। ডি, ব্যারোসের দা এশিয়া (Da Asia)

গ্রন্থে এটি গঙ্গা, হেজেসের লেখায় টামবোলী, মাষ্টার-এর বর্ণনায় টামবারলীন, বাউরের ভাষায় টামবোলী, অবশেষে রেনেলের ম্যাপে রূপনারায়ণ নামে বর্ণিত। রেনেল একথাও বলে গেছেন, অন্যেরা একে ভুল করে গঙ্গা মনে করেছেন।

Valentinjn-এর ম্যাপ অনুসারে দামোদরের বড় শাখা তমলুকের নিকট রূপনারায়ণের সাথে মিলিত হয়েছে। অপর একটি শাখা কালনার নিকট হুগলী নদীতে পড়েছে। সম্ভবতঃ সে যুগে এই হু'টি জলপথে জাহাজ সমূহ হুগলী নদী থেকে অনায়াসেই রূপনারায়ণ নদে যেতে পারার ফলেই এটিকেও গঙ্গা বলে ভুল করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কানা দারকেশ্বর দামোদর নদের সাথে রূপনারায়ণের সংযোগ অক্ষুণ্ণ করে রেখেছে। ইহার তীরে পানিত্রাস, মণ্ডলঘাট, বাকসী, পিছলদহ, শশাটি প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য।

খাল-বিল-জলা

হাওড়া জেলায় খাল-বিল-জলা প্রভৃতি প্রচুর। আবার ক্রমশঃ ভরাট হয়ে এলেও এখনও অনেক অঞ্চল বেশ নীচু—এইসব এলাকা প্রতি বছর বর্ষার জলে ডুবে যায়। স্বাভাবিক খাল ব্যতীত দামোদর ও সরস্বতীর গতি পরিবর্তনে হাওড়ায় কিছু খালের সৃষ্টি হয়েছে। মাদারিয়া, রাজাপুর, সিজবেড়িয়া, বাঁশপাতি প্রভৃতি খালগুলি দামোদরের পরিত্যক্ত খাত মাত্র।

গাইঘাটা বাক্সী খাল—দামোদর এবং রূপনারায়ণ নদের সংযোগকারী খালটি বাক্সীর কাছ থেকে বের হয়েছে। এই স্বাভাবিক জল নিকাশী পথটির দৈর্ঘ্য ৭½ মাইল। ১৮৯৪ খ্রীঃ-এ খালটির কর্তৃত্ব হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হাত হ'তে পাব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের হাতে যায়।

বালী খাল—গঙ্গা থেকে বেরিয়ে হাওড়া-হুগলী জেলার বালী-উত্তরপাড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে শেওড়াফুলী খালে পড়েছে। দৈর্ঘ প্রায় ১০ মাইল।

মেদিনীপুর খাল—উলুবেড়িয়া থেকে বের হ'য়ে বাঁশবেড়ের নিকট দামোদরের সাথে মেশার পর রূপনারায়ণ হ'য়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। খালটির সাহায্যে উলুবেড়িয়া থেকে রূপনারায়ণের প্রান্ত পর্যন্ত জলসেচ হয়।

মিঠাকুণ্ড খাল—দামোদর থেকে বের হ'য়ে মিঠাকুণ্ড নামক জায়গায় ভাগীরথীতে পড়েছে। দৈর্ঘ প্রায় ৬ মাইল।

কালসাপা খাল—দৈর্ঘ্য ৬ মাইল, প্রস্থ ৩০ ফুট, গভীরতা ৮ ফুট।

গৌরীগঙ্গা গাঙ—অনুমান একসময় গৌরী গঙ্গা ছিল প্রবল বেগে বহমানা। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের সেটেলমেণ্ট রেকর্ড অনুযায়ী এটির বিস্তৃতি ৭০/৮০ ফুট। খালের মর্য্যাদা লাভের পরবর্তীকালে এটি মজে যায়। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে খালটির ৭ মাইল পথের সংস্কার

সাধন করা হয়। হুগলী জেলায় দামোদরের সাথে এবং হাওড়ায় সরস্বতী'র সাথে সংযুক্ত হবার পর এটি বাউরিয়ার কাছে গঙ্গায় পড়েছে। মজা নদীর চড়ায় যে সব বসতি গড়ে উঠেছে তার মধ্যে কতকগুলির নাম—কাজির চড়া, শ্যামসুন্দর চড়া, রায়ের চড়া, চড়া পাঁচলা, চড়া শুঁড়িখালি, মোল্লার চড়া প্রভৃতি। রায়ের চড়ায় নলকূপ খননের সময় দেখা গেছে ৪০০ ফিটের মধ্যে এঁটেল মাটি নাই। তার নীচেয় ৮/১০ ফুট এঁটেল মাটির পর আবার বালির স্তর। খাল সংলগ্ন গ্রামগুলির মধ্যে আছে দশভাগা, চেঙ্গাইল, বলরামপোঁতা, পাঁচলা প্রভৃতি।

অন্যান্য খাল ও জলা

সরস্বতী নদীর নিম্নভাগ সাঁকরাইল খাল এবং কৌশিকী নদীর নিম্নভাগ সিজবেড়িয়া খাল নামে পরিচিত। বালী, রাজগঞ্জ, সাঁকরাইল, সিজবেড়িয়া ও চম্পাখাল ভাগীরথীর সাথে মিশেছে। দামোদর নদের সাথে যে বারটি খাল মিশেছে তারমধ্যে মাদারিয়া (১০ মাইল দীর্ঘ) এবং বাঁশপাতি (দৈর্ঘ প্রায় ১৫ মাইল) সমধিক উল্লেখযোগ্য। রূপনারায়ণ নদে যে তিনটি খাল পড়েছে তাদের মধ্যে আছে প্রসিদ্ধ বাকসীর খাল। অন্যান্য খালগুলির মধ্যে ডাকাতিয়া, রাজাপুর ও ষ্টুয়ার্ট খালের নাম উল্লেখযোগ্য। মাদারিয়া খাল হুগলীজেলার চাঁপাডাঙ্গার উত্তর থেকে বার হয়ে আমতার কিছুদূরে রামেশ্বরে পড়েছে। একসময় এটি রোণের খাল বা রোণ নদী নামে পরিচিত ছিল।

হাওড়া জেলার জলাগুলির মধ্যে হুগলী ও সরস্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী রাজাপুর জলা এবং কানা-দামোদর ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী আমতার কেঁদোর জলা সমধিক প্রসিদ্ধ। আমতা ও উলুবেড়িয়ার মধ্যে কাচুয়ার বিলও উল্লেখযোগ্য। কানা দামোদর ও মজা সরস্বতী সন্নিহিত অঞ্চলটি অস্বাস্থ্যকর। জল নিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়ায় ডোমজুড় ও আমতা থানার জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটেছে। পূর্ব জার্মানীর সেবা প্রতিষ্ঠান কাসার উদ্যোগে ঘোড়াঘাটা-বরুন্দা খালের সংস্কার হ'চ্ছে। এই খালের জল ম্যাস্নক খাল হ'য়ে রূপনারায়ণে পড়বে খাল দু'টির সংস্কারে উপকৃত হ'বে নবাসন, বরুন্দা, ঈশ্বরীপুর, পানিত্রাস, ম্যান্নক, বাগনান গোপালপুর প্রভৃতি গ্রাম।

কাটাখাল

হাওড়া জেলায় দু'টি কাটাখাল আছে। প্রথম উলুবেড়িয়া ক্যানেল—ইহা পাষণ্ডপুরের নিকট থেকে উলুবেড়িয়ার নিকট গঙ্গায় পড়া পর্যন্ত ৮ মাইল লম্বা। দ্বিতীয় খালটি কোলাপুরের নিকট রূপনারায়ণ থেকে দামোদর পর্য্যন্ত ৪ মাইল লম্বা। এছাড়া রাজাপুরের—ও হাওড়া জেলার জল নিকাশের জন্য রাজাপুর ড্রেনেজ ও হাওড়া ড্রেনেজ নামে দু'টিকাটা খাল আছে।

বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া ও জলবায়ু

বারোমাসে ছয় ঋতু নয়, চার ঋতুর প্রভাব অনুভূত হয়

হাওড়া জেলায়। মার্চ থেকে মে—গরমকাল। এই সময় বিকালের দিকে বৃষ্টি হয়। কালবৈশাখী নামে পরিচিত ঝড়ের আবির্ভাব হয় এই সময়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর—বর্ষাকাল। এই সময়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমীবায়ু প্রভাবে জেলার সর্বত্রই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অক্টোবর থেকে নভেম্বরের প্রথম পর্যন্ত সময়টি হল শরৎ-কাল। প্রত্যায়ন বায়ুর প্রভাবে এসময় কিছুটা ঠাণ্ডার আমেজ অনুভূত হয়। বছরের বাকী সময়টা শীতকাল।

সর্বাধিক বৃষ্টি হয় জুলাই-আগষ্ট মাসে। সারা বছরের স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৬২৯·৭ মিলিমিটার। বার্ষিকগড় বৃষ্টিপাতের হিসাব ৫৭ ইঞ্চি। এর মধ্যে মে ৮·১", জুন ১০·২", জুলাই ১২·০", আগষ্ট ১২·৩" এবং সেপ্টেম্বর মাসে ৮·১" ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ৪৮" ঘণ্টায় ২৪" বৃষ্টিপাতে ১৫০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রবল বন্যায় বহু মানুষ, গরু, ও শস্য ধ্বংস হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ-এ প্রকাশিত হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারের পাতায় লেখা আছে, জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে মার্চের মাঝা-মাঝি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার জন্য সময়টি স্বাস্থ্যকর। মার্চের শেষ অর্ধেক থেকে মে মাসের প্রথম অর্ধেক পর্যন্ত দিনে গরম অনুভূত হ'লেও বিকালে মনোরম সামুদ্রিক হাওয়ায় শরীর ঠাণ্ডা হয়। সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারীর গোড়ার দিক পর্যন্ত সময়টি

অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এই সময় ম্যালেরিয়া, উদরাময় প্রভৃতি অসুখ দেখা দেয়।

১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৪২, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ সমূহে সাইক্লোনিক ঝড়ে হাওড়া জেলার বহুক্ষতি হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ের সময় হুগলী নদীতে অবস্থানকারী বহু নৌকা ও জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বন্যা

১৮১৬, ১৮৩৩ ও ১৮৬৪-তে দামোদর এবং রূপনারায়ণে প্রবল বন্যা হয়। রূপনারায়ণের বন্যা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক চিঠিতে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন "যাক্ একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে। এ বাড়ী রূপনারায়ণকে উৎসর্গ করে বেঁচেছি। বান ও বন্যায় ঐ নদী যে কি ভীষণ হতে পারে এবারে ভাল করে দেখলাম। যে নদীর ধারের বাঁধ দিয়ে তোমরা আমাদের এখানে আসতে সে আর নেই, বোধ হয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তারপরে জল আর জল।

[শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ী—গোপাল চন্দ্র রায়]

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অন্তর্গত নিম্ন-দামোদর পরিকল্পনার কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় উপযুক্ত জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবে প্রভূত ক্ষতি হয়। ১৯৫৫-৫৬ থেকে

১৯৬৬-৬৭ পর্য্যন্ত প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় ফসলের ক্ষতি হ'তে থাকে। ১৯৭০-এর প্রথম দিকে অনেক জায়গায় বন্যা হয়। পাঞ্চেৎ, মাইথন ও দুর্গাপুর বাঁধ থেকে ৯,৬১,০০০ কিউসেক জল ছাড়ার ফলে বন্যায় ৩৫০ বঃ মাঃ এলাকা জুড়ে ১৭ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যা কবলিত গ্রামের সংখ্যা নিম্নরূপ—

হাওড়া সদর মহকুমা		উলুবেড়িয়া মহকুমা	
থানা	—ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা	থানা	ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের সংখ্যা
বালী—	৪	উলুবেড়িয়া—	৭৫
জগাছা—	১৭	বাগনান—	৫৫
সাঁকরাইল—	১৮	শ্যামপুর—	৪৭
পাঁচলা—	৩৩	আমতা—	১৭৯
ডোমজুড়—	৪৮	উদয়নারায়ণপুর—	৭৯
জগৎবল্লভপুর—	৭০		

তালিকাটির উপরে নজর বোলালে দেখা যায় যে, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমতা, তারপর ক্রমান্বয়ে উদয়নারায়ণপুর, উলুবেড়িয়া ও জগৎবল্লভপুর থানা। এই বন্যায় ৫.৬ কোটি টাকার শস্য ও ৩১টি গৃহপালিত পশুর ক্ষতি হয়, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষায়তনগুলির [প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত]

সংখ্যা ১৩৫৬টি, ক্ষতির পরিমাণ ৩২.৬৩.০০০ টাকা; ক্ষতিগ্রস্ত ৯৭ মাইল রাস্তার পুনর্নির্মাণ ব্যয় ২৪ লক্ষ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত সেতুগুলির মেরামতি ব্যয় ৬৬.৭৫.০০০ টাকা।

১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে দামোদর, রূপনারায়ণ ও মুণ্ডেশ্বরী নদীর বন্যায় জেলার ৪৩০ বঃ মাঃ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উলুবড়িয়া মহকুমার ৪০২টি গ্রামের ৪.৩৫.০০০ জন অধিবাসী বন্যা কবলিত হয়। আমতা-উলুবেড়িয়ার ৫০.০০০ একর ধানজমি এবং আমতার অর্থকরী ফসল পানের ৬০০০টি বোরোজ নষ্ট হয়। কিন্তু পূর্বের ক্ষতির সমস্ত হিসাবকে ম্লান করে দিয়েছে ১৯৭৮-এর বন্যা।

বন্যার মুখ্য কারণ উপযুক্ত জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাব। হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বন্যা তদন্ত কমিটির অভিমত হ'ল—

এই এলাকার প্রধান দু'টি নদী দামোদর ও হুগলী। আভ্যন্তরীণ জল নিকাশকারী ঘিউ, ইলসরা, কেদারমতী, সরস্বতী ও কুন্তীনদী হুগলী নদীতে পড়েছে। এছাড়া, জল নিকাশের উপায় হিসাবে আছে রাজাপুর খাল, পুরানো খাল, ডানকুনি খাল, বারজোলা খাল, গুজারপুর খাল এবং ডাকাতিয়া খাল। ঘিউ-ইলসরা উপত্যকার জল কিছুটা কুন্তীনদী, কিছুটা সরস্বতী এবং কিছুটা দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অংগ হিসাবে নূতন

কুন্তীনদী দিয়ে নিকাশ হয়। এই সমস্ত নদী ও খালগুলির জল নিকাশের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। বেশী বৃষ্টির পুরো জল এগুলির দ্বারা নিকাশ হয় না। হুগলী নদীতে জোয়ার এলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ে।

পাঁচ-ছ বছর আগেও আমতা থানার বেশ কিছু অংশ বন্যায় ডুবে গেলে তালগাছ কেটে ডোঙা তৈরী করে অথবা পানসীতে যাতায়াত করতে হ'ত। ডোঙাতে দাঁড় হিসাবে যেটি ব্যবহার করা হত সেটির স্থানীয় নাম "ক্যারল"।

মজানদীর সংস্কার ও বন্যা প্রতিরোধ

বন্যা প্রতিরোধের জন্য নিম্ন দামোদর উপত্যকা সংস্কারকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ৪৪ কোটি টাকার, একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। প্রকল্প অনুযায়ী প্রাথমিক পর্য্যায়ে নিম্ন দামোদর সংস্কার করায় এই জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বাৎসরিক বন্যার হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে কাজের উল্লেখযোগ্য অংশ হ'ল শ্যামপুর থানা এলাকার গড়চুমুকে ৫৮ কপাটযুক্ত একটি জল নিয়ন্ত্রণ দরজা [স্লুইস গেট] বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি "জল নিয়ন্ত্রণ দরজা" বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এটি বৃহত্তম। হুগলী জেলার মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁ দিক বরাবর যে বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনা আছে সেটি হাওড়া-হুগলীর সীমান্তে এসে শেষ হবে। বাঁধ তৈরীর কাজ

শেষ হ'লে বার্ষিক বন্যার কবল থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের পরিত্রাণ ঘটবে। সেই সঙ্গে সেচ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটবে। জেলার চাষ-বাসের ক্ষেত্রে এর ফলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটবে।

ভূমিকম্প

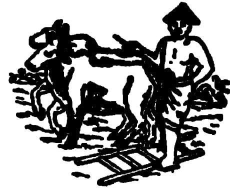
১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে শিবপুর ট্রামডিপোর নিকট অবস্থিত শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর তদনাস্তীন ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় একথা লাইব্রেরীর সম্পাদক বিনোদ বিহারী হালদার বার্ষিক বিবরণীতে উল্লেখ করেন।

১৯০৫ (কাংড়া), ১৯০৬ (কলিকাতা), ১৯০৮ (শ্রীমঙ্গল), ১৯৩০ (ধুবড়ি) ১৯৩৪ (বিহার-নেপাল) এবং ১৯৬৪ কলিকাতা) খ্রীষ্টাব্দে যে সব ভূমিকম্প হয় তার রেশ হাওড়াতেও অনুভূত হয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে উলুবেড়িয়া ও বাগনানের অনেক বাড়ী এবং বলুহাটি উচ্চ বিদ্যালয় ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

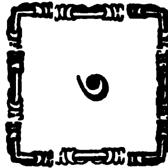
সাইক্লোন

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের সাইক্লোন বা আশ্বিনের ঝড়ে হাওড়া জেলায় ১৯৭৮ জন লোক এবং ১২.৭৬২টি গৃহপালিত পশু মারা যায়। পরবর্তীকালে বোটানিকেল গার্ডেনের এলাকাভুক্ত অঞ্চলে সিরাজদ্দৌলার আমলের বহু আমগাছ এই ধরণের ঝড়ে বিনষ্ট হয়।

—: :—



অর্থনীতি



কৃষি

যতদিন না ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ঢেউ জাহাজ বোঝাই হ'য়ে ভাগীরথী বেয়ে হাওড়ার মাটিতে এসে আছাড় খেয়েছিল ততদিন হাওড়ার অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান। কিন্তু ইউরোপীয় মূলধন ও শিল্পোদ্যোগে অচিরে তার চেহারা গেল পাল্টে। বর্তমানে এই জেলার অধিবাসীদের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ চাষী, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৫৪ শতাংশ। অতএব হাওড়ার অর্থনীতিকে এখন আর কৃষিপ্রধান বলার উপায় নাই। তবুও যেহেতু কৃষি, মানুষ ও মেশিনের খাবার যোগায় তাই কৃষির কথাই প্রথমে আলোচনা করব।

১৮৪৫-এর সার্ভেম্যাপে দেখা যায় হাওড়ায় আবাদী জমির পরিমাণ ৪০০ বর্গমাইল। এর মধ্যে একর হিসাবে ধানচাষ হয় ৫৬০০, তুলা—৪00, নীল—৪০০, তৈলবীজ—১২০০, তন্তু-জাতীয় উদ্ভিদ—২০০০, আখ—২০০০, তামাক—২০০, তরি-

তরক'রী—২০০ এবং অন্যান্য ফসল ১৬০০ একরে। যে জমিতে তুঁতের চাষ হ'ত সে সব জমির বার্ষিক খাজনা ছিল ৮-১০ টাকা। আজকাল নীল, তৈলবীজ, আখ, তামাক প্রভৃতির চাষ এ জেলায় হয় না।

বিংশ শতকের শুরুতে [১৯০৩-৪ খ্রীঃ] ইম্পিরিয়াল গেজেটের হিসাব অনুসারে—

মহকুমা	আয়তন	কর্ষিত জমি	কর্ষণযোগ্য পতিত
	[বর্গমাইলের	হিসাবে]	
হাওড়া	১৭৩	৫৮	৭
উলুবেড়িয়া	৩৩৭	১২০	১৬
মোট	৫১0	১৭৮	২৩

সাম্প্রতিক হিসাবে মোট জমি ৩৭২.২৫০ একরের মধ্যে চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ ২,৬০,৫০০ একর। উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকায় প্রথমেই আছে স্থলের ফসল ধান, তারপর জলের ফসল মাছ।

ধান—জেলার সর্বত্রই ধান চাষ হয়। চাষের উপকরণ বেশীর ভাগ জায়গায় মান্ধাতার আমলের কাঠের লাঙ্গল ও বলদ হ'লেও কিছু কিছু জায়গায় কলের লাঙলের ব্যবহার শুরু হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমূহের ফলে জলসেচ ও জল নিকাশী ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং পতিত জমিকে চাষযোগ্য করায়, উন্নত ধরণের সার ও বীজ ব্যবহার হেতু আমন এবং

গ্রীষ্মকালে জলা জায়গায় বোরো জাতীয় ধানচাষের পরিমাণ আগের থেকে অনেক বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও জেলাটি আজও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়।

৩৮,২০০ একর আবাদী জমির মধ্যে ধান জমি ও ধান উৎপাদনের হিসাবটি হ'ল—

বছর	ধানচাষের জমি [হাজার একর]	উৎপাদন [হাজার টন]	একর পিছু গড় উৎপাদন [মণ হিসাবে]
১৯৬৪-৬৫	২১১'৬	১০৫'৮	১৩'৬১
১৯৬৫-৬৬	২১৯'১	৬৫'৮	৮'১৭
১৯৬৬-৬৭	২১৬'৫	৬৯'৩	৮'৭১
১৯৬৭-৬৮	২১৮'৯	৭৩'৩	৯'১১
১৯৬৮-৬৯	১৮৫'৫	৭৬'৮	১১'১৭

আধুনিক চাষ-ব্যবস্থার অঙ্গহিসাবে ১৯৬১ তে ৪১১টি এবং ১৯৬৬ তে ৪৬১টি কলের লাঙল ব্যবহৃত হয়। উদয়নারায়ণপুর, ডোমজুড়, পাঁচলা, সাঁকরাইল, আমতা [১ ও ২ নং ব্লক], বাগনান [১ ও ২ নং ব্লক] এবং জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অগভীর নলকূপ, দামোদর নদ থেকে জলসেচের জন্ত পাম্প, উন্নত ধরণের সার ও বীজের ব্যবস্থা হওয়ায় অতীতের বহু এক ফসলী জমি আজ দো-ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। কৃষি উন্নয়ণ সমবায় ব্যাঙ্কগুলি [ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক] আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করার জন্ত

"পাওয়ার টিলার" প্রভৃতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে চাষীরা যাতে জমি বন্ধক রেখে সহজ শর্তে ঋণ সংগ্রহের সুবিধা পায় সেজন্য একটি প্রকল্প চালু করেছেন।

ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটিও চাষ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে জড়িত। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দের আইনে একক মালিকাধীন জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল ২৫ একর। ১৯৭১-এ আইনটিকে সংশোধন করে নূতন সীমা নির্দিষ্ট হয় সেচ এলাকায় ১২.৪ একর এবং সেচহীন এলাকায় ১৭.৩ একর। ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বাস ও চাষযোগ্য জমি বণ্টনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সরকারী প্রচেষ্টা অনুসারে পাঁচলা ও সাঁকরাইল ব্লকে প্রায় সাত শতাধিক বাস্তু ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। আমতা, উলুবেড়িয়া, এবং ডোমজুড় এলাকাতেও অনুরূপ প্রকল্পের কাজ চালু হয়েছে।

পাট—একমাত্র শ্যামপুর থানা ছাড়া হাওড়ার আর সব জায়গাতেই ধানের পরবর্তী প্রধান অর্থকরী কৃষি পণ্য পাট। কয়েক বছরের পাট চাষের হিসাব-নিকাশের চিত্রটি নিম্নরূপ—

বছর	কর্ষিত জমি (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন	একর পিছু গড় উৎপাদন (মণ)
১৯৬৪-৬৫	১৪.২	৬২.৫	৪.৬১
১৯৬৫-৬৬	১২.২	১৭.৭	১.৪৫
১৯৬৬-৬৭	১১.৬	২২.৫	১.৯৬
১৯৬৭-৬৮	১৮.০	৭৫.৬	৪.২০
১৯৬৮-৬৯	২.৩	৭.২	৩.১৩

আলু—দামোদর, মাদারিয়া খাল, কৌশিকী ও সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী জমিতে আলুর চাষ হয়। আলু চাষের হিসাব-নিকাশের চিত্রটি নিম্নরূপ—

বছর	কর্ষিত জমি (হাজার একর)	উৎপাদন (হাজার টন)	একর পিছু গড় উৎপাদন (মণ)
১৯৬৩-৬৪	৩˙৯	১১˙৮	৮২˙৬৫
১৯৬৪-৬৫	৪˙৯	২৩˙১	১২৮˙৫১
১৯৬৫-৬৬	৫˙১	২১˙৯	১১৬˙৯২
১৯৬৬-৬৭	৪˙৫	১৬˙৫	৯৯˙৭৫
১৯৬৭-৬৮	৫˙৭	১৯˙৭	৯৩˙৯০

একসময় আন্দুলে আলুব বেশ বড় সড় একটি গঞ্জ ছিল, যেখানে হুগলী জেলার বৈদ্যবাটী ও মশাট থেকে প্রচুর আলুর আমদানী ঘটত।

পান—পান আমতা থানার দ্বিতীয় এবং শ্যামপুর ও উলুবেড়িয়া থানার তৃতীয় অর্থকরী ফসল। বৈদ্যনাথপুর, আটপুর, ঝাপড়দহ, চক্রবেড়, খসমন্নড়া, মুনটিয়া, বাঁকুল প্রভৃতি গ্রামে প্রচুর পান জন্মায়। পান চাষীদের মধ্যে বারুই সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশী। একসময় আন্দুল এলাকার জুজৈশ্বর গ্রামের পান আন্দুল বাজার-ঘাট থেকে নৌকাযোগে কলকাতার পানপোস্তায় রপ্তানি হ'ত। বাগনান

থানার বাঁটুলের পান সুগন্ধযুক্ত। গাজিপুরের (আমতা) পানও বিখ্যাত।

নারিকেল—মাকড়দহ, ডোমজুড়, কোরোলা, মৌড়ী, পাঁচলা, নিবড়ে, প্রভৃতি গ্রামের নারিকেল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। এক সময় আন্দুলের অনেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে গোলা বেঁধে সারা বছরের নারিকেল জমিয়ে রাখতেন। আড়তে ১০ থেকে ২৫ লক্ষ পর্য্যন্ত নারিকেল জমা থাকতো। সময় বুঝে জলপথে এগুলি রপ্তানি করা হ'ত।

অন্যান্য ফসল—হাওড়া জেলায় কিছু পরিমাণ গম উৎপাদন হলেও গম বা বাজরা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল সেচের ব্যবস্থা অপ্রতুল। রবিশস্য এবং আখের চাষ জেলার সামান্য অংশেই হয়। আমতা থানা এলাকায় খড়ির চাষ হয়। ফলের মধ্যে নারিকেল ব্যতীত আম, আনারস, কাঁঠাল, পেঁপে, আতা, জাম, কুল, পেয়ারা, কলসা, চালতা, কতবেল, আমড়া, তেঁতুল, বাতাবীলেবু, খেজুর ও তাল প্রধান। দামোদর নদের চড়ায় হয় পটল ও তরমুজ। সাঁতরাগাছির ওলও নামকরা। পাঁচলা, রঘুদেবপুরে সুপারি গাছ প্রচুর। শোনা যায় পাঁচলার জায়গীর শেখের পরামর্শে জনৈক পর্ত্তুগীজ এ অঞ্চলে এরারুট চাষের প্রবর্ত্তন করেন।

জলের ফসল মাছ—উলুবেড়িয়া থেকে ডায়মণ্ডহারবার পর্যান্ত হুগলী নদীর মৎস্যচারণ ক্ষেত্র শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত এই এলাকায় প্রচুর

তপসে মাছ ধরা হয়। উলুবেড়িয়া থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই মাছ রপ্তানি হয়। একসময় খোড়হাট ও বাসুপুরের তীওর সম্প্রদায়ভুক্ত মৎস্যজীবীরাই তীরবর্তী হুগলী নদীতে [illegible] ধরার এক-চেটিয়া অধিকার ভোগ করত।

জেলার সর্বত্র পুকুর, খালবিলে মাছ ধরা হয়। খোদ হাওড়া শহরেও পুকুরের সংখ্যা ছিল প্রচুর। এখন পুকুর বোজানো জমিতে ক্রমশঃ বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ১৯৬০-৬১ এবং ১৯৬১-৬২ তে আমতা থানায় গড়ে বার্ষিক ২৮০০০ মণ মাছ ধরা হয়েছিল। নভেম্বর মাসে ধরা মাছের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী—৪১৮৪ মণ। বিভিন্ন অঞ্চলে মাছ রপ্তানির এটি একটি প্রধান কেন্দ্র। জেলে সম্প্রদায় ও মাছের কারবারীরা নদী, খাল, বিলের অগভীর জলে কাপড় বা গামছার সাহায্যে জলে ভাসমান মাছের ডিম সংগ্রহ করে নির্বাচিত পুকুরে সেই ডিম ফোটায়। তারপর সেই ডিম ও পোনা দেশের সর্বত্র বিক্রীত হবার জন্য জমা হয় বাকল্যাণ্ড ব্রীজের কাছে হাওড়ার মাছের আড়তে।

গৃহপালিত ও বন্যপ্রাণী

গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে গরু, মোষ ও ছাগল প্রধান। এ ছাড়া আছে ভেড়া, ঘোড়া, শুয়ার, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি। জেলার দক্ষিণে যখন বনের অস্তিত্ব ছিল, তখন প্রচুর বুনো শুয়োর এবং সময় বিশেষে চিতা বাঘ দেখা যেত। বছর চল্লিশেক আগে পাঁচলা-

রঘুদেবপুর ও গৌরীগঙ্গা গাঙ সন্নিহিত অঞ্চলে বনের অস্তিত্ব ছিল। এখন কোন কোন অঞ্চলে বাঁদরের উৎপাত দেখা যায়। কয়েক বছর আগে জেলার পশু সম্পদের এক সরকারী সমীক্ষায় নিম্নলিখিত চিত্রটি পাও[illegible]য়েছিল—

গাভী	১,২৭,৯৬৮	বলদ	১,০৮,৭৯৬
বাছুর	১,৪০,৯৭০	মহিষ (স্ত্রী)	১,০৩১
মহিষ (পুং)	৯৭৯	মহিষ (বাছুর)	৮৭৪
ভেড়া	২,৮৮৪	ঘোড়া	১,৩৪,৯৪২
শূকর	৭০৩	মুরগী	২,৩১,৭৯০
হাঁস	১,৩৯,৩২৯		

১৯৭৮-এর অক্টোবরের সর্ব্বনাশা বন্যার ফলে এই হিসাবের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ১৯৪০-এ রেল কর্ত্তৃপক্ষ প্রকাশিত বাংলায় ভ্রমণ পুস্তকে লেখা আছে প্রতি বছর বীরশিবপুরের মাঠে শিকারীরা পাখী শিকার করতে আসেন।

শিল্প

পশ্চিমবঙ্গের ৬টি উন্নততর শিল্পাঞ্চলের মধ্যে একটি হ'ল হাওড়া সদর মহকুমার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুর শিবপুর এলাকা। এই এলাকায় অবস্থিত শিল্প সমূহের মধ্যে পাট, ময়দা, দড়ি তৈয়ারী, ডকইয়ার্ড, জাহাজ নির্মাণও মেরামত, তেলকল, গ্যাস, পেট্রোলিয়াম, রসায়ণ শিল্প প্রভৃতি প্রধান। জেলার মোট আয়ের

৫০% আসে শিল্প থেকে এবং শতকরা ৩৬ জন শিল্প-নির্ভর। ১৯৬০-৬১-তে শিল্প থেকে আয় হয়েছিল ৬৮·৯৫ কোটি টাকা—জেলার মোট আয়ের ৪৯·১৫ শতাংশ। এই তুলনায় ঐ সময় কৃষিজাত আয়ের পরিমাণ ছিল ১১·১৩ শতাংশ বা ৮·৯০ কোটি টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়। তার ধারা অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রিটিশ জাহাজ বোঝাই হ'য়ে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে হুগলী নদীর তীর স্পর্শ করে। ফলে হাওড়ায় প্রাক্-শিল্প বিপ্লবোত্তর যুগের হস্ত ও কুটির শিল্পের অস্তিত্ব ক্ষীয়মান হ'তে থাকল, বিস্তৃতি ঘটতে লাগল আধুনিক যন্ত্রশিল্পের। পুরাতন চলি গেল, নূতনেরে করি দিয়াস্থান।

হাওড়ায় আধুনিক যন্ত্রশিল্পের পত্তন হয় সর্বপ্রথম। হাওড়া শহরে—জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে ভিত্তি করে। হাওড়ায় রেল ষ্টেশন স্থাপিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঘটনাটি শুধুমাত্র হাওড়ার নয়, সারা ভারতে যন্ত্র-বিপ্লব শুরু হওয়ার পক্ষে একটি দিগ্‌দর্শন। হাওড়ার জাহাজ নির্মাণশিল্প পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাথে ভারতের যোগসূত্রের সহায়ক হয়। হাওড়ার রেল সঞ্জতয় করে দেশের এক অঞ্চলের সাথে আর এক অঞ্চলের যোগাযোগ। রেলপথ বেয়ে হাওড়ায় এল বিহার, যুক্তপ্রদেশের সুলভ শ্রমিক, শিল্পের কাঁচামাল। সহজ হ'ল উৎপাদন ক্ষেত্রের সাথে বাজারের যোগসূত্র। এ সম্পর্কে জহরলাল নেহেরুর ডিসকভারি অব্

ইণ্ডিয়া গ্রন্থে লেখা হয়েছে—"The coming of the railways to India brought the industrial age on its positive side...........In 1860 the duty on imported machinery.... ....was removed, and large scale industry began to develop, chiefly with British Capital. First came the jute industry of Bengal."

১৭৯০ খ্রীঃ নাগাদ কলকাতায় প্রায় ১৫টি এজেন্সী হাউসের সন্ধান পাওয়া যায়। এজেন্সী হাউসগুলি নীলের চাষ ও নুন প্রভৃতির ব্যবসা করত, ক্রমে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিরও পত্তন করে। নীল চাষে ভাঁটা পড়ার পর ১৮৩০ খ্রীঃ থেকে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এজেন্সী হাউসগুলির দরজা একের পর এক বন্ধ হ'তে থাকে। ব্রিটিশ মূলধনের সাহায্যে তখন জন্মগ্রহণ করে এক নূতন ধরনের শিল্প-পরিচালন ব্যবস্থা—যার নাম ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা। ম্যানেজিং এজেন্সীর ছত্রছায়ায় রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতন হাওড়াতেও যান্ত্রিক শিল্পের পত্তন ও প্রসার ঘটে।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মাল গুদামজাত করার জন্য শালিমার রেল টার্মিনাস তৈরী হয়। রেল চলাচল বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৪ তে হাওড়াতে রেল কারখানা স্থাপিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমদিকে ইম্পিরিয়াল গেজেটে হাওড়ার যে শিল্পচিত্রটি আঁকা আছে, তা হ'ল মোট ৫৬টি ফ্যাক্টরীর মধ্যে কাপড়কল ৬, চটকল ৯, পাটবাঁধাই ৭, কাগজকল ২, ময়দাকল ৩,

রেলের সাজসরঞ্জাম তৈরী ও মেরামতির কারখানা ৪, মুন তৈরীর কারখানা ২, ছাপাখানা ১, এছাড়া চুণ ও সিমেন্ট প্রভৃতি কয়েক ধরণের কারখানা। ৫৬টি কারখানার মোট কর্মীসংখ্যা ছিল ৫১,০০০ জন।

১৯০৩-৪ খ্রীঃ-এ কাপড়কলগুলির মোট উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৮,০০০,০০০ পাউণ্ড দাম ৫৬ লাখ টাকা এবং কর্মী-সংখ্যা ৪,৪০০ জন। চটকলগুলিতে নিযুক্ত ছিল ২৭,০০০ জন কর্মী – যারা উৎপন্ন করত প্রায় ২৫১ লক্ষ টাকার মাল। বালীতে অবস্থিত কাগজ কলটিতে তৈরী হ'ত অপরিশোধিত বাদামী-রঙের কাগজ, যার বার্ষিক মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা। বড় আকারের লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ব্যতীত ১৬টি ছোট ছোট দেশী প্রতিষ্ঠান এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল। ছোট কারখানাগুলিতে কাঁচা লোহা থেকে তৈরী হ'ত ওজনদাঁড়ি, আখমাড়াই কল, রেলিং প্রভৃতি। বালীখাল বরাবর ৯১টি ইট খোলায় ২৬৬০ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হ'ত। মোট ইটখোলার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কারখানার উৎপাদন ছিল দেশীপ্রথায়। উৎপাদিত পণ্যসমূহের সামগ্রিক মূল্য ছিল ৪ লক্ষ টাকার মতন। যান্ত্রিক শিল্পের অগ্রগতি জোর কদমে চলতে থাকলেও দেশীয় শিল্পগুলি তখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। হাতে তৈরী কাগজ ছাড়াও আমতা থানায় রেশমকীট পালন করা হ'ত। উৎপাদিত রেশমের বার্ষিক মূল্য ছিল ১২,৫০০ টাকা। সাঁক-

সাঁকরাইল, পাতিহাল, চণ্ডীপুর এবং বালীতে ছিল চীনামাটির (Pottery) তৈরী জিনিষপত্রের উৎপাদন কেন্দ্র। উৎপাদিত চীনামাটির জিনিষপত্রের বার্ষিক মূল্য ছিল ১,১৭,০৩০ টাকা। বালী থানার অন্তর্গত ব্যারাকপুরে ছিল টালি এবং আন্দুলে নারিকেল তেল তৈরীর কেন্দ্র। বহু লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতির জন্যে হাওড়া ভারতের শেফিল্ড নামে অভিহিত হ'তে থাকে।

১৯৬২ তে পাওয়া কয়েকটি প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ'ল—কাপড়কল ১৭, পাটকল ২২, ময়দাকল ৮, ধানভানাই ১৯, ডালভাঙ্গাই কল ২৪।

দড়ি নির্মাণ শিল্প—হাওড়ার ডক ও জাহাজ নির্মাণ কারখানা পৃথিবী খ্যাত হ'লেও সবচেয়ে পুরানো শিল্প নয়। ডকের চেয়ে পুরানো হ'ল হাওড়ার দড়ি তৈরীর কারখানাগুলি। ১৭৯২-৯৩-এ আঁকা আপজনের মানচিত্রে [Upjohn's Survey Map] দেখা যায়, দু'টি পথের নামকরণ করা হয়েছে রোপ-ওয়াক [Rope-Walk] নামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রজ্জুপথ গুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মিঃ টুলকার্ট। দড়ির কারখানার মালিক ছিলেন মেসার্স ক্লার্ক এণ্ড কোং। এই দড়ি, প্রধানতঃ নারকোল দড়ি। প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র পাঁচলা, সাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া এবং বাউড়িয়া। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হাওড়া শহরের চারটি

বড় বড় দড়ি তৈয়ারীর কারখানার নাম হ'ল—[১] ডব্লিউ এইচ হার্টন এণ্ড কোং [ঘুসুড়ি] [২] শালিমার রোপ ওয়ার্কস [শালিমার] [৩] দি ভিক্টরী ষ্টীম রোপারী [শিবপুর] এবং [৪.] গঙ্গাধর ব্যানার্জী এণ্ড কোং [শিবপুর]। বর্তমানে অন্ততঃ একটি কারখানায় দড়ি তৈরীর কাঁচামালের পরিবর্তন ঘটেছে। কারখানাটির অবস্থান আন্দুলে। পঃ বঃ সরকারের ভ্যাগ্রান্সী ডাইরেক্টরটের পরিচালনাধীন আন্দুল ক্যাজুয়াল ভ্যাগ্রাণ্টস্ হোম গত একযুগ যাবৎ ভবঘুরেদের দিয়ে আবর্জনা হিসাবে রাস্তায় ফেলে দেওয়া ডাবের খোলা সংগ্রহ করে তার থেকে উৎকৃষ্ট দড়ি ও পাপোষ তৈরী করাচ্ছেন। দামে সস্তা ও মানে উৎকৃষ্ট বলে বিদেশেও এসব জিনিষের চাহিদা যথেষ্ট। শিবপুরের গ্যাঞ্জেস রোপ কোম্পানীর সুনাম বাজারে যথেষ্ট।

ডক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতী শিল্প—১৭০৬ খ্রীঃ-এ জবচার্ণক ও তার সঙ্গীরা হাওড়ায় ডক নির্মাণের যে পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা শুরু করেন সেটি শুধু হাওড়ার নয়। বাংলার নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ডক স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টা। ১৭৯৬ খ্রীঃ-এ শালকেতে মিঃ বেকন যে ডক প্রতিষ্ঠা করেন তার কাজ শুরু হয় অরফিয়ুস নামক একটি জলযান মেরামত করে। এই সময় গঙ্গানদীর পূর্ব ও পশ্চিম দুই পাড়েই একের পর এক ডক তৈরী হ'তে থাকে ১৮২৬-এ কলকাতায় ষ্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরীর সময় ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ডক ভাঙ্গাপড়ায়, নদীর পূর্বতীরে নতুন ডক তৈরী বন্ধ হয়

আর পশ্চিম তীরে ডক নির্মাণ প্রচেষ্টা জোরদার হয়। [ভাগীরথীর পশ্চিমতীর তখন পূর্বতীর অপেক্ষা গভীরতর ছিল।] ডক নির্মাতারা গঙ্গা পেরিয়ে পশ্চিমে বসবাস শুরু করেন। ফলে বিশপ হেবার-এর ভাষায় হাওড়া হয়—Chiefly inhabited by ship builders.

জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতী শিল্প—উনবিংশ শতকের শুরুতে হাওড়ায় যে সব ডক ছিল তার মধ্যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গোলাবাড়ী এলাকায় ছিল মিঃ ম্যাকেঞ্জীর ডক এবং পেটেণ্ট স্লিপ [১৮১০] যেটি ১৮১৫ তে কমার্শিয়াল ডক ও ১৮২৮-এ ক্যালিডোনিয়ান ডক নামে পরিচিত হয়। ১৮২৮-এ হাওড়ায় তৈরী হয় প্রথম জাহাজটানা বাষ্পীয় পোত "ফরবেস"। ১৮২৯-এ ফ্যালকন নামে যে জাহাজটি তৈরী হয় সেটিকে আফিম ব্যবসায়ীরা চীন দেশে নিয়ে যান। ১৮১১-২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোর্ট গ্লষ্টারে যে ২৭টি জলযান তৈরী হয়। তাদের সম্মিলিত টনেজ ছিল ৯৩২২ টন। ১৮২৭-এ সরকারী ষ্টীমার ব্রহ্মপুত্র হাওড়া থেকে জলযাত্রা শুরু করে।

শালকের হুগলী ডক ইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ বসুমল্লিক ১৮৩৮-এ জলপথে মালপত্র বহনের ব্যবসা শুরু করেন উইলিয়াম ওয়ালেস নামে একটি জাহাজ কিনে। পরবর্তীকালে মার্টিন কোম্পানী হুগলী ডক ইয়ার্ডের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন।

১৮৪৯-এ রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাঁতরা ও কালীকুমার কুণ্ডুর অংশীদারিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডক। উনবিংশ শতকের শেষভাগে শালকে থেকে শিবপুর পর্যন্ত প্রায় ৮টি বড় ডক ছিল। শ্রীতারকনাথ প্রামাণিক এবং কে সরকারের ডক ছিল শালকিয়ায়। শ্রী কে, মুখার্জী ও কয়েকজন ইউরোপীয়ানের অংশীদারী কারবার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এ্যালবিয়ন ডক। হাওড়া ব্রীজের উত্তরে চাঁদমারী ঘাট এবং দক্ষিণে রামকৃষ্ণপুর ও শিব-পুরেও ডক ছিল। শেষ অবধি যে চারটি চালু ডকের নাম পাওয়া যায়, সেগুলি হ'ল—

(১) পোর্ট কমিশনারস্ ডক (হাওড়া), (২) বৃটিশ-ইণ্ডিয়া ডক (শালকিয়া), (৩) হুগলী ডক (গোলাবাড়ী) এবং (৪, ক্যালিডোনিয়ান ডক (গোলাবাড়ী)। জেলাওয়ারী হিসাবে এখনও ভারতের যে কোন জেলার চেয়ে হাওড়ায় ডকের সংখ্যা সর্বাধিক বস্তুতঃ এক সময় হাওড়ায় মিঃ বিগস্-এর কারখানায় যুক্ত রাজ্য-গামী সামুদ্রিক বাণিজ্য পোতগুলির মেরামতী কাজ সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল।

লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প—লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প হাওড়া জেলার অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লব ভারতীয় শিল্প বিকাশের ধারাকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে তার সার্থক চিত্র অঙ্কিত আছে হাওড়ার

লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ইতিহাসে। হাওড়ার শিল্পোন্নয়ন হুগলীর পরে শুরু হ'লেও ১৯০১ খ্রীঃ-এর মধ্যে হাওড়ায় বিভিন্ন প্রকারের বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ঘটে। C. M. P. O 'র সমীক্ষা অনুসারে ১৯৫১-৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিল্পটির বৃদ্ধির হার ৪০ শতাংশ। জেলার শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রায় ৬২% আলোচ্য শিল্পটির দখলে। হাওড়ার শিল্পাঞ্চলকে অনেকে বার্মিং-হামের সঙ্গে তুলনা করেন। হাওড়ার লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট ও বড়—দু'ধরণের। প্রিন্স দ্বারকা নাথ ঠাকুর যে সময় টেগোর কোম্পানীর পত্তন করেন, সেই সময়—১৮৬৭ তে কিশোরী লাল মুখার্জী শিবপুর আয়রণ ওয়ার্কস স্থাপন করেন। কারখানাটিতে লোহা ঢালাই, রেলিং ও ছোটখাট যন্ত্রপাতি তৈরী হ'ত।

হাওড়ার কারখানাগুলির মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে বড় হ'ল লিলুয়ার রেল কারখানা, কিন্তু সবচেয়ে পুরানো হ'ল বার্ণ কোম্পানী। যেটির প্রতিষ্ঠা ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে এবং যৌথ কারবারী সংস্থারূপে আত্মপ্রকাশ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে। কারখানাটি সম্পর্কে Howrah—Past and Present-এর লেখক মিঃ সি. এন. ব্যানার্জীর মন্তব্য—The visitor to Howrah, if he goes towards our Strand Road will observe a building in the shape of a tower and if he enquires, he will learn that it belongs to Burn & Co. of Calcutta, a firm of

long standing. The tower was constructed in imitation of the tower of Babel of old by Mr. Gray, who opened a branch of Burn & Co. at Tekalghat in 1848. If our enquirer steps inside the premises, he will see a number of different faces on the first building to the left. This he will learn, was also built by Mr. Gray as the nucleus of the large engineering yard now in existence. Mr. Gray called this establishment the "Babel Foundry" from the fact of his employees speaking so many different languages.

বার্ণ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল এ, সুইণ্টন। ১৭৯৯ থেকে ১৮১৯ খৃঃ পর্য্যন্ত মিঃ আলেকজাণ্ডার বার্ণ এবং ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ পর্য্যন্ত স্যার রাজেন মুখার্জী কোম্পানীর কর্ণধার ছিলেন। স্যার রাজেন মুখার্জী ও তাঁর পুত্র স্যার বীরেন মুখার্জীর আমলে মার্টিন-বার্ণ-এর নাম একত্রে উচ্চারিত হত। বর্ত্তমানে বার্ণ কোম্পানী কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত এবং মার্টিন কোম্পানীর সহিত সংস্রব রহিত। ১৯৭৩-এর ৬ই ডিসেম্বর বার্ণ কোম্পানীর কারখানার পরিচালনা ভার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গ্রহণের উদ্দেশ্যে সংসদে বিল গৃহীত হয় এবং ১৯।১২।১৯৭৩ তারিখে সরকার এটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। ১৮১১-এর আগে উইলিয়াম জোন্স

শিবপুরে প্রতিষ্ঠা করেন এ্যাল্‌বিয়ন মিলস্‌, কারখানা স্থাপনের উপযোগী জায়গার সন্ধানে সারা ভারত ঘুরে ২০।১১।১৯২১ তারিখে মিঃ ও, আর, উইলিয়াম শিবপুরের ভড় পাড়ায় হেনরী উইলিয়াম (ই) লিঃ নামে একটি কারখানার স্থাপন করেন। কর্মী সংখ্যা ছিল ২০০ জন। ৯৭, আন্দুল রোডে স্থানান্তরিত হবার পর ১৯৩৪-এ কারখানার নূতন নাম হয় গেষ্ট-কীন-উইলিয়ামস্‌ লিঃ এবং ১৯৫৬তে যৌথ মূলধনী কোম্পানী রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯২০তে প্রতিষ্ঠিত ব্রিজ এণ্ড রূপ কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ-এর প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য রেল ওয়াগন। সম্পূর্ণ বাঙালী মালিকানায় রেল ওয়াগন তৈরীর জন্য সাঁত্রাগাছিতে রেমন ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা এম, এন, রায়ের পরলোকগমনের পর কারখানাটির অকাল মৃত্যু ঘটে। ভাঙাগড়ার চিত্র অনুসরণ করলে দেখা যায় একসময় হাওড়ার শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিল—

লৌহ ও ইস্পাত—

হাওড়ায়—হাওড়া আয়রণ ওয়ার্কস্‌, ভিক্টোরিয়া আয়রণ ওয়ার্কস্‌, হাওড়া ফাউণ্ডারী, বার্ণ এণ্ড কোং (বার্ণের বীপরীত দিকে) জন কিং কোং এবং জেমপ কোং যাদের তেল মিল ছিল তেল কল ঘাটে।

শালকিয়ায়—বৃটিশ ইণ্ডিয়া ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্‌ ও শিবপুর আয়রণ ওয়ার্কস্‌।

শিবপুরে—শালিমার ওয়ার্কসপ্, এ্যালবিয়ণ কাউণ্ডারী ও গ্যাঞ্জেস ওয়ার্কসপ্।

রেলগাড়ী নির্মাণ শিল্প—

লিলুয়ায় — ই, আই, আর কোম্পানী।

সাঁত্রাগাছি — বি, এন, আর কোম্পানী।

বাঁকুড়ায় — মার্টিন এণ্ড কোম্পানী।

রাজ্য কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার ইন ফরমেশন সেণ্টার [প্লানিং সেল] কর্তৃক প্রকাশিত—"কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প—বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, হাওড়া" শীর্ষক পুস্তিকা অনুসারে ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেণ্ট এ্যাণ্ড রেগুলেশন এ্যাক্ট অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত যন্ত্র শিল্পের সংখ্যা এই জেলায় ১২০টি এর মধ্যে আছে মূল ধাতুশিল্প ৫২টি, ইঞ্জিনীয়ারিং ২৭টি এবং বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতির কারখানা ২টি।

প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। বিনানী মেটাল ওয়ার্কস্ লিঃ, ফোরশোর রোড, শিবপুর।

২। ব্রিজ এ্যাণ্ড রুপ কোং লিঃ, শালকিয়া। কারখানা এলাকার পরিমাপ ৮ একর।

৩। বার্ণ এ্যাণ্ড কোং।

৪। হাওড়া টুলস্ লিঃ [প্রঃ ২৯।৭।১৯৬৬], নিউ কোলেরা গ্রাম।

৫। হুগলী ডকিং এ্যাণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ এটির দু'টি ইউনিট—শালকিয়া ইউনিট ও পোর্ট ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস ইউনিট।

৬। ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ [১৯৩৪] বেলুড়।

৭। ব্রিটিশ পেণ্টস্ লিঃ, ১৪ ও ১৫ স্বর্ণময়ী রোড, শিবপুর।

৮। শালিমার পেণ্টস্ লিঃ—১৯০২, প্রতিষ্ঠাকালীন নাম শালিমার পেণ্ট, কালার এ্যাণ্ড ভার্নিশ কোং লিঃ।

এছাড়া আছে রেমিংটন র‍্যাণ্ড এ্যাণ্ড কোং লিঃ, গ্যাঞ্জেস প্রিন্টিং ইঙ্ক কোং লিং, এশিয়াটিক অক্সিজেন লিঃ, হিন্দ ওভারসিজ লিঃ, ওরিয়েণ্ট আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ প্রভৃতি। হাওড়ার ক্ষুদ্রায়তন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রধানতঃ বেলিলিয়াস রোড ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত। রাজভবন থেকে ৫৬ মাইল এলাকার মধ্যে অবস্থিত ক্ষুদ্র শিল্পের ৭৫%এর অবস্থান হাওড়ায়। ১৯৫১-৫২তে ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৭৭৭ এবং সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ৫৩০। ব্যুরো অব এ্যাপ্লায়েড ইকনমিক্স এ্যাণ্ড ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের গণনা অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬তে হাওড়া জেলার ফ্যাক্টরীজ্ এ্যাক্ট অনুসারে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন ক্ষুদ্রশিল্পের সংখ্যা ছিল ১৬,৭৪০ ও কর্মরত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৭,০৭০ জন। ১৯৭১-এর ৩১শে মার্চ পর্যান্ত রাজ্যের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার বিভাগে ক্ষুদ্রশিল্প হিসাবে নাম লেখানো প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা ছিল ৩০১০টি যার মধ্যে ধাতু শিল্পই সব চেয়ে

বেশী অংশ দখল করেছিল—২৪.৯%, যন্ত্রপাতি তৈরী [বৈদ্যুতিক যন্ত্র ছাড়া] শিল্পের অংশ ছিল মূলধাতব শিল্প ২০.৪% এবং রাসায়ণিক দ্রব্য শিল্প ৫.৮ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পের মধ্যে ছিল বয়ন সংক্রান্ত, জামাকাপড় তৈয়ারী, যানবাহন তৈয়ারী ও মেরামতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম তৈরী এবং খাদ্য ও পানীয় শিল্প, মোট শিল্প-কর্মীর সংখ্যা ছিল ৫৯,৫০০ জন এবং বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৩৮,৫৩৩.৬ হাজার টাকা। হাওড়া শহরের নিকটস্থ দাশনগরে জাপনী সহযোগীতায় কেন্দ্রীয় সরকার একটি যন্ত্রপাতি নির্মাণের ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছেন।

এ্যালুমিনিয়াম শিল্প

এ্যালুমিনিয়াম শিল্পে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা অগ্রণীয়। খনিজ বক্সাইটের সঙ্গে ক্রায়োলাইট ও কস্টিক সোডা মিশিয়ে এ্যালুমিনিয়াম তৈরী হয়। ভারতে এ্যালুমিনিয়ামের প্রধান উৎপাদক ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়ামের একটি রোলিং মিলের অবস্থান বেলুড়ে। কারখানাটিতে এ্যালুমিনিয়ামের পাত তৈরী হয়।

পাট শিল্প

শিল্পটির শৈশবকালে ১৮৬০ খৃঃ-এ শালকিয়া, শিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে চটকলের সঙ্গে সঙ্গে বাঁধাই কলও স্থাপিত হয়। ঘুষুড়িতে এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া জুট প্রেস-এর প্রতিষ্ঠাতা

ছিলেন মোহন লাল ক্ষেত্রী। ১৮৭৫-এ স্থাপিত হয় গ্যাঞ্জেস মিল, হাওড়া ও শিবপুর মিলের প্রতিষ্ঠা বৎসর ১৮৭৯ খৃঃ। ১৮৯০-এ রামকৃষ্ণপুরে হাওড়া মিলস্ লিঃ ৩১'৮৮ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১-তে শিবপুরে দি ফোর্ট উইলিয়াম কোং লিঃ ৫৬'১৩ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে গঠিত হয়।

পুরাতন সংবাদপত্রের পাতা উল্টালে দেখা যাবে ২৬শে চৈত্র ১২৯০ সোমপ্রকাশ লিখছেন—"হাওড়ায় তুলার কলের কার্য্য ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। পশ্চিম অঞ্চলে তুলার কলে যেরূপ লাভ। হইতেছে হাওড়ার কলে সেরূপ হইতেছে না, কিন্তু চটের কলে উত্তমরূপে লাভ হইতেছে। পাটের গাঁইট কষার জন্য তিনটি কোম্পানী হইয়াছে।"

৩০।৪০ বছর আগেও হাওড়ার ভূগোলে যে সব পাটকলের সগৌরব উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হ'ল—শালকিয়া গানি ফ্যাক্টরী (শালকিয়া), ফোর্ট গ্লাষ্টার জুট মিল (বাউড়িয়া), গ্যাঞ্জেস জুট মিল (শিবপুর), শিবপুর জুট মিল (শিবপুর), হনুমান জুট মিল (ঘুসুরি), সেন্ট্রাল জুট মিল (ঘুসুরি), হাওড়া মিলস্ কোং লিঃ (রামকৃষ্ণপুর), নেশন জুট মিল (সাঁকরাইল), ডেল্টা জুট মিল (সাঁকরাইল), বেলভেডিয়ার জুট মিল (সাঁকরাইল) নিউ বালী জুট মিল (বালী), লরেন্স জুট মিল (বাউড়িয়া), লাডলো জুট মিল (চেঙ্গাইল), প্রেমচাঁদ জুট মিল (চেঙ্গাইল) এবং আলামোহন দাশ প্রতিষ্ঠিত ভারত জুট মিল (দাশনগর)। পাট

বাঁধাই কলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঘুসুরির ইম্পিরিয়াল মিল ও ঘুসুরি মিল, শালকিয়ার—শালকিয়া মিল, এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া মিল এবং ওয়েষ্ট পেটেন্ট মিল আর হাওড়ার হাওড়া হাইড্রোলিক প্রেস।

বালি, বেলুড়, ঘুসুরি, শালকিয়া, রাজগঞ্জ, সাঁকরাইল, মানিকপুর, বাউড়িয়া, চেঙ্গাইল, উলুবেড়িয়াতে প্রতিষ্ঠিত পাটকলগুলির সকলের পূর্ব গৌরব আজ আর অক্ষুণ্ণ নাই। হাওড়া মিলস্ কোং, ভারত জুট চালু আছে। গ্যাঞ্জেস জুট মিল ও শিবপুর জুট মিল দু'টি যথাক্রমে বেঙ্গল জুট মিলস্ কোং ও ফোর্ট উইলিয়াম জুট মিল নামে এখন পরিচিত। ডেল্টা জুট মিল আরও দু'টি মিলের সঙ্গে মিলেমিশে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী থেকে বজবজ এ্যামালগামেটেড মিলস্ লিঃ নামে পরিচিত হ'চ্ছে। ঘুসুরির নস্কর পাড়া জুট মিলস্ কোং, বেলুড়ের শ্রীঅম্বিকা জুট মিল্স লিঃ, রাজগঞ্জের [আন্দুল] ন্যাশনাল কোং লিঃ, নিউ গুজরাট কটন মিলস্ পরিচালিত উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত সিজবেড়িয়ার কানোরিয়া জুট মিলস্-এর নাম পাট শিল্প জগতে সর্বজন পরিচিত।

হাওড়ার পাটকল কর্মীদের ৭৯% অন্য রাজ্যের অধিবাসী। কর্মীদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'ল—বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের হিন্দু এবং বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ-এর মুসলমান।

কাপড় কল

ভারতের প্রথম কাপড় কল ১৮১৮-তে ফোর্ট গ্লাষ্টারে বাউরিয়া কটন মিলস্ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বের কাপড় কলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—ঘুসুরি কটন মিল, ভিক্টোরিয়া কটন মিল, ভারত অভ্যুদয় কটন মিল (১৮৩৩, প্রতিষ্ঠাতা—শীতল প্রসাদ গঙ্গা প্রসাদ) ফুলেশ্বরের নিউরিং মিল এবং মৌরীগ্রাম কটন মিল, পরবর্তীকালের বেলুড়ের দি সেন্ট্রাল কটন মিলস্ লিঃ-এর মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা ; শ্যামপুরে আছে সিদ্ধেশ্বরী কটন মিল।

তাঁত শিল্প

জেলার অর্থনীতির সাথে তাঁতশিল্পের সম্পর্ক বহুদিনের। সিজার ফেড্রিক-এর বর্ণনায় জানা যায় ১৫৮০ তে ব্যাতড় বন্দরে ব্যাপারীরা নানা ধরণের তাঁতের কাপড় বিক্রী করত। তাঁর মতে সে সময় ব্যাতড় ছিল—'a place where merchants sold cloth of bombast of diverse sorts'। মারাঠা আক্রমণের সময় বহু তাঁতি ও রেশম শিল্পী হাওড়া জেলা পরিত্যাগ করেন। ১৭৫৮ তে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বীয় বাণিজ্যিক স্বার্থে গঙ্গার পশ্চিম তীরে কয়েক ঘর তাঁতি বসান। এই সুযোগে ব্যাতড় থেকে কলকাতার বড়তলা নামক স্থানে বসাকদের আদিপুরুষ যাদবেন্দ্র বসাক ও দর্জিপাড়ার শেঠেদের আদিপুরুষ মুকুন্দরাম শেঠ গোবিন্দপুরে নূতন বাসস্থানের পত্তন করেন। শিল্প-বিপ্লব সম্ভূত

সস্তান ম্যাঞ্চেষ্টারের যান্ত্রিক বস্ত্র বয়ন শিল্প কালক্রমে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকায় ভারতীয় বস্ত্র বয়ন শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮০০ খ্রীঃ-এ ভারতীয় বস্ত্রের আমদানীর উপর গ্রেট ব্রিটেন প্রচুর শুল্ক আরোপ করে। ফলে, লাঙ্কাশায়ার ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় কলগুলির হ'ল শ্রীবৃদ্ধি আর হাওড়ার পুরুষানুক্রমে বস্ত্র-বয়নের শিল্পীদের—তাঁতী, যুগী ও জেলে সম্প্রদায়ের—চাষী কিংবা কাপড় কলের মজুরে পরিণত হওয়া ছাড়া তৃতীয় কোন উপায় রইল না। ১৯০৫ খ্রীঃ-এ স্বদেশী আন্দোলনের আমলে আবার দেশীয় বস্ত্র বয়ন শিল্প নবজীবন লাভ করে।

১৯৬৪'র মার্চে জেলার সমবায় সংস্থাগুলির অধীনে তাঁত ছিল ৪১১টি এবং সমবায় বহির্ভূত তাঁতের সংখ্যা ছিল ২,৯৮৯টি। সমবায় সংস্থাগুলির সাহায্যপ্রাপ্ত তাঁতের সংখ্যা ১৯৬৭-তে বেড়ে হয় ৭৬১টি। ১৯৬৬-৬৭তে মোট কাপড় বোনা হয়েছিল ৪০,৫৫৪ মিটার। বাঁকড়া, ডোমজুড়, আমতা, সাঁকরাইল, উলুবেড়িয়া, বাগনান প্রভৃতি অঞ্চলে সমবায়ের মাধ্যমে তাঁত-শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

কাগজ শিল্প

মিঃ সি. ই. হারকোর্ট ১৮৫৪তে রামকৃষ্ণপুরে একটি কাগজ কল খোলেন। প্রথমে লাভ হ'লেও পরে কাঁচামালের অভাব এবং সস্তায় বিদেশ থেকে কাগজ আমদানী হওয়ায় ভালভাবে চালু মিলটি বন্ধ হ'য়ে যায়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে আমতায় বাদামী

রংয়ের কাগজ তৈরীর কল স্থাপিত হয়। কর্মচারীরা ছিলেন প্রধানতঃ মুসলমান। সরকারী অফিসগুলি ছিল এই কাগজের প্রধান ক্রেতা। ১৮৬৭তে বালিতে প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাগজ তৈরার কল স্থাপিত হয়। বালির কাগজ নামে প্রসিদ্ধ এই কাগজটির রং ছিল ঈষৎ লালচে ধরণের এবং অপরিশোধিত (আন্‌-ব্লিডে)। আর্থিক প্রসঙ্গ ও ইকনমিক ষ্টাডিজ নামক পত্রিকাদ্বয়ের সম্পাদক অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা ১৯৩২-৩৩-এ বালির কাগজের দিস্তা ছিল ৪ পয়সা। মৈনান গ্রামের হাতে তৈরী কাগজ শিল্পের বয়স প্রায় ২০০ বছর।

চিনি কল

হাওড়ায় আজ একটিও চিনি কল নাই, কিন্তু অষ্টাদশ শতকে ছিল। ১৮৩৫-এ বালি গ্রামে ব্যোগ-স্ব কোং একটি চিনি কল স্থাপন কবেন এবং দুই ফরাসী শিল্পপতি দু'টি "রাম" কারখানা স্থাপন করেন। হাওড়া শহরের ইংরাজ জমিদার মিঃ লিভেটও ১টি মদ চোলাই কারখানা খুলেছিলেন।

তেল কল

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কাছারির দক্ষিণে জেসপ কোম্পানী সরবে থেকে তেল তৈরীর একটি কারখানা খোলেন। জায়গাটি ক্রমশঃ তেলকল ঘাট নামেই পরিচিত হ'তে থাকে। সবচেয়ে বড় ও

পুরানো তেলকলটি হ'ল রামকৃষ্ণপুরের হাঁওড়া অয়েল মিল। শিবপুর বাজারের কাছেও তেলকল আছে।

নারিকেল জাত শিল্প

আন্দুলের নিকটবর্তী কোরলা গ্রামে নারিকেল তৈল উৎপাদন ও বিক্রয়ের একটি না'তি বৃহৎ কেন্দ্র ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে। নারিকেল তৈল ও শুকনা নারিকেল শাঁস ব্যতীত উপজাত দ্রব্য হিসাবে প্রচুর পরিমানে হুকার জন্য নারিকেল মালা ও সস্তাদরের ছোবরার দড়ি তৈরী হয়ে অন্যত্র রপ্তানী হত। মুখ্যতঃ, কলু সম্প্রদায়ের স্ত্রী-পুরুষ ও বালকেরা এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

জরি শিল্প

জরিশিল্পের প্রধান কেন্দ্র সাঁকরাইল থানা, জয়রামপুর, কোলেরা, নসিবপুর, ধূলাগড়ি, পাঁচলা, ছোট-গাব্‌বেড়ে, জালালসি প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা সিল্কের শাড়ী, ওড়না ঘাঘরা প্রভৃতিতে নক্সা তোলায় সুদক্ষ। এদেরকে কাঁচামালের যোগান দেন কলিকাতার বড়বাজারের ব্যবসায়ীরা, তৈরী মাল নিয়ে যাবার সময় দিয়ে যান মজুরী।

মাদুর শিল্প

উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তর্গত মনশুকা গ্রামে সুভাষহাট নামে ১টি মাদুর ও মাদুরকাঠির হাট প্রতি বুধবার ও শনিবার

বসে। হাটটির সহিত যুক্ত আছেন আশপাশের দলপত্তিচক, কানুপাট, বহরমপুর, মনশুকা, কুমারচক, নারায়ণচক, জয়নগর প্রভৃতি গ্রামের শিল্পীরা। শিল্পটি জেলার একটি প্রধান কুটির শিল্প এবং সমাজের এক শ্রেণীর দরিদ্র সম্প্রাদায়ের একমাত্র জীবিকা।

তালাচাবি শিল্প

তালাচাবি তৈরীর জন্য বড়গাছিয়া এবং সন্নিকটস্থ মানসিংহপুর সাদাতপুর, হাঁটলে, সন্তোষপুর, জাফরপুর, কেশবপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। ঠিক কোন সময় থেকে এ অঞ্চলে শিল্পটির প্রবর্তন নিশ্চয় করে বলা না গেলেও অনুমান শিল্পটি ৭০।৮০ বছরের প্রাচীন। চাহিদার পরিবর্তনের ফলে এখন এখানে প্রধানতঃ কার্ণিচার-লকই তৈরী হয়, প্যাডলক নয়।

ময়দা কল

প্রথমে Ahmuty & Co., পরে জেসপ কোম্পানী হাওড়া 'শহরে কলের ময়দা তৈরী করা শুরু করেন। ময়দা কল প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয় কাছারীর কাছে। রেল কোম্পানী সে জায়গা অধিগ্রহণ করায় জন্মগ্রহণ করে শিবপুর মিল। ১৮৫৯-এ এ্যাটকিন সাহেব ময়দা তৈরীর ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৮৬৬তে Ahmuty & Co টি কিনে নেন। ৩০।৪০ বছর আগের নাম করা ময়দা কলগুলির মধ্যে ছিল হাওড়া ফ্লাওয়ার মিল, মনার্ক ফ্লাওয়ার মিল ও কোর্ট উইলিয়াম ফ্লাওয়ার মিল। বর্তমান মিলগুলির মধ্যে

রামকৃষ্ণপুরের হুগলী ফ্লাওয়ার মিল, রিফর্ম ফ্লাওয়ার মিল, শিবপুরের বেঙ্গল ফ্লাওয়ার মিল, দাশনগরের অন্নপূর্ণা মিলিং কোম্পানী, ঘুসুরির শ্রীগঙ্গা ফ্লাওয়ার মিল, সাঁত্রাগাছির শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানেশ্বর ফ্লাওয়ার মিল ও সবশেষে মাষ্টার ষ্টোর্সের নাম উল্লেখযোগ্য।

রেশম শিল্প

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতে প্রথম আসে তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এদেশের শিল্প পণ্য সস্তায় কিনে নিয়ে গিয়ে ইউরোপের বাজারে বিক্রী করে কিছু মুনাফা অর্জন করা। সেজন্য ১৭৯০ থেকে ১৮৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত তারা এদেশে রেশম চাষে উৎসাহ দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শিল্পটির অবনতি ঘটে। ১৮৭৫ খ্রীঃ থেকেই শিল্পটির অবনতি ঘটালও ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক সমীক্ষায় হাওড়া জেলার রেশম শিল্প সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ পায় শ্রী এন. জি. মুখার্জীর সিল্ক ফেব্রিকস্ অব বেঙ্গল, নামক পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ আছে। এই সময় প্রায় ১০০ জন লোক আংশিক ভাবে শিল্পটিতে নিযুক্ত ছিল। তাদের দ্বিতীয় উপজীবিকা ছিল চাষ। দামোদর ও কানা নদী বরাবর ছিল তুঁতগাছের চাষ। শিল্পীদের বসবাস ছিল জগৎবল্লভপুর, সাঁকরাইল ও উলুবেড়িয়া মহকুমার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে। প্রধানতঃ কৈবর্ত, বাগদী ও দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায় ভুক্ত শিল্পীরা তুঁত গাছ থেকে রেশমগুটি সংগ্রহ করে হুগলী জেলার

ফুরফুরা, মেদিনীপুরের ঘাটাল এবং কলকাতায় চালান দিত। ১৯০৮ খ্রীঃ-এ জেলায় ১৩,০০০ টাকার রেশম তৈরী হয়েছিল। উদয়নারায়ণপুর থানার কল্যাণকে গ্রামের দ্বারী পরিবার এই ব্যবসায়ে বিত্তশালী হ'ন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হাওড়া জেলা কৃষি ও হিতকরী সমিতি আসাম থেকে এণ্ডির ডিম আনিয়ে জেলার অনেক জায়গায় এণ্ডির চাষ ও এণ্ডির কাপড় বোনবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

চিকন শিল্প

পারসী কথা চিকিন, বাংলায় এসে হয়েছে চিকন্। ঘর সাজাবার ও দেহ সাজাবার কাপড়ে সাতরঙা সুতার রামধনু ফুটিয়ে তোলার যে কাজ তাকেই বলে চিকনের কাজ। এই কাজের প্রধান উদ্দেশ্য নানা আকারের কাপড়কে নানা ধরণের নক্সায় আরও বাহারী করে তোলা। মুখ্যতঃ ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুর থানার মুসলমান নারীরা এই শিল্পে নিযুক্ত। ১৯৬৬'র এক সমীক্ষা অনুসারে এঁরা প্রায় ৬০০টি পরিবার।

লবণ তৈয়ারী ও লবণ গোলা

নবাবী আমলে শালকেতে একটি নুনের গোলা ছিল। কোম্পানীর আমলে ঠিক কোন সময় হাওড়ায় নুনের গোলা প্রথম তৈরী হয় বলা শক্ত। সম্ভবতঃ ১৭৯৩ থেকে ১৮০৯ এর মধ্যেকার কোন এক সময়ে প্রথম নুন গোলা তৈরী হয়। এখানে নুন তৈরী

হ'ত না। তমলুক, বালেশ্বর, পুরী ও কটক থেকে নুন তৈরী হয়ে এখানে আসত গুদামজাত হবার জন্য। হাওড়া ময়দানের কাছ বরাবর শালকিয়ায় প্রথমে যে গোলাটি ছিল সেটি রেল কোম্পানীকে জায়গা দেবার জন্য ঘুসুড়ীতে সরে যায়। পরে বাঁধাঘাট ও শিবপুরে দু'টি অতিরিক্ত গোলা তৈরী হয়। ১৮৬৪'র সাইক্লোনে শালকিয়া ও ঘুসুড়ীর নুনের গোলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নুন আনা নেওয়ার জন্য ১৮৬৪-তে নভেম্বরে হাওড়া—শালকিয়া রেলপথ খোলা হয়। ১৮৬৫'র জানুয়ারীতেই রেলপথটি বন্ধ হয়ে যায়।

নকল সোনার গহনা শিল্প

ডোমজুড় থানায় এককালে বহু স্বর্ণকারের বসতি ছিল। আসল সোনার অলংকার তৈরী না হয়ে এখন এখান থেকে এ্যালুমিনিয়ামের টুকরো থেকে নকল সোনার নাকের, কানের, হাতের, গলার গহনা তৈরী হয়ে ক্যানিং স্ট্রীটের বাজারে ভীড় করে।

চুণ শিল্প

আমতা থানার দামোদর নদের তীরবর্তী ছোট কলিকাতা গ্রামে একসময় শামুক পুড়িয়ে চুণ তৈরী করা হ'ত। শেষ যখন অনুসন্ধান করি, তখন একজন মাত্র চুণারী এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

মাটি ও চীনা মাটির পণ্যাদি প্রস্তুত শিল্প

পাতিহাল গ্রাম [থানা-জগৎবল্লভপুর] মাটির বাসনপত্র, সাঁকরাইল বড় বড় জালা, চণ্ডীপুর [থানা-উলুবেড়িয়া] ডোমজুড় ও

উলুবেড়িয়া খেলনা, মুখোস, আলনা, নকল ফল প্রভৃতি তৈরীর জন্য বিখ্যাত। ঝাপড়দহ, প্রশস্ত এবং মহিয়াড়ী [ডোমজুড় থানা] টালির জন্য বিখ্যাত।

ন্যায্যমূল্যে জ্বালানী সংগ্রহ শিল্পটির প্রধান সমস্যা এবং এ্যালুমিনিয়াম ও কলাইয়ের বাসন এর প্রধান প্রতিযোগী। তথাপি গরীব ক্রেতা-সাধারণের ভরসায় শিল্পটি আজও আপন অস্তিত্ব রক্ষায় যত্নবান। ১৯৬৭'র আদমসুমারী অনুযায়ী শিল্পটিতে ৬,৫৫৭ জন পুরুষ এবং ১৩২৫ জন স্ত্রীলোক অর্থাৎ মোট ৭,৮৮২ জন নিযুক্ত ছিলেন।

হুকা শিল্প

ডোমজুড় থানার বেগড়ি, বালীয়ারা, কোলেরা, ডোমজুড়, ঝাপড়দহ এবং শাঁখারীদহ গ্রামে হুকা তৈরী হয়। ১৯২৯ ৩০ খ্রীষ্টাব্দের সমীক্ষা অনুযায়ী অন্যূন ৬০টি পরিবার এই শিল্পে নিযুক্ত আছেন। বিড়ি, সিগারেট শিল্পটির প্রধান প্রতিযোগী। দেশ বিভাগের কুফল শিল্পটির উপর অত্যন্ত প্রকট। কারণ, পূর্ব-বাংলাই ছিল এই শিল্পের প্রধান বাজার। ১৯৬৬-৬৭ তে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩০,০০০টি—মূল্য ৪২০০০ টাকা।

শোলা শিল্প

প্রধান কেন্দ্র ডোমজুড় থানা। মুখ্য উৎপাদন—প্রতিমার চালচিত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শোলার টুপি তৈরী করে এখানকার শিল্পীরা প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। খালোর ও নারায়ণপুরের শোলার কাজের সুনাম আছে।

হাতে তৈরী কাগজ

কাগজ কলের প্রতিযোগিতায় আমতা ও বাগনানের হাতে তৈরী বাদামী রংয়ের (তুলট) কাগজের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। কলে তৈরী কাগজ অপেক্ষা বেশী টেকসই হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ ভারতে যেদিন থেকে সরকারী আদেশে অফিসে আদালতে কলে তৈরী কাগজের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয় সেদিন থেকেই শিল্পটির অবনতি শুরু হয়। দু'শ বছর আগে হাতে তৈরী কাগজে লেখা দলিল আজও অবিকৃত অবস্থায় আছে দেখেছি। আমতা থানার মৈনান গ্রামের মোবিন আলি এই অঞ্চলের চারশ' বছরের পুরানো হাতে তৈরী কাগজ শিল্পকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন যা কাগজ তৈরী হয় তার বেশীর ভাগ অংশই ব্লটিং জাতীয়। শিল্পটি থেকে একটি পরিবারের মাসিক আয় গড়ে ৭০০/৮০০ টাকা। আগে কাগজের মণ্ড তৈরী হ'ত পাট ও শণ থেকে এখন হয় পুরাণ কাগজ থেকে। কবে এই গ্রামে শিল্পটির শুরু তা বলা না গেলেও নিঃসন্দেহে এর শুরু মুঘল যুগে। প্রবাদ লোকমান হাকিম নামক এক ব্যক্তি প্রথম মৈনানে শিল্পটির পত্তন করেন। প্রতি বছর অগ্রাণ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার তাঁর উদ্দেশ্যে এক উৎসব পালিত হয়।

বাঁশ ও বেতের কাজ

হাওড়া শহর ও শহরতলীর ডোম সম্প্রদায় বেতের চেয়ার, বাক্স প্রভৃতি তৈরী করে। ডোমজুড়, পাতিহাল, জগৎবল্লভপুর,

মার্না, মাকড়দহ ও বেগরি গ্রামে তৈরী হয় বাঁশের বাক্স। উলুবেড়িয়ার উলুঘাস ও হোগলা গাছ থেকে মাদুর বোনা হয়।

কাঁসা শিল্প

বাগনান থানার কল্যাণপুরের শিল্পীরা কাঁসার বাসন তৈরীতে দক্ষ।

পোলো বল ও ষ্টিক

ভারতের মধ্যে দেউলপুরেই একমাত্র পোলো বল তৈরী হয় বাঁশের মুড়ো থেকে। এ জাতীয় বাঁশ বাংলা ব্যতীত অন্যত্র দুর্লভ।

বর্ত্তমান কারিগরদের তিনপুরুষ আগে থেকে প্রচলিত এই শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ পোলো বল ও ষ্টিক রপ্তানী করে বেশ কিছু বিদেশী মুদ্রা অর্জন করেন। ষ্টিকের ছড়ি আসে আসাম থেকে।

অন্যান্য শিল্প

হাওড়ার ছোটখাট বহু প্রকারের শিল্প আছে। এই সমস্ত শিল্পের মধ্যে কয়েকটির কথা এখানে আলোচনা করা হ'ল। ডোমজুড় ও সাঁকরাইল থানা এলাকায় বহু তৈরী পোষাক প্রস্তুত-কারী ওস্তাগর সংস্থা আছে। উলুবেড়িয়ায় টালি ও সারেঙ্গা গ্রামে তৈরী হয় ৮/১০ মণী জালা। পাঁচলা থানার পরচুলা তৈরী শিল্প বিখ্যাত। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে দড়ি তৈরী, দর্জির কাজ, কাঁসার কাজ, বেকারী ও মৃৎ শিল্প। বালীতে চটকল, লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, কাপড়ের কল প্রভৃতি ছাড়া আছে ইট ও

রাসায়নিক সার উৎপাদন কারখানা। হাওড়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে করাতকল, তুলার বীজ ছাড়ানো ও গাঁট বাঁধা, হোসিয়ারী, সিগারেট ও কাঁচের কারখানা। বাউরিয়া রেল ষ্টেশন এবং ৬ নং জাতীয় সড়কের সংযোগকারী রাস্তাটির ধারে পাঁচলা চৌমাথায় গড়ে উঠছে রবারজাত শিল্পের ছোট ছোট কারখানা।

বিভিন্ন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ ও হাওড়া জেলার রেজিষ্ট্রীকৃত

কারখানার সংখ্যা

স্থানের নাম	১৯৫১	১৯৫৭	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৬	১৯৬৭
পশ্চিমবঙ্গ	২.৬২৫	৩.৪১০	৪.৩১১	৫.৬৪৩	৫,৭১৪	৫.৬৫৮
হাওড়া	৫৫২	৬৭৪	৮৬৬	১,১৭৭	১,২১৫	১,১৯৩

হাওড়ার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

১৯৬০-৬১তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে হাওড়ার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিংশিল্প বিষয়ে যে সমীক্ষাটি করা হয় সে বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী এ. এন. বোস তাঁর Calcutta and Rural Bengal Small Sector Symbiosis গ্রন্থে লিখেছেন—

(১) এই শিল্পের শতকরা ৬২ জন মালিক হয় দক্ষ শ্রমিক অথবা পূর্বে শ্রমিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

(২) শতকরা ৭৭ জন মালিকই হাওড়া জেলাবাসী।

(৩) মূলধনের ৬৯% আসে মালিকদের সঞ্চিত তহবিল থেকে

(৪) এঁদের ব্যবহৃত ৮১% মেশিনই ভারতে প্রস্তুত এবং ২৫% স্বনির্মিত।

এবং (৫) মাত্র ৩৩% প্রতিষ্ঠান বাজার দরে মালবিক্রয়ে সক্ষম।

হাওড়ার শিল্পের দোষগুণ

সুলভ শ্রমিক, মূলধন, বাজার, যন্ত্রপাতি, আমদানী রপ্তানীর সুবিধা, জলপথ, রেলপথ, স্থলপথ, ব্যাঙ্ক, বীমা, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থাকার দরুণ কারিগরী জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের সুবিধা প্রভৃতি হাওড়ার শিল্পোন্নতির সহায়ক হলেও হাওড়ার কলকারখানাগুলি কোন রকম পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠেনি। সুবিধে মতন যখন তখন যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে। ফলে বহু ক্ষেত্রে এগুলি জনস্বাস্থ্যের প্রতিকুল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সমস্যার সমাধানের জন্য সরকারী উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্পনগরী সৃষ্টির কাজ শুরু হয়েছে। কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনেক রকম অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়। হাওড়ার শিল্পজাত পণ্যসম্ভার ব্রহ্মদেশ, সিংহল, পূর্ব আফ্রিকা, মালয়েশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। দেশের স্বার্থেই তাই এসব সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন। হাওড়া জেলায় ছোট ছোট কলকারখানা আরও বেশী এবং ভালভাবে গড়ে তোলার সুযোগ ও সম্ভাবনা দুই-ই থাকায় শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ও জেলার অর্থনীতিকে অধিকতর শিল্পভিত্তিক করার উদ্দেশ্যে রাজ্য-সরকার একটি স্ব-নিযুক্তি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। স্ব-নিযুক্তি

প্রকল্প অনুযায়ী জেলার শিল্প দপ্তর ১৯৭৫-এর মার্চ পর্যান্ত প্রায় চার শতাধিক পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। পরিকল্পনা অনুসারে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষিত যুবককে সাহায্য ঋণ বাবদ তিন কোটি আটষট্টি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। জেলার বিভিন্ন অংশে অবস্থিত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে সহজ শর্তে ছোট শিল্প সংস্থা গড়ে তোলার জন্য এই ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

শিল্পাঞ্চল

স্বাধীন ভারতে সরকারী উদ্যোগে শিল্পোন্নয়নের কাজ দেশের অন্যান্য জায়গার মত হাওড়াতেও যথা সময়ে শুরু হয়ে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে দাশনগরে জেলার প্রথম শিল্পনগরী স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় শিল্পনগরীর স্থান হয়েছে হাওড়া শহরের দক্ষিণ প্রান্তে উনশানিতে। আড়াই কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ কৃত উনশানি শিল্পনগরীতে নূতন কর্মসংস্থান লক্ষ ছিল অন্ততঃ পাঁচ হাজার।

হাওড়া ষ্টেশনের সাড়ে চার মাইল দূরে বালটিকুরী শিল্পাঞ্চলের অবস্থান দাশনগরে সরকার পরিচালিত সেণ্ট্রাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটের কাছেই। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কর্তৃক হাওড়া জেলার যে লীড ব্যাঙ্ক সার্ভে রিপোর্ট পেশ করা হয় তদনুসারে ১৯৭০-৭১ খ্রীঃ-এ শিল্পাঞ্চলটির মোট এলাকা ৩২ একর। এর মধ্যে ২, ৭৪, ৩০২ বঃ ফুট আচ্ছাদিত এবং ৩, ১৪, ৪২৪ বঃ ফুট উন্মুক্ত। মোট কারখানার সংখ্যা ৫৪টি।

সুলভ ও দক্ষ শ্রমিকের যোগান—কল্যাণী শিল্পাঞ্চলে যেটির যোগান প্রয়োজন মাফিক নয়—এখানে যথেষ্ট। শিল্পাঞ্চলটির অবস্থানগত সুবিধাও উল্লেখযোগ্য। দাশনগর, বালটিকুরী, কদমতলা প্রভৃতি সন্নিহিত অঞ্চলগুলি বহু বছর যাবৎ জেলার কারখানা এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। বেনারস ও বেলিলিয়াস রোড নামক যে দু'টি পথের দ্বারা শিল্পাঞ্চলটি যুক্ত তার দু' পাশেই কারখানা। বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহও সুলভ।

॥ হাওড়ার শিল্প সমূহের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ॥

ইণ্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড রেগুলেশন এ্যাক্ট অনুসারে লাইসেন্স প্রাপ্ত বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এই জেলায় ১২০টি—যার মধ্যে আছে মূল ধাতুর শিল্প ৫২টি, ইঞ্জিনীয়ারিং ২৭টি, বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি ২টি, রসায়নশিল্প ৫টি, ঔষধ ও প্রসাধনী ১টি, বয়নশিল্প ১৯টি, ফল ও সব্জি সংরক্ষণ ও তৈল নিষ্কাষণ ৮টি, রবারজাত পণ্য ৪টি, চামড়ার কাজ ১টি, এবং কাচ ১টি, মোট—১২০টি। ভবিষ্যতে এই জেলায় যে সকল শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা আছে সেগুলি হ'ল—কৃষি যন্ত্রপাতি, ফল-সংরক্ষণ, যন্ত্রপাতি, পাম্পতৈরী, নারিকেল তেল তৈরী, শুকনো আলু, মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ, রেডিও ও ট্রানজিষ্টার, প্লাষ্টিক, খেলাধূলার সাজ সরঞ্জাম, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় লৌহজাত সামগ্রী। লীড ব্যাঙ্ক সার্ভে রিপোর্ট অনুসারে জেলার ১১টি উন্নয়ন এলাকা হ'ল—শ্যামপুর, অযোধ্যা, জগৎবল্লভ-

পুর, শেকরাহাটি, বড়গাছিয়া, ঘোষপাড়া, কোনা, মাকড়দহ, উদয়নারায়ণপুর, মুগকল্যাণ এবং খড়িয়প অথবা ঝিকড়া।

শিল্পপতি—ব্যবসায়ী

হাওড়ার শিল্পপতিদের তালিকায় ছুটি উজ্জ্বল নাম কর্ম্মবীর আলামোহন দাশ এবং যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আরও কয়েকটি নাম অশ্বিনী মণ্ডল, ডি. কে. দাস, কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী [আথমারা কল নির্মাতা], আশু বোস [ষ্টিভেডার], মুরারী মোহন মান্না, প্রকৃতি ভট্টাচার্য্য, অক্ষয় সুর, মহেন্দ্র লাল কুণ্ডু, পঞ্চানন চোংদার, বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী, শ্যামাচরণ মুখার্জী এবং ভূতনাথ পাছাল, যুগল মণ্ডল প্রভৃতি।

জামালপুরের ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কারখানার প্রথম ভারতীয় শিক্ষানবীশ নগেন্দ্র নাথ রক্ষিত ১৯২৩-এ বেলুড়ে একটি ছোট ঢালাইয়ের কারখানায় রেলওয়ে শিপার তৈরী আরম্ভ করেন। পরে বেলুড়ের ন্যাশনাল আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগ নেন।

কোনা গ্রামের অতীন দে ১৯১৮তে মল্লিক কটকের কাছে খুরুট রোডে যে দোকানটি প্রতিষ্ঠা করেন সেটিরই ক্রমবর্ধমানরূপ কলকাতার ১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জী রোডের হাওড়া মোটর কোম্পানী লিঃ।

হাওড়া ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোশিয়েশনের ঠিকানা ১৯৮, বেলিলিয়াস রোড।

শিল্প শ্রমিকদের দক্ষতা ও একজন বিস্মৃত শিল্পী

ব্রিটিশ আমলে ভারতের শেফিল্ডরূপে পরিচিত হাওড়ার শিল্প শ্রমিকদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবাণী উচ্চারণ করে একবার এক বিদেশী মন্তব্য করেন যে, অশিক্ষিত এই সকল শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা এক বিস্ময়ের বস্তু। এই বিস্ময়ের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রিয়নাথ অধিকারী। অর্থাভাবে আগ্রহ থাকা সত্বেও বিদ্যাচর্চার আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক বাল্যকালেই প্রিয়বাবু (১২৫০—১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) কলকাতার টাঁকশালে সামান্য ডাইস-মেকার বা খোদাই-কাররূপে যোগদান করতে বাধ্য হন। ভারত সম্রাট ইংলণ্ড রাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন আরোহণ অনুষ্ঠানের করোনেশন মেডেল নির্মাণকল্পে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইংল্যাণ্ড সহ সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কয়েকজন বিশিষ্ট ডাইস খোদাইকারকে মেডেলটির ডাইস তৈরীর ভার দেন। প্রতিযোগিতায় প্রিয়নাথ বাবুর ডাইস-ই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তাঁর তৈরী ডাইসেই মেডেল তৈরী হয় এবং ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেন। পরবর্তীকালে নাকি মিণ্টে তাঁরই তৈরী ডাইসে এক টাকার মুদ্রা তৈরী হ'ত। ১৮৬৫-তে ১১২ জি. টি. রোড শালিখায় তিনি ইণ্ডিয়া ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামে ছোট একটি কারখানা স্থাপন করেন। কারখানাটি তাঁর শিল্প নৈপুণ্যের ঐতিহ্য বজায় রাখতে পেরেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন এই কারখানাতেই তৈরী হল—সেক্সপীয়ারের চার শততম জন্মবার্ষিকী উৎসবে

স্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভনে কলকাতার এক অভিজাত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের স্বামী ডিউক-অব-এডিনবরাকে প্রদত্ত স্মারক মেডেলটি।

ব্যাঙ্ক

উনবিংশ শতকের শেষ অথবা বিংশ শতকের শুরুতে আমতা থানার চিংড়াজোলের সূর্য্যকুমার মণ্ডল ছিলেন মাহিষ্য টেড্রিং ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক। বাগনান থানার পূর্ণাল গ্রামে পূর্ণাল পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্ক এবং কদমতলা যাদব সমবায় ব্যাঙ্ক এক সময় হাওড়ার ছোট ব্যবসায়ীদের প্রভূত উপকার সাধন করেছিল। আলামোহন দাশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দাশ ব্যাঙ্ক। এছাড়া আছে কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্ক।

সমবায় সমিতি

ইংরাজরা এদেশে যে সমবায় চালু করেছিলেন সেটা ছিল আসলে তাঁদের রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে পল্লী কৃষি-ঋণ ব্যবস্থার একটি বিশেষ রূপ মাত্র। পরে সমবায়ের উপকারিতা উপলব্ধি করে যে সব সমাজ সেবী জনজীবনে এটিকে ছড়িয়ে দেবার ব্রত গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে কলিকাতা জেলা ইউনিয়ন ও পরে রাজ্য ইউনিয়নের প্রথম সম্পাদক কালীপদ ভট্টাচার্য্য পাঠ্যাবস্থায় হাওড়াবাসী ছিলেন। হাওড়ার সমবায়ীদের মধ্যে হৃষীকেশ ঘোষ একটি বিশিষ্ট নাম। হাওড়া জেলা সমবায় ইউনিয়নের প্রথম সভাপতি শৈলকুমার মুখার্জী, সম্পাদক সনৎ চক্রবর্তী। হাওড়া

জেলা সমবায় ইউনিয়নের ঠিকানা ৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড। জেলার অর্থনীতিতে বালী, বাঁ্যাটরা, কাসুন্দিয়া, শিবপুর প্রভৃতি শহরাঞ্চলের এবং গ্রামাঞ্চলের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির বিশেষ ভুমিকা আছে। বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের কাজ শুরু হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। এর দু-বছর আগে জন্ম গ্রহণ করে বাঁ্যাটরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের শাখা ছিল শ্যামপুর, আমতা, ঝিকিরা, বড়গাছিয়া এবং উদয়নারায়ণপুরে। ঐ বছর জেলায় মোট সংখ্যা ছিল ৭৮৯টি যার মধ্যে আছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - ১, ভুমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক - ১, ক্রেতা সমবায় - ১২৯, সেবা সমিতি-২৩৮, বিপণন সমিতি-১৩, অকৃষি ঋণদান সমিতি-১০৮, যানবাহণ-১১, শিল্প-৬৫, গৃহ নির্মাণ-৩৬, মৎস্যজীবি-৩৪, ছাত্র সমবায়-৩৬, কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবি-১, হিমঘর-১ এবং অন্যান্য-১১৫।

উপজীবিকা

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাওড়ার প্রথম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত উপজীবিকা তালিকাটি নিম্নরূপ—

ধানভানা ১৭,২১৫ (স্ত্রী ১৬,৯৫৬), তুলা কল ৩,০১১, তাঁতী (হস্তচালিত তাঁত) ১,৬৯৪, পাটকল ১৭,৭৩৩, রেলপথ ৬,০১১, পশুপালন ১,৯০৮, ধোপা ২,৭১০, নাবিক ৪,৬১২, সাধারণ শ্রমিক ৪৩,০৬০, বেশ্যা ২,১৭২, ভিক্ষুক ৩,৭৮৭ মোট ১,০৩,৭১৯ জন।

ভিক্ষুকদের মধ্যে আছে ফকির, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, বেশ কিছু বৃদ্ধ অন্ধ ও অন্যান্য কারণে রুগ্ন এবং অক্ষম ব্যক্তি যারা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ।

১৯৬১'র আদমসুমারী অনুযায়ী হাওড়া জেলার প্রতি এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে চাষী ১৪৩ জন, কৃষি শ্রমিক ৯৫, কারিগরী শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক ৩৬১ (সমগ্র পঃ বঙ্গে ১১৪), শিশু শ্রমিক ১৪ (পঃ বঙ্গে ৩৯)।

জেলার ২৩৫১ জন চিকিৎসকের মধ্যে মহিলা ৩৪, হোমিও-প্যাথিক ৩৭৩ এবং আয়ুর্বেদিক ২৯৪ জন। জেলার ১৬ জন অধিবাসী জজ ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে কর্মরত, সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ৬১৫ এবং অন্যান্য শ্রেণীর স্থপতি ১৬৭৫ জন। হাওড়ার ৪০টি কারখানা সমীক্ষা করে ইউনেস্কো যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন তাতে দেখা যায় ২৬টির মালিক এবং ৭০ শতাংশ শ্রমিক মাহিষ্য জাতীয়। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মালিকানায় আছে ৩টি করে কারখানা, বাকী কারখানার মালিক নমঃশুদ্র, কর্মকার ও তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ।

জেলা ভিত্তিক মাথাপিছু আয় অনুসারে হাওড়ার স্থান

গড় আয় অনুসারে শ্রেণী বিভাগ	জেলার নাম
(১) ২০০ টাকার কম	পুরুলিয়া
(২) ২০১-২৫০ টাকা	বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, কুচবিহার, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, দার্জিলিং, ২৪-পরগণা এবং পঃ দিনাজপুর।

(৩) ৩০১-৩৫০ টাকা জলপাইগুড়ি ও হুগলী।
(৪) ৩৫১ টাকা এবং তদূর্ধ্ব বর্ধমান ও হাওড়া।

রাজ্যের আয়ে জেলাগুলির অবদান—১৯৬০-৬১

	অধিবাসীর	রাজ্যের আয়ের	শতকরা আয়	
স্থান	শতকরা অংশ	শতকরা অংশ	কৃষি	শিল্প
সর্বোচ্চ—				
বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা ও কলিকাতা	৩৫'৩০	৪৫'১৩	২৩'৪১	৫৬'৬৮
দ্বিতীয়—				
হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর	২৪'৬৭	২৩'৪৪	২২'৮৯	২২'৮৬
তৃতীয়—				
জলপাইগুড়ি, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ	১৫'৩২	১৩'৯৫	২৩'০৭	৭'৩৭
চতুর্থ—				
বাঁকুড়া, বীরভূম ও পঃ দিনাজপুর	১২'৭০	১০'৬৯	১৯'৮১	৪'৫৩
সর্বনিম্ন—				
দার্জিলিং, কুচবিহার পুরুলিয়া ও মালদা	১২'১১	৬'৭৯	১০'৪১	৩'৫৩

হাট-বাজার

হাওড়ার হাটগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী নাম ডাক ময়দানের কাছে মঙ্গলা হাটের, যার শুরু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরের তাঁতিদের অনুরোধে আন্দুলের মল্লিকরা চড়ক ডাঙ্গায় এই হাট বসান। প্রতি মঙ্গলবার এখানে হাওড়া ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি থেকে বহু বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং ক্রেতার সমাগম হয়। তাঁতের কাপড়, গামছা, জামা, প্যান্ট, মশারী প্রভৃতি হাওড়া হাট থেকে পাইকারী দরে কেনার জন্য সাধারণ ক্রেতার সঙ্গে কলকাতার বহু দোকানদারও এই হাটে আসেন। ফুট তিনেক চওড়া রাস্তার দু'পাশে সারি সারি প্রায় তিন হাজার ছোট ছোট ষ্টলে শাড়ী, ধুতি, গামছা'র সবচেয়ে বড় পাইকারী তাঁতজাত পণ্যের বাজারটিতে প্রতি সপ্তাহে বিক্রীর জন্য যে সব মাল আসে সেগুলির মোট দাম ৮০ লক্ষ টাকারও বেশী। C.M.P.O. বর্তমান হাওড়া হাটের জায়গায় একটি আটতলা বাড়ীর পরিকল্পনা করেছেন, যেখানে নীচেরতলায় বসবে হাট ও অন্যান্য দোকান এবং উপর তলায় থাকবে আপিস ঘর। অপর একটি পরিকল্পনা হ'ল গোটা বড়বাজারটিকে কলকাতা থেকে তুলে এনে পশ্চিম হাওড়ায় বসান। মধ্য হাওড়ার কালীবাবুর বাজারের খ্যাতি পাইকারী বাজার হিসাবে। বহুসংখ্যক বাসনালয় ও বসনালয়ে সন্ধ্যাবাজার সরগরম। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার নিত্য বাজারের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কলকাতার মতন হাওড়াতেও শিবপুর, সালকিয়া,

বেলুড়, বালি সর্বত্রই নির্দিষ্ট বাজার এলাকা ছাড়িয়ে পথের দু'ধারে বাজারের কাজ চলে। হাওড়া সমবায়িকার প্রতিষ্ঠা ১৯৬৭তে ভাড়া বাড়ীতে, পরে হাওডা ময়দানে নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

হাওড়া ষ্টেশন এলাকা ছাড়িয়ে যেখানে বাকল্যাণ্ড ব্রীজের [বর্তমানে বঙ্কিম সেতু] শুরু, তার ডানদিকে প্রায় ৪০টি আড়ৎ নিয়ে গড়ে উঠেছে হাওড়ার মাছের আড়ৎ—যেটি এশিয়ার মধ্যে মধ্যে সবচেয়ে বড় পাইকারী মাছের বাজার। সাহেবগঞ্জ, রাজমহল, মণিহারী ঘাটের গঙ্গায়, কোশীনদী ও শোননদের মোহনা, উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, মহানদী, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের বাঁধে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী ডিমপোনা বিক্রীর জন্য এই আড়তে আসে। পঞ্চাশ বছর আগে সালকিয়ার বাঁধাঘাটে, তারপর শিবপুর ঘাট এমনকি এক সময় হাওড়া ময়দানেও মাছের আড়ৎ ছিল, এখন সেগুলি বিলুপ্ত। ৬২, রোজ মেরী লেনে ছিল সেনট্রাল ফিসারীজ কর্পোরেশনের মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র।

॥ আরও কয়েকটি বিখ্যাত হাট ॥

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা। উলুবেড়িয়ার আধ মাইল লম্বা হাটে বুটজুতো থেকে শুরু করে গরু পর্য্যন্ত বিক্রী হচ্ছে অথচ মিঃ কেরী এক ছটাক দুধ বিক্রী হ'তে দেখেননি। মিঃ কেরীর লেখা থেকে জানা যায় বাক্সীর হাটে কেনা বেচার জন্য হাজার দু'য়েক লোকের সমাগম হ'ত ; ফতেপুরে হাট বসত মঙ্গলবার এবং গুজারপুর ও খাড়ুবেড়িয়ার হাটও বিখ্যাত ছিল।

বর্ত্তমানে মুন্সীর হাট [বড়গাছিয়া] বাক্সীর হাট [থানা বাগনান], কমলপুর ও শশাটির হাট [থানা শ্যামপুর], রামচন্দ্রপুর, বসন্তপুর, পেঁড়ো, গড়ভবানীপুর ও উদয়নারায়ণপুরের [থানা—আমতা] হাট জম-জমাট।

॥ দুটি বিলুপ্ত বাজার ॥

হাওড়া শহরের দু'টি বিলুপ্ত ঐতিহাসিক বাজার হ'ল আড়কাঠি বাজার এবং বাঙ্গালবাবুর বাজার।

আড়কাঠির বাজারটি ছিল সালকিয়ায়। জনশ্রুতি, একসময় আড়কাঠি বা দালালরা চা বাগানে কুলি রপ্তানীর জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজনকে চাকরী দেবার নাম করে এখানে জড় করে তারপর তাদের চা-বাগানে পাঠাত। চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁর "হাওড়া—পাষ্ট এণ্ড প্রেজেন্ট" গ্রন্থে বাজারটির এরূপ নামকরণের অন্য দু'টি সম্ভাবনার কথা বলেছেন। প্রথম--রোহিলা যুদ্ধের [১৭৭৪ খ্রীঃ] পর কর্ণেল আরকুহার্ট যুদ্ধজয় শেষে আত্মীয় স্বজন পরিত্যক্তা এক কাশ্মিরী বালিকাকে আশ্রয় দেন। বালিকার ধনী পিতা পরে সন্ধান পেয়ে প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে কর্ণেলকে কন্যাটিকে বিবাহ করতে সম্মত করান। কর্ণেল পণস্বরূপ প্রাপ্ত অর্থে জায়গা কিনে যে বাজার বসান সেই আরকুহার্ট বাজারটিই লোকমুখে আড়কাঠির বাজারে পরিণত হয়েছে। দ্বিতীয় কাহিনী—মিঃ হেরিটেজ নামে জনৈক ব্রিটিশ পাইলট [দেশীয় ভাষায় পাইলটকে তখন আড়কাঠি বলা হ'ত] এই বাজারটির প্রতিষ্ঠাতা বলে এর নামকরণ হয়েছিল আড়কাঠির বাজার।

চাঁদমারীর ব্রীজের পাশে ছিল বাঙ্গালবাবুর বাজার। পরে এখানে হয় মার্টিন লাইট রেলওয়ের হাওড়া ময়দান ষ্টেশন। রামরতন বোস নামে ঢাকার এক জমিদার কলকাতায় লোকের ভিড়ে অতিষ্ঠ হয়ে ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলে জায়গা কিনে বাড়ী করেন। ধান জমি ও জঙ্গল পরিষ্কার করে বাড়ী করার সময় তাঁর সহযোগী ছিলেন ভাই রাজমোহন। এঁদের প্রতিষ্ঠিত বাজারটি সাধারণের নিকট বাঙ্গালবাবুর বাজার আখ্যা পায়।

ঃ বাজার দর ঃ

হাওড়ায় চালের দর ছিল ১৮৬০-এ টাকায় ৩৬ সের, ১৮৭০-এ ৩১ সেব, ১৮৯৩-এ ১১ সের এবং ১৯০৮-এ সওয়া সাত সের। সবচেয়ে কমদামী ডাল পাওয়া যেত টাকায় ১৮৯৩-এ ১৬ সের, ১৯০৮-এ ৯ সের। অড়হব ডাল ছিল টাকায় ১৯০৩-এ ১১ সের ৩ পোয়া, ১৯০৯-এ ৮ সের। দুধ ১৮৮৯-এ টাকায় দিত ৭ সের, ১৯০৯-এ ৫ সের।

১৮৯৩-এ ঘি, সরষের তেল আর আলুর মণ ছিল যথাক্রমে ৩৫ টাকা, ১৭ টাকা ৮ আনা ও ৩ টাকা ৪ আনা ৩ পয়সা। দেখা যাচ্ছে যতই দিন যায় ততই সব জিনিষের দাম বাড়ে। এর এক-মাত্র ব্যতিক্রম নুন, এটি অস্বীকার করে নেমখারামি করতে চাই না। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নুন ছিল টাকায় সাড়ে দশ সের, ১৯০৮-এ ২০ সের।

ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, আমতা ও বাগনানে তৈরী ধুতি-শাড়ী ১'৫০ টাকা থেকে ২'৫০ টাকা, চাদর ১ টাকা থেকে ১'৫০ টাকা

এবং আমদানী করা ধুতি-শাড়ী পাওয়া যেত ৯০ আনা থেকে ১ টাকায়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে হাওড়ার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর বাজার আন্দুল বাজারের মূল্য তালিকা হ'ল—প্রতিমণ—উৎকৃষ্ট ছাঁটা চাল ২.২১—২.৫০ টাকা, ঘি (১) টিনের ২০—২৮ টাকা (২) মুঙ্গেরী মটকি ৩২—৩৫ টাকা, আলু (বড়. বাছা) ১.৫০—২.৫০ টাকা। প্রতি কুড়ি—রাজাপুর বাদার কই মাছ বড় ১২—১৫ পয়সা, গঙ্গার টাটকা তপ্‌সে মাছ ১৯—২৫ পয়সা, ডিমভরা তপ্‌সে ২৫—৩১ পয়সা, প্রতি জোড়া গঙ্গার পেটো ইলিশ (বড়) ৩৭—৬২ পয়সা।

রাউতারার কেরাণী বাড়ী থেকে পাওয়া ১২৮৯ বঙ্গাব্দের বাজার দর—

রেড়ির তেল /১।।০—ছয় আনা আড়াই পয়সা

এক সের খাড়ি মুসুরির ডাল - এক আনা দেড় পয়সা

১ জোড়া ৫ গজী শাড়ী—এক টাকা ছ' আনা

১ জোড়া ৪½ গজী ধুতি—এক টাকা ছ' পয়সা

মশারির থান—এক টাকা ছ' পয়সা

মশারির চাল—২ গজ নাটা—চার আনা

১টি পত্যুত্তী শাড়ী—এক টাকা

শ্রীচন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মাথা পিছু ব্যয়ের হিসাব করতে গিয়ে লিখে গেছেন, একজন গরীবের জীবনযাত্রার ব্যয় গ্রামে ১০—১৫ টাকা, শহরে ১৫—২০ টাকা। ধনী পরিবারের সাংসারিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল গ্রামে ৩০—৫০ টাকা, শহরে ৬০ - ১০০ টাকা।

তখনও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হাওড়ার কর্তৃত্ব পায়নি। সাঁত্রা-গাছিতে একটি পাকা ছাদ নির্মাণের অনুমতি লাভের জন্য নবাব সরকারে ৫০০ টাকা জমা দিতে হয়। হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে এটিই প্রথম পাকা বাড়ী। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে শহরে একতলা পাকা বাড়ী তৈরীর খরচের হিসাবে ধরা হয়েছে ২০০ ৩০০ টাকা, দোতলা বাড়ীর ৩০০—৬০০ টাকা। গ্রামাঞ্চলে বাড়ী তৈরীর খরচ শহরাঞ্চলের খরচের দুইয়ের তিন ভাগ।

১৯২৬-এ শরৎচন্দ্র নবনির্মিত সমতাবেড়ের বাড়ীতে যান। বাড়ী, বাগান ও পুকুরের জমির দাম পড়েছিল এগারশো টাকা। বাড়ী তৈরী ও পুকুর কাটানোর খরচ সতের হাজার টাকা। মাটির দেওয়াল ও টালির ছাদ দেওয়া দোতলা বাড়ীটির একতলা ও দোতলার মেঝে সিমেণ্ট করা। দেওয়ালের ভেতরে বাঁশ-কঞ্চির উপরে মাটির সঙ্গে উলুঘাস মিশিয়ে উলুটি করে মসৃণ করা। ১৯৮৮-এর বন্যায় বাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া সেবা সঙ্ঘ যখন সার্বজনীন দুর্গাপূজা শুরু করে তখন চাঁদা আদায় হ'ত ৩৫ টাকা। পুজোর খরচ বাদ দিয়ে এই টাকায় অষ্টমীর দিন মেয়েদের লুচি-বোঁদে এবং সঙ্ঘের সভ্যদের লুচি-মাংস খওয়ান হ'ত।

ব্যবসা বাণিজ্য বন্দর

হাওড়া জেলার রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ধান, ময়দা, নারিকেল, হুকা, চামড়া, কাপড়, রেশম, ইট ও দড়ি এবং আমদানী দ্রব্যের মধ্যে চাল, গম, ডাল, তৈলবীজ, বিদেশী কাপড়, কেরোসিন তেল, পাট, ঘি, চিনি, তুলা, নুন, তামাক, কাঠ, লোহা, খড় আলু, জুতা ও কাঁচ প্রধান, একথা লেখা আছে ১৯০৯ এ ছাড়া ইম্পিরিয়াল গেজেটে।

যেদিন থেকে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের উদ্ভব সেদিন থেকেই বর্তমানে হাওড়া রূপে পরিচিত ভূখণ্ডটি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে—একথার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারী, নাবিক-বণিকদের বর্ণনায়, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর পুঁথিতে এবং স্থানীয় অধিবাসীদের মুখে মুখে কিম্বদন্তীর আকারে।

অতীতে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত জলপথই ছিল হাওড়ার বর্হিবাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের মুখ্য পথ। যে সময় সরস্বতী নদী তরুণী ছিল, সে সময় শ্রীমন্ত সওদাগরদের তরণী এই পথ দিয়েই হাওড়া হ'য়ে সিংহলে যেত।

বাঙালী বণিককুল তাম্রলিপ্ত—বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুক থেকে যখন বাণিজ্য ব্যাপারে বের হতেন, সন্নিহিত অঞ্চল হিসাবে হাওড়ারও এই বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। পর্তুগীজরা বাংলায় বাণিজ্য করতে এসে "ব্যাতোর" বন্দরকে ইউরোপ বিখ্যাত করার আগে থেকেই এটি ছিল পূর্বভারতীয় বর্হিবাণিজ্যের দ্বার

বিশেষ। কবি কঙ্কণের সমসাময়িক মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলে আছে—

ছৈ ঘরে বসিয়া সাধু বল্লে বাহুরা
বেতোড়েতে উপজিল সাধুর সপ্ত ডিঙ্গা।

সপ্তগ্রামে যাওয়ার পথে বেতোড়ে ব্যবসায়ীদের সাময়িক যাত্রা বিরতি ঘটত। বেতোড় সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মন্তব্য— It was to Satgaun what Zedda is to Mecca." ১৫৭০-এ মিঃ ফেড্রিক নামে এক পর্য্যটক সপ্তগ্রামে দেখেছেন—"The merchants gather to-gether for their trade from Battor." পর্ত্তুগীজরা এখানে হাট বসাত। বেচা কেনার শেষে চলে যাবার সময় হাটের অস্থায়ী আস্তানাগুলিকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে যেত। এক কথায় বেতোড় ছিল সপ্তগ্রামের সহায়ক বন্দর।

হাওড়া—মেদিনীপুরের মধ্যে নদীবাহিত বাণিজ্যের মুখ্যকেন্দ্র ছিল আমতা। এখনও আমতার একাংশের নাম কেঁড়াই বন্দর এবং থলিয়া গ্রামের দামোদর নদতীরবর্ত্তী একাংশের নাম বন্দরঘাটা। এই সময়ের প্রধান রপ্তানীদ্রব্য ছিল কার্পাস ও রেশমবস্ত্র। অর্থাৎ ওজনে হাল্‌কা অথচ দাম বেশী। জেলার তাঁতি, যুগী ও মুসলমান জোলা সম্প্রদায়ের জাতব্যবসা ছিল কাপড়বোনা এবং প্রধান কেন্দ্র-সমূহ ডোমজুড়, জগৎবল্লভপুর, আমতা ও বাগনান। রেশমগুটি পালিত হ'ত শ্যামপুর, উলুবেড়িয়া, বাগনান, জগৎবল্লভপুর ও আমতায়। এখানে কাঁচা রেশম তৈরী হ'য়ে কাপড় তৈরীর জন্য

হুগলী ও মেদিনীপুরে চালান যেত। নুন তৈরী হ'ত জেলার দক্ষিণাংশে—যেখানে মাটিতে নুনের ভাগ বেশী—যেমন বাগনানে।

সরস্বতী মজে গেল, বেতোড় বন্দর বিলুপ্ত হ'ল। একদা যে কার্পাস বস্ত্র ভারতের প্রধান রপ্তানী পণ্য ছিল, সেটি হয়ে দাঁড়াল আমদানী দ্রব্য। এসব পবিবর্তন একদিনে হয়নি, ধীরে ধীরে হয়েছে, একাধিক কারণে হয়েছে।

প্রথম কারণ, পর্তুগীজ ও আরাকানী জলদস্যুদের নিয়ম মাফিক বার্ষিক উৎপাত। জলদস্যুরা ব্যাপারীদের নৌকা থেকে নুন, কাপড় ও রেশম কেড়ে নিত।

দ্বিতীয় কারণ, বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা। মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত উত্তর-পূর্ব হাওড়ার তাঁতি ও রেশমগুটি পালনকারীরা হুগলী নদী পার হয়ে ২৪ পরগণা জেলায় আশ্রয় নেয়।

তৃতীয় কারণ, ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এক চেটিয়া ব্যবসা শুরু করার প্রয়াস।

ইউরোপে সপ্তবর্ষ যুদ্ধ জয়ের সময়ই ইংরাজরা বাংলার বাণিজ্য করায়ত্ত করে এবং পরিশেষে, অন্য সব ইংরাজ কোম্পানীকে হটিয়ে সেই বাণিজ্য করায়ত্ত করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ইংরাজদের এদেশে আসার উদ্দেশ্য ছিল এখানের তৈরী জিনিষ ইউরোপের বাজারে বেশী দামে বিক্রী করে কিছু মুনাফা অর্জন করা। তাই

নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরাজরা প্রথমদিকে দেশীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহ দিতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজরা যখন বাংলায় অপ্রতিদ্বন্দী তখন সর্ববিষয়েই তারা একচেটিয়া কারবার শুরু করে। Consideration on Indian Affairs—এর লেখক উইলিয়াম বোল্টের মতে—"The first was the private monopoly in partnership which commenced in the beginning of June 1765 between Lord clive, Messieurs Summers, Sykes and verelest each one quarter part for purchasing large quantities of salt that was in the hands of private merchants and in August 1765 the monopoly of inland trade in Salt, betel-nut and tobacco established."

১৭৬৯-এ লেখা শ্রীবিজয়রাম সেনের তীর্থমঙ্গল কাব্যে বালীর ঘাটের উল্লেখ আছে—"দেওয়ানজির ঘাট সেই অপূর্ব বসতি।
বালীর ঘাটেতে নৌকা গেল শীঘ্রগতি।"

হাওড়ার বাণিজ্য ঐতিহ্যের স্বাক্ষর পাওয়া যায় রসপুরের রায় বাড়ীর দুর্গাপূজার আচরিত বুহিত্র [বহিত্র] তোলা নামক প্রথায়। নবমীপূজার দিন বাঁশের তৈরী একটি কৃত্রিম নৌকা তৈরী করা হয় এবং মাঝরাতে শঙ্খধ্বনি সহকারে নৌকাটিকে মণ্ডপ থেকে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়।

হাওড়া আভ্যন্তরীণ জলপথে উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশের সাথে যুক্ত। দেশ বিভাগের আগে ঐসব অঞ্চলের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশ জলপথেই সম্পন্ন হ'ত। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ [অধুনা দঃ পূঃ রেলপথ] চালু হবার আগে মেদিনীপুর সেচ খাল দিয়ে হাওড়া হ'য়ে কলকাতা থেকে মেদিনীপুরে মাল ও যাত্রী চলাচল করত। দুর্গাপুর নৌবাহন খাল জলপথে কয়লা ও ইস্পাত উৎপাদক অঞ্চলের সাথে হাওড়ার যোগাযোগ সহজ করে দেয়।

১৮৮০-৮৫ বা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও শেয়ারের ভাড়াটে নৌকায় এবং অল্প সংখ্যক লোক নিজেদের বাড়ির পানসিতে চড়ে আন্দুল-উলুবেড়িয়া থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত করতেন। তারপর এ'ল 'হাওয়া কলের না' বা ষ্টীমার। তাও বন্ধ হ'ল। বর্ষাকালে জল জমলে গ্রামান্তরে যাওয়ার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'ত সালতি—এক ধরণের অল্প চওড়া জলযান। মেদিনীপুর থেকে যখন নৌকা করে হাওড়ায় ধান আমদানী হ'ত তখনও চার-পাঁচ'শ মণ মাল বোঝাই নৌকা বা কিস্তী চলাচলের উপযুক্ত জল সরস্বতী নদীতে ছিল। এসব এখন গল্প কথা।

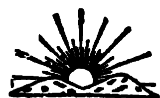
—ঃ ঃ—

ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব হওয়ার পর বাংলার রপ্তানি বাণিজ্যের ধারা পাল্টে গেল। বৃটিশ আমলে আমাদের রপ্তানি পণ্যের তালিকার দিকে চোখ বোলালে সহজেই বুঝতে পারা যায়, এসময় আমাদের আর্থিক কাঠামোটি ছিল অর্ধোন্নত দেশের মত, তবু ওরই মধ্যে মুখরক্ষা করল পাট-শিল্প। মসলিন রপ্তানি করে সোনা আনা বন্ধ হওয়ার পর সে জায়গাটি অধিকার করল "স্বর্ণতন্তু" পাট। পাটের ব্যবসাটা বাংলাদেশ [অবিভক্ত] একচেটিয়া করে নেওয়ার সময় হাওড়ার অবদান অনস্বীকার্য। আজও পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগ পাটকল হাওড়াতেই।

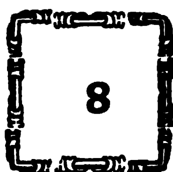
অধুনালুপ্ত হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হ'বার আগে মাজু প্রভৃতি অঞ্চলে কানা দামোদর ছিল কলকাতা থেকে মাল আনা নেওয়ার একমাত্র সহজ পথ। এখনও হাওড়ার অন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জলপথের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য। ভাগীরথী সারাবছরই নাব্য। এখন দামোদর নদ আসানসোল পর্যান্ত নাব্য ছিল। তখন রাণীগঞ্জের কয়লা ও অন্যান্য জায়গার কৃষিপণ্য নৌকাযোগে হাওড়া, হুগলী ও কলকাতায় আসত। এখনও জোয়ারের সময় আমতা পর্য্যন্ত নৌকা চলে।

১৯৫০-৬০-এ শ্রীসত্যকাম সেন মহাশয়ের [Drainage Study of Lower Damodar Valley] হিসাব মত রূপনারায়ণ ও দামোদর নদের নাব্যতার পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ—

নদীর নাম	কতদূর নাব্য	যাতায়াত যোগ্য সবচেয়ে বড় জলযানের মাপ
রূপনারায়ণ	বন্দর	১৩০´ × ১৯´
দামোদর	আমতা	৭৫´ × ১০´



শিক্ষা



সংস্কৃত শিক্ষা—টোল ও চতুষ্পাঠী

সংস্কৃত শিক্ষাদান কেন্দ্রগুলি টোল ও চতুষ্পাঠী নামে পরিচিত। এক সময় হাওড়াতে সংস্কৃত চর্চার মান ছিল উন্নত এবং টোলের সংখ্যাও ছিল অনেক।

নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দামোদর—রূপনারায়ণ দোয়াবের কয়েকটি স্থান বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভূরিশ্রেষ্ঠ এবং বেতোর ব্যতীত দামোদর-ভাগীরথী বা সরস্বতী-ভাগীরথী দোয়াবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য জনপদের অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি ; অতএব বিদ্যাচর্চারও।

আনুমানিক ৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভুরশুটে বাস করতেন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বৃহস্পতি যাঁর পৌত্র হ'লেন ন্যায় বৈশেষিক-এর প্রথম আস্তিক্য ভাষ্য "ন্যায়কন্দলি"র রচয়িতা শ্রীধরাচার্য। দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মত "শ্রীধরের প্রায় ১০০ বৎসর পরে

ভুরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের পাণ্ডিত্য খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। চন্দেলরাজ কীর্তিবর্মার সভাপতি কৃষ্ণমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে ....অহঙ্কার নাম দিয়া শ্রীধরের পৌত্র কিম্বা প্রপৌত্র পর্য্যায়ের ভুরিশ্রেষ্ঠ নিবাসী কোন সমকালীন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের প্রতি বিদ্রুপ করিয়াছেন। অন্যত্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে......তৎকালীন বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ বিদ্যার্থীগণের একটি মূল্যবান পাঠ্য পুস্তক তালিকা লিপিবদ্ধ আছে—যাহার অধ্যাপনা কাশী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল না।" আচার্য্য ক্ষিতিমোহন সেনের মতে কৃষ্ণমিশ্র ছিলেন ভুরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম নিবাসী।

একসময় আন্দুলও ছিল সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান। আন্দুলবাসী তান্ত্রিক সাধক ভৈরবীচরণ বিদ্যাসাগর নবদ্বীপের কোন বিচার সভায় নিজের বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধির পরিচয় দিলে তৎকালীন সুধীসমাজ আন্দুলকে "দক্ষিণের নবদ্বীপ" আখ্যায় ভূষিত করেন। চূড়ামণি তর্ক-সরস্বতী বাস করতেন চূড়ামণি পাড়ায়। হাওড়া শহরের খুরুট, সাঁকরাইল থানার পাঁচপাড়া এবং সরস্বতী তীরবর্তী জোড়হাট অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত হয়। পণ্ডিত রামশঙ্কর তর্ক পঞ্চাননের প্রচেষ্টায় ১৭৫৮ থেকে ১৭৯৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বালী ছিল সংস্কৃত শিক্ষার এক বিশিষ্ট ক্ষেত্র। বালীর বাসগী গ্রামে কোন এক তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীর বেশ সুনাম ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমতা থানার নারীট গ্রামটি ছিল সংস্কৃত শিক্ষার আর একটি কেন্দ্র। গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ

পণ্ডিত এখানে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেন। সাঁত্রাগাছির ছোট ভট্টাচার্য্য পাড়ায় রামকান্ত ভট্টাচার্য্য আনুমানিক ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য্য ও পৌত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হলধর ন্যায়রত্ন ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এটিকে সগৌরবে পরিচালনা করেন। বাজে শিবপুর নিবাসী শ্যামাচরণ কবিরত্ন মশায় সংস্কৃতে বহু পুস্তক রচনা করলেও, কোন টোল খোলেননি। গিরিশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, রূপরাম ন্যায়রত্ন, রামদাস তর্কসিদ্ধান্ত, অভয়পদ স্মৃতিতীর্থ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শিক্ষাদানে বিশেষ সুনাম অর্জন করলেও সালিখানিবাসী বৈদ্যপণ্ডিত রামলোচন কবিভূষণ ষাট বছর বয়সে যে কৃতিত্ব অর্জন করেন হাওড়ার অপর কোন সংস্কৃত শিক্ষকের ভাগ্যে সে সম্মান জোটে নি। এই সংবাদটি পরিবেশন করেছেন সাপ্তাহিক হাওড়া বার্তা। পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন মিঃ উইলিয়াম জোন্স। তিনি কবিভূষণকে স্বীয় সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত করেন মাসিক একশ টাকা বেতনে, তদুপরি হাওড়া থেকে খিদিরপুর পর্য্যন্ত যাতায়াতের পাল্কী ভাড়া দেবার বিনিময়ে। শিক্ষাদান শুরু হবার আগে কবিভূষণ যে আটটি সর্ত আরোপ করেন, বাধ্য ছাত্রের মত সুপ্রীম কোর্টের জজ সাহেব তাও মেনে চলেন। কবিভূষণ নির্দিষ্ট সর্ত আটটি হল—

১। একটি একতলা গৃহে অধ্যাপনার স্থান নির্দিষ্ট হইবে।

২। পাঠকক্ষের মেঝে মর্ম্মর রচিত হইবে।

৩। পাঠকক্ষের দেওয়াল ও মেঝে হিন্দু ভৃত্যের দ্বারা প্রত্যহ গঙ্গাজলে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে।

৪। পাঠের জন্য নূতন কাষ্ঠাসন নির্মাণ করিতে হইবে ও উহা প্রত্যহ গঙ্গাজলে মার্জনা করিয়া লইতে হইবে।

৫। প্রাতঃকাল ব্যতীত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইবে না।

৬। পাঠের পূর্বে ছাত্র (মিঃ জোন্স) কোন অখাদ্য ভক্ষণ করিবেন না।

৭। পাঠের পূর্বে শিক্ষার্থীকে নূতন বস্ত্রাদি পরিধান করিতে হইবে।

৮। গোমাংস, শুকরের মাংস, কাঁটাচামচ প্রভৃতি পাঠকক্ষের বা পাঠের সময় সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়।

উনিশ শতকের প্রথম দিকের সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিবরণ ১৮২০ খ্রীঃ-এ শ্রীরামপুর নিবাসী পাত্রী ওয়ার্ড সাহেব লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। তাঁর বিবরণ অনুসারে বালীগ্রামে তিনটি সুপরিচালিত চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এ্যাডামস্ রিপোর্টে দেখা যায় প্রতি গ্রামেই টোল ছিল এবং দরিদ্র জনসাধারণেরও ছিল বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দেও বামনগাছিতে শিরোমণিদের টোল এবং বাবুর ডাঙ্গার (শালকের) টোলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রিটিশ আমলে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার আগে পর্য্যন্ত ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। ভাগ্য

পরিবর্ত্তনের আশায় বাংলার জ্ঞানীগুণীরা কলকাতায় আসতেন ; সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। বলা বাহুল্য পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান সূত্রে সংস্কৃত ভাষা এই সময় নবজীবন লাভ করে। উদয়নারায়ণপুর থানার বসন্তপুর ও আমতার রসপুর গ্রামের বসন্তপুর চতুষ্পাঠী ও রসপুর মহামায়া চতুষ্পাঠী, বালিটিকুরীর সদানন্দ চতুষ্পাঠী, শঙ্করাচার্য্য চতুষ্পাঠী [রামরাজাতলা] পাতিহাল চতুষ্পাঠী এবং মাকড়দহ চতুষ্পাঠীতে এখনও সংস্কৃতের পঠন-পাঠন হয়।

সংস্কৃতের মরাগাঙে জোয়ার আনার কাজে হাওড়ার পণ্ডিত সমাজের দানও অকিঞ্চিৎকর নয়। হাওড়ার সেই ঐতিহ্যকে প্রবাহমান রাখার কাজে আরও অনেকের মত হাওড়া পণ্ডিত সমাজ এবং হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ নিজেদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। বাংলা ১৩৩০ সালের ১৭ই ভাদ্র হাওড়া পণ্ডিত সমাজের উদ্বোধন করেন তদানীন্তীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। সমাজের পরিচালনাধীন— (ক) গবেষণা সাহিত্য ও গ্রন্থ প্রকাশ, (খ) জ্যোতিষ বিভাগ এবং (গ) নাট্য বিভাগের মধ্যে জ্যোতিষ বিভাগের কৃতিত্ব সমধিক উল্লেখযোগ্য। নূতন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার আয়োজিত পঞ্চাঙ্গ সম্মেলনে আলোচ্য বিভাগটি প্রশংসনীয় কৃতিত্বের অধিকারী হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশের জন্য কৃষ্ণধন স্মৃতিভূষণ, মুরারিমোহন বেদান্তাদিতীর্থ, ডঃ রাধা কুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। হাওড়ার সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের জন্ম বাংলা ১৩৪৪ সালের ২৭শে ভাদ্র। প্রতিষ্ঠাতাদের

মধ্যে রামগোপাল স্মৃতিরত্ন ও শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান অছিপরিষদের সভাপতি শ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ, সম্পাদক—শ্রীনিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ। সালিখা, কাসুন্দিয়া মাকড়দহ, জগাছা, পঞ্চাননতলা, শিবপুর এবং কলিকাতার এন্টালীতে এদের শাখা আছে। সংস্কৃত পঠন-পাঠন, অভিনয় এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা সমাজের কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

: মাদ্রাসা :

সুলতানী আমল থেকে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ পর্য্যন্ত ঐস্লামিক শিক্ষাধারার ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসা মক্তবগুলি সজীব ও সক্রিয় ছিল। এখনও হাওড়ায় অনেকগুলি ইসলামী ধারার শিক্ষাকেন্দ্র বা মাদ্রাসা আছে। নিত্য যাতায়তের পথে অনেকেই নিশ্চয় হাওড়া হাটের নিকট জি. টি. রোডের উপর অবস্থিত মাদ্রাসাটিকে লক্ষ্য করেছেন। একটি হিসাবে দেখা যায় বছর ত্রিশেক আগে নিম্ন-লিখিত জায়গাগুলির মাদ্রাসা সমূহ সুপরিচালিত ছিল—

সদর মহকুমা— (অনুদান প্রাপ্ত) ৬টি

পানপুর, বাঁকড়া, বাঁটুল, হাওড়াহাট, পাঁচলা ও শাঁকরাইল।

উলুবেড়িয়া মহকুমা—(অনুদান প্রাপ্ত) ৪টি

বসন্তপুর, চেঙ্গাইল, হল্যাণ এবং খাজনাবাহানা।

বিনা সাহায্যে পরিচালিত—

উলুবেড়িয়া, শাঁকরাইলে টিকেপারের মসজিদের কাছে এবং উলুবেড়িয়া থানার বাণীবন গ্রামের জঙ্গলবিলাসপারের মসজিদ সংলগ্ন মক্তব দু'টির ঐস্লামিক শিক্ষাধারা প্রচারে অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ইংরাজী শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব

ইংরাজ আমলে কলকাতায় যে সময় ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়, হাওড়াও সেই সময় এই প্রভাবের অন্তর্গত হয়। এখন যেখানে হাওড়া কোর্ট ১৭৮৫ খ্রীঃ-এ সেখানে ছিল অনাথ সৈনিক সন্তানদের জন্য সরকারী স্কুল—বেঙ্গল মিলিটারী অরফ্যানেজ। এখানে মেয়েদের সূচি-শিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সহ ৫০০ অনাথ বালক বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন ছিলেন এই স্কুলের সুপারিন্টেনডেন্ট। ইনি ১৭৮৬ খ্রীঃ-এ হিন্দু যুবকদের জন্য হাওড়ায় যে বোর্ডিং স্কুলটি খোলেন সেটিই হাওড়ার প্রথম ইংরাজী স্কুল। স্কুলের জায়গা ও জমির জন্য ব্রাউন সাহেব নিজে ১৮০০ টাকা দেন। তিনি হাওড়া ত্যাগ করায় ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।

কয়েক বছর পর শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারীরা ১৭৯৩ খ্রীঃ-এ হাওড়া ও শালকিয়ায় স্কুল খোলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ-এ খ্রীষ্টিয়ান নলেজ সোসাইটি বাংলা স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হন। ১৮২৪ খ্রীঃ-এ

এঁদের পরিচালনায় শিবপুর থেকে বালী পর্য্যন্ত এলাকায় ৬টি স্কুল স্থাপিত হয়। মিঃ টুইডেল ছিলেন বিদ্যালয়গুলির প্রথম সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট। প্রতিষ্ঠানটি ১৮২৭-এ ব্যাঁটরায় একটি স্কুল খোলেন। জগৎবল্লভপুরের স্কুলটির প্রতিষ্ঠা ১৮০৬ খৃঃ-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও পূর্বে।

হাওড়া ময়দান নিকটস্থ ফাঁসিতলার কাছে ইংরাজদের নাচঘরের একাংশে ১৮৪৫ খ্রীঃ-এ প্রতিষ্ঠিত হয় হাওড়া গভর্ণমেন্ট স্কুল। ১৮৩৮ খৃঃ-এর ২৮শে জুলাই আন্দুলের এক সভায় গ্রামাঞ্চলে নূতন নূতন ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং রাজা রাজনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হয় আন্দুল একাডেমী। ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় প্রধান শিক্ষকগণ দ্বারা পরিচালিত হাওড়া গভর্ণমেন্ট স্কুলের প্রথম ভারতীয় প্রধান শিক্ষক ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮ . ১০ . ১৮৪৯-০ . ৬ . ১৮৫৬]। হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৯০ খৃঃ-এ স্কুলটির পরিচালনা ভার নেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ-এ স্কুলের যুগ্ম-পরিচালক হ'ন মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড। ১৯০৬ খৃঃ-এ পুরোপুরি সরকারী পরিচালনায় যাবার পর স্কুলের নতুন নাম হয় হাওড়া জেলা স্কুল। সরকারী উদ্যোগে এটিই জেলার প্রথম স্কুল। কবি করুণানিধন বন্দ্যোপাধ্যায় স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষকদের একজন। স্কুলের বহু কৃতী প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন হ'লেন নরসিংহ দত্ত, চারুচন্দ্র সিংহ, প্রাক্তন এয়ার মার্শাল সুব্রত

মুখার্জী, ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাণীকুমার [বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য], ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিনয়-শিল্পী সৌমিত্র চ্যাটার্জী।

মোক্তার ক্ষেত্রমোহন মিত্রের উদ্যোগে ভারতীয় পরিচালনায় জেলার প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় সালকিয়া এ্যাংলো স্যান্সক্রিট বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বছর ১৮৫৫ খ্রীঃ। সরকার থেকে বিদ্যালয়ের জন্য ১৮৫৭ খ্রীঃ-এ মাসিক ৮৭ টাকা সাহায্য বরাদ্দ হয়। ১৮৫৯ খ্রীঃ-এ বিদ্যালয়টি প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থী পাঠায়। ১৮৫৫ খ্রীঃ-এ পুণ্য শ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কয়েকজন খ্রীষ্টান মিশনারী ও গ্রামস্থ কিছু বিদ্যোৎসাহীর সহায়তায় বেলুড় হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। পাইকপাড়ারাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সিংহের [লালাবাবুর] বেলুড়ের বাড়ীতে বর্তমানে এই স্কুলের অবস্থান। ১৮৫৪ খৃঃ-এ বাগনান হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা। বালী শান্তিরাম বিদ্যালয়টি ১৮৫৫ খৃঃ-এ রিভার্স টমসন স্কুল নামে স্থাপিত হয়। উত্তর পাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বলুহাটী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন ১.২.১৮৫৬-তে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র আশুতোষ মুখার্জী ১৮৬৮ খৃঃ-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পি. আর. এস সম্মানে ভূষিত হন। ১৮৬৬-তে মুগকল্যাণে যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন ইউরোপীয়। ১৮৭১ খৃঃ-এর মধ্যে আন্দুল ও আমতায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের দু'বছর পর ১৮৫৯ খৃঃ-এ হাওড়ার চ্যাপলেন হিসাবে যোগদান করেন রেভাঃ ডাঃ উইলিয়াম পেন্সার। তিনি ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় ছাত্রদের জন্য সম্ভবতঃ ১৮৬৫খৃঃ-এ সেন্ট টমাস স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। এখন ভারতীয় ছাত্রগণও এই বিদ্যালয়ে

প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং বিদ্যালয়ের পরিবর্তিত নামকরণ হয়েছে সেণ্ট টমাস চার্চ স্কুল। ১৮৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত হাওড়ার তদনান্তীন জেলাশাসক মিঃ বাক্ল্যাণ্ড এই বিদ্যালয়ের পরিচালক পরিষদের সদস্য ছিলেনএবং একসময় অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবেও কাজ করেন। ২।৫।১৯২০ তারিখের স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা পাঠে জানা যায় কলকাতার সেণ্টপলস বিদ্যালয়, প্র্যাট মেমোরিয়াল বিদ্যালয়, ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব বিদ্যালয়, এবং লিলুয়া বিদ্যালয় ও অন্যান্য বহু শিক্ষাব্রতীর সামনে সেণ্ট টমাস বিদ্যালয়ের হেড মিস্ট্রেস মিস. ডি. লেপলেস অনুসৃত সেন্স ট্রেনিং (Sense Training) পদ্ধতির কার্য্যক্রমসাফল্যের সাথে প্রদর্শিত হয়। জজ সারদাচরণ মিত্র ছোটবেলায় যতদিন শিবপুরে ছিলেন বৈকুণ্ঠবাবুর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৬-এ প্রতিষ্ঠিত বৈকুণ্ঠ দত্তের পাঠশালা বিভিন্ন নাম ও স্থান পরিবর্ত্তন করে অবশেষে ১৯১০-এ বটকৃষ্ণ পালস্ ইনষ্টিটউশন নামে ১৬, বাজে শিবপুর রোডে স্থায়ী আসন পায়। ১৮৬০ খৃঃ-এ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত হরিনাথ শর্মা শিবপুরে একটি এ্যাংলো ভার্ণাকুলার বিদ্যালয় খোলেন। ১৮৭৪-এ বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ইংরাজী ১৮৭৪-৭৫ খৃঃ-এ ৫০/৬০ জন ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, শিবপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়—যেটির বর্ত্তমান পরিচিতি দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশন। দীনবন্ধুবাবুএ্যাকাউনটেণ্ট জেনারেলের অফিস থেকে অবসর গ্রহণের পর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শুরু করেন এবং চিকিৎসালব্ধ সমুদয় অর্থ —প্রায়৪০/৫০ হাজার টাকা—বিদ্যালয়টির উন্নতিকল্পে দান করেন।

শিবপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ নির্মাণে কাজীপাড়ার দ্বারিজমা কাজি সাহেবের অবদানও প্রচুর। বিদ্যাসাগর মশাই যখন ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে সচেষ্ট সেই সময় তিনি একবার আমতা থানার গড়ভবানীপুর গ্রামে জমিদার রামপ্রসন্ন রায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। এ অঞ্চলে তাঁর পদার্পণে উৎসাহিত কিছু ব্যক্তি ১৮৭৬-এ রসপুরে একটি মাধ্যমিক ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৩-এ স্কুলটির নতুন নাম হয় রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়। ১৮৯৪-এ এই বিদ্যালয় থেকে ৩/৪ জন ছাত্র প্রথম এনট্রান্স পরীক্ষা দেয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিদ্যালয় পরিদর্শনে এলে তার কাছে আবেদন জানান হ'ল, বিদ্যালয়ের জন্য একটি পুকুর চাই। সাঁতার শেখার জন্য নয়, ছাত্রদের পিপাসা মিটাবার জন্য। তখনও এ অঞ্চলে টিউব-ওয়েল চালু হয়নি। তাই এই প্রার্থনা। প্রার্থনাটি পূরণ করেন খড়িয়প নিবাসী জমিদার প্রসন্ন কুমার বসু।

বাঁ্যাটরার মধুসূদন পালচৌধুরী হাই ইংলিশ স্কুলের বীজ অঙ্কুরিত হয় ১৮৬৮ খ্রীঃ-এ ব্যাঁটরা প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে। তখনও এ অঞ্চলে পাশাপাশি চালু ছিল প্রাচীন প্রথায় শিক্ষাদান। পুলিন গুরু মশায়ের পাঠশালা চালু ছিল ১৮৯০ থেকে ১৯০৫ পর্য্যন্ত দঃ ব্যাঁটরার কালীপূজা বারোয়ারী প্রাঙ্গণে।

১৮৭৫-এ স্থাপিত হয় পাণিত্রাস এম. ভি স্কুল, প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯৩-এ রায় বরদাপ্রসাদ বসু

বাহাদুর মাজুতে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কাসুন্দিয়ায় ১৯২২-এ প্রতিষ্ঠিত সরস্বতী ইনষ্টিটিউশন ১৯২৩ থেকে বিবেকানন্দ ইনষ্টিটিউশন নামে পরিচিত। বিদ্যালয়টির কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে আছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ডঃ নিমাই সাধন বসু, শংকর [মণি শংকর মুখোপাধ্যায়] প্রভৃতি। ১৯২৫ খ্রীঃ-এ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাঁত্রাগাছির কেদারনাথ ইনষ্টিটিউশনের বর্তমান বাড়িটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এর আগে সাঁত্রাগাছিতে ১৮৫৭-তে সরকারী আনুকুল্যে একটি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৪-তে স্কুলটি কেদারনাথ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭০-এ এটি সাঁত্রাগাছি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহিত মিলিত হয়। অক্ষয় শিক্ষায়তনের [পূর্ব নাম রিপন স্কুল] প্রতিষ্ঠা বৎসর ১৮৫৭। বি. কে. পাল ইনষ্টিটিউশনের [১৮৭৭] কয়েকজন কৃতী ছাত্র—ডাঃ তড়িৎ ঘোষ, ডাঃ সত্যব্রত ঘোষ, ডাঃ বিনোদ রায় ও ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরী।

শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮২০ খ্রীঃ-এ হাওড়ায় "বাজার স্কুল" নামে অভিহিত একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য প্রথায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে এটিই জেলাতে প্রথম প্রয়াস। ১৮৩৯-এ মিসেস হ্যাম্পটো নামক এক ইংরাজ মহিলা একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ক্রমে মিশনারীগণ পরিচালিত সেণ্ট এ্যালুইসাস, সেণ্ট এ্যাগনেস, সেণ্ট টমাস, সেণ্ট এলিজাবেথ বিদ্যালয় চারটিতে বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে সেণ্ট টমাস চার্চ স্কুলে সহশিক্ষা এবং সেণ্ট এ্যাগনেস বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র বালিকাদের

শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু আছে। সেণ্ট এলিজাবেথ বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত হয়েছে কলকাতার খিদিরপুরে।

মন্মথ নাথ শেঠ প্রতিষ্ঠিত ভানুমতী বালিকা বিদ্যালয় সাঁত্রাগাছির প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ১৮৬৩ খ্রীঃ-এ সরকারী অনুদান প্রাপ্ত ভারতীয় পরিচালনায় জেলার প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের গৌরবও সাঁত্রাগাছির। শিবপুর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ১৮৩৭-এ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। যদিও ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন তবু ১৮৭৬ খ্রীঃ-এ ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেনে বিদ্যালয়টির নিজস্ব বাড়ী ছিল। বর্তমান বিদ্যালয় গৃহের অবস্থান ৪৫, শিবপুর রোডে, ১৮৮৯ খৃঃ-এ এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা সর্বপ্রথম উত্তরপাড়া হিতকরী সভার নিম্ন ও উচ্চ বৃত্তি লাভ করে। ভগিনী নিবেদিতা ১৯০২ খৃঃ-এ বিদ্যালয়টিতে এসেছিলেন। ১৮৮৭ তে আমতা থানার রসপুর গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী শিক্ষাব্রতীগণ ১৮৯৪ খৃঃ-এ প্রতিষ্ঠা করেন বালীবন গার্লস হাই স্কুল। শিক্ষানুরাগী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত শিবপুর যোগমায়া বালিকা বিদ্যালয়ের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায়। বাজে শিবপুরে আছে প্রসন্নকুমারী বালিকা শিক্ষালয়। বালীর মেকলে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে।

হাওড়ায় ইংরাজী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ১২৬৫ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ (ইং জুন ১৮৫৮) সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হয়—

"প্রদেশব্যাপী শিক্ষার প্রসারের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং হাওড়ার ট্রেনিং বিদ্যালয়ে "ডেভিড ষ্ট্রো প্রণীত ট্রেনিং সিসটেম"-এর বিস্তারিত বিবরণ করা হইয়াছে।"

সমগ্র জেলায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৪০টি-এর মধ্যে প্রাথমিক ৮২৯, মাধ্যমিক ৫৮ এবং বিশেষ ধরণের ৫৩টি। শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় ৩.৬২ লক্ষ টাকার মধ্যে বেতন বাবদ আদায়ছিল ১.৫৮ লক্ষ টাকা। রাজ্য সরকারের অনুদান ১.৪৮ লক্ষ টাকা, জেলা বোর্ড-এর কাছ থেকে পাওয়া যেত ২৪000 টাকা এবং পুরাসভা দিতেন ৬০০০ টাকা।

বর্তমানে রাজ্যের অন্যান্য জেলার ন্যায় হাওড়াতেও অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

সে যুগের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও অভিভাবক

এ যুগের পরীক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষা পরিচালনার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত পরীক্ষা গৃহে অপর কাহারও প্রবেশ নিষেধ। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখের ১৩৮ সংখ্যক সংবাদ প্রভাকরের পাতা ওল্টালে কিন্তু এই খবরটি আপনার চোখে পড়বে—অদ্য বেলা দশ ঘটিকার সময় হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাটিতে শালিখার এলোকা বরণাকিউলার

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পঞ্চবার্ষিকী পরীক্ষা লইবেন। অতএব বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরা পরীক্ষা গৃহে উপস্থিত হইয়া বালকগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

বছর পাঁচেক আগের হিসাবে হাওড়া জেলার স্কুল বোর্ড পরিচালিত বুণিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০৬, বোর্ড পরিচালিত প্রাথমিক সংখ্যা ১৩০৮টি। হাওড়া পৌরসভা পরিচালিত ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে হিন্দী মাধ্যম ৫, উর্দু মাধ্যম ৩ এবং বাংলা মাধ্যম ১৭টি, বিদ্যালয়গুলির গড় বার্ষিক ছাত্র সংখ্যা ৫৫০০। বালী পৌরসভা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা পাঁচ।

সমাজ শিক্ষা—নিরক্ষরতা

১৯৭১-এর আদম সুমারি অনুযায়ী সাক্ষরতার হার সমগ্র পঃ বঙ্গ ৩৩.২০%, কলকাতায় ৬০.৩৫%, হাওড়ায় ৪০.৫৯%। হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীন পাঁচ প্রকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ কেন্দ্র আছে—

১। বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র—৮৩টি ২। নৈশবিদ্যালয়—৬০টি

৩। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র—রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত—৯টি

৪। শিক্ষা ও সমষ্টি মিলন কেন্দ্র—১টি [বাণীবন, উলুবেড়িয়া]

৫। এক শিক্ষক পাঠশালা—কমপক্ষে ২০ জন ছাত্রের জন্য একটি পাঠশালা

বে-সরকারী উদ্যোগে বয়স্ক ও চাকুরিয়াদের ৫ম—১০ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান'র জন্য ৩টি বিদ্যালয় আছে।

ক) শ্রীমা মহিলা সমিতির উচ্চ বিদ্যালয়, শালকিয়া।

খ) বয়স্ক পুরুষদের জন্য নৈশ উচ্চ বিদ্যালয়—কালীকুণ্ডু লেন। প্রতিষ্ঠাতা—বিজয় বক্সী।

গ) রাজাপুর দক্ষিণবাড়ী বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়।

১৯২১-এ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম (কাসুন্দিয়া) বালি, মাহীয়াড়ী, দক্ষিণ ঝাপড়দহ, আমতা, বাঁটরা, শিবপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রায় ৩০টি গণসাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৫১-৫৭'র মধ্যে বেলুড় জনশিক্ষা মন্দির (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯) কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭৩-৭৪-এ রাজ্য সরকারের পাইলট প্রোজেক্ট অনুযায়ী জনশিক্ষা মন্দির বাগনানের ভাঙ্গাগড়া এবং পাঁচলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে যে দু'টি বয়স্ক কেন্দ্র স্থাপন করেছিল আর্থিক অসুবিধার জন্য যে দু'টির বিলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে ৩টি নৈশ বিদ্যালয় মন্দির কর্তৃক পরিচালিত হয়। ১৯৭২-এ পঃ বঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতির হাওড়া জেলা কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক—অলোকনাথ পাঁজা, সমিতি পর্য্যায়-ক্রমে শ্যামপুর, বাগনান, কল্যাণপুরে ২৫টি, আমতা, পুরাশ-কানপুর, ডোমজুড়ে ২৫টি এবং হাওড়া, শিবপুর, শালিমারে ২৫টি করে স্বাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেন। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষাব্রতীদের কয়েকজন হলেন সর্বশ্রী চণ্ডী বাগ, অধ্যক্ষ

ডঃ অশোক কুণ্ডু, দ্বিজেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় এবং ডাঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতোতে সমিতির পরিচালনায় একটি বয়স্ক স্বাক্ষরতা কেন্দ্র আছে।

কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী

জেলার শিক্ষা বিস্তারে অসংখ্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীর অবদান স্মরণীয়। কয়েকজনের নাম-বটকৃষ্ণ পাল, অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় যোগেশ দাশগুপ্ত, নরসিংহ দত্ত, বিপ্রদাস পালচৌধুরী, সন্ন্যাসী সাধুখাঁ এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দু'জন প্রধান শিক্ষক বিবেকানন্দ স্কুলের সুধাংশু ভট্টাচার্য্য এবং হাওড়া জিলা স্কুলের বীরেশ্বর চক্রবর্তী—জাতীয় শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে কালীচরণ দে (জয়পুরবিল), রমণী মোহন ঢ্যাং (পাতিহাল) প্রভৃতির প্রচেষ্টা প্রশংনীয়।

বালীর পদ্মলোচন মুখোপাধ্যায় ছিলেন নেশায় সরকারী কর্মচারী, নেশায় অবৈতনিক শিক্ষাদানকারী। গ্রামে তাঁর পরিচিতি ছিল স্কুল মাষ্টার এবং সাহেবদের কাছে লর্ডপদ্ম। বালীর বরেন্দ্র নাথ দত্ত (১৮৭১-১৯০৭) অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী থাকা কালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সভ্য এবং সোসাইটি অফ্ লিটারেচারের সদস্য হন। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্ত ব্যতীত তাঁর আগে কেউ এই সম্মান লাভে সমর্থ হননি।

কলেজ

হাওড়ার প্রথম কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন বিশপ মিডলটন বর্ত্তমান শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজভবনে ১৮২০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর। Society for the prepagation of the gospel নামক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হ'তে কলকাতার প্রথম বিশপ মিডলটন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার আবেদন জানালে হাওড়া শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বোটানিকেল গার্ডেনের পাশের এই জলাভূমিগাটিতে প্রায় ৬০ বিঘা জমির উপর খ্রীষ্টিয় যুবকদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। খ্রীঃ-এ ১৮২০তে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হলেও, কলেজ শুরু হয় ১৮২৪খৃঃ-এ নামকরণ হয় বিশপস্ কলেজ। প্রথম প্রিন্সিপ্যাল ডঃ উইলিয়ম হজমিল্। কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল এদেশে খৃষ্ট ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, খ্রীষ্টিয় ধর্ম পুস্তকসমূহের দেশীয়ভাষায় অনুবাদ এবং খ্রীষ্টিয় মিশনারীদের আবাসস্থান নির্মাণ। যে আমলে ল্যাটিন, হিব্রু ও গ্রীক ভাষা ভারতের মধ্যে একমাত্র এই কলেজেই পড়ান হ'ত। রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে শিক্ষকতা করতেন এবং মৃত্যুর পর এখানেই সমাহিত হন। বিশপ হেবার এবং গভর্নর চার্লস মেটকফ ও লর্ড আমহার্ষ্ট কলেজটির উন্নতির জন্য যথেষ্ট আগ্রহ নেন। বিশপ হেবারের ইচ্ছা ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তানায়কগণের সৃষ্টি হবে এই কলেজ থেকে। খৃষ্টধর্ম গ্রহণের পর মাইকেল মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজ ছেড়ে

বিশপস্ কলেজে ভর্ত্তি হন। উইলিয়াম জোন্স—ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকায় দেশীয় ব্যক্তিবর্গ তাঁকে গুরু জোন্স বলে অভিহিত করতেন। তিনি ছিলেন বাড়ীটির প্রথম স্থপতি এবং ভারতে গথিক শিল্পের প্রবর্ত্তক। সিপাহি বিদ্রোহের সময় নিহত চারজন শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের স্মৃতিফলক কলেজ ভবনে আছে। ১৮৭৯ খৃঃ-এ কলেজটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। পরবৎসর কলকাতা থেকে পরিত্যক্ত কলেজ ভবনে স্থানান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সী কলেজের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ—এখন যার নাম শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ।

১৮৫০ খৃঃ-এ এদেশী ইঞ্জিনীয়ার সৃষ্টির কথা চিন্তা করে P. W. D.'র অধীনে রাইটার্স বিল্ডিং-এ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৬১-৬২ খৃঃ এ এই কলেজের অধ্যাপক কর্ণেল চেজনী কলকাতা ছেড়ে রুরকীতে চলে যান; P. W. D.'র হাত থেকে কলেজটিও যায় শিক্ষা বিভাগের হাতে। ১৮৬৪ খৃঃ-এ প্রেসিডেন্সী কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভাগ খোলা হয়। রাইটার্স বিল্ডিং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজেই পড়াশুনা করতেন। অধ্যাপক স্কট হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি কারখানা (Workshop) স্থাপনের প্রস্তাব করলে বৃহত্তর কলেজ প্রাঙ্গণের প্রয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যেই ১৮৮০ খৃঃ-এ বিশপ কলেজ ভবনে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের পুনর্বাসন হয়। কলেজ-সংলগ্ন বেশ কয়েক বিঘা জমির মালিক ছিলেন কাসিম বাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী—রাণী সেই জমি কলেজকে দান

করেন।

কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ডাউনিং সাহেব। পুরানো ইম্পিরিয়াল গেজেটের পাতায় পাওয়া যায় শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতির বিবরণ। সেই বিবরণের কিছু অংশ হ'ল—

........The course in the Apprentice Dept. lasts for five years, but those leaving after three and a half years are entitled to third grade overseers' certificates. The Artisan class is chiefly for the benefit of sons of mistris (carpenters) and a stipend of Rs 1/- to Rs. 3/- a month is given who turnout satisfactory work. The Agricultural class is to be transfered to the Imperial Institution at Pusa. The total number of pupils under instraction in 1903-4 was 386 and the expenditure amounted to Rs. 1,50,000/-.

যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত এটিই ছিল রাজ্যের একমাত্র উচ্চমানের কারিগরী শিক্ষালয়। ১৯০০ খৃঃ-এ অধ্যাপক দ্বিজপদ দত্তের [উল্লাসকর দত্তের পিতা] তত্ত্বাবধানে একটি কৃষি বিভাগ খোলা হয় কিন্তু অল্প দিন পরেই সেটা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৩-৪ খৃঃ-এ এখানের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৮৬ জন। এখন বার্ষিক

গড়ে ১৭৫৭ জন ছাত্র এবং ১৯ জন ছাত্রী এখানে শিক্ষা গ্রহণ করে।

১৯৩৭ খৃঃ-এ সুধাংশু কুমার বসু মাজুতে Rural Engineering College প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজটিতে প্রাদেশিক সরকারের সাহায্যে পেতল ঢালাই শেখানোর ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও অল্পদিন পরেই কলেজটি বন্ধ হয়ে যায়। সাঁত্রাগাছিতে ১৯৪৫-এর ১০ই জুন হাওড়া হোমস্ নামে একটি কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯.৮.১৯৫৯ রাজ্য সরকার এটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির একটি মহিলা বিভাগও আছে। দালাল পুকুরে হাওড়া পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের শুরু ১৯৬৭-র শেষদিকে। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রাঙ্গণে শিল্প মন্দির, শিল্পায়তন এবং শিল্প বিদ্যালয় নামে ৩টি কারিগরী বিদ্যালয় ও বেলুড় বিদ্যামন্দির অবস্থিত। আইজ্যাক বেলিলিয়াস সাহেবের আনুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হাওড়া কলেজের বর্তমান নরসিংহ দত্ত কলেজ; প্রথম প্রিন্সিপ্যাল মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। জেলার মহিলাদের উচ্চশিক্ষার প্রথম কলেজ হাওড়া গার্লস কলেজ। আগষ্ট ১৯৪৬-এ শুধুমাত্র প্রাতঃকালীন কলেজ হিসাবে এটির শুরু ১৪৮, শিবপুর রোডে। এ কলেজটি ভবানী বালিকা বিদ্যালয় ভবনে স্থানান্তরিত হয়। ৪৯-৫০ খৃঃ-এ ৫/৩, মহাত্মা গান্ধী রোডে সেন্ট টমাস চার্চ্চ স্কুলের বাড়ীটি ভাড়া নিয়ে কলেজটি নূতনভাবে পরিচালিত হবার পর '৬৩ খৃঃ খরিদসূত্রে বাড়ীটি কলেজ কর্তৃপক্ষের মালিকানায়

আসে। কলেজটির উন্নতি বিধানে পান্নালাল মুখো:, সরোজ রঞ্জন বন্দ্যো:, বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির উদ্যম প্রশংসনীয়। কলেজটির বর্ত্তমান নাম বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ। জি. টি. রোড, শিবপুরে আছে দীনবন্ধু কলেজ। বর্ত্তমানে হাওড়ার কলেজে পাঠরত ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫২৭ এবং ২৫৫২ জন। হাওড়া শহরের বাহিরের কলেজগুলি হ'ল আমতা'র রামসদয় কলেজ ('৪৬), প্রভু জগবন্ধু কলেজ, আন্দুল ('৪৬), লালবাবা কলেজ' বালি ('৫৪), পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয় ('৬৬) এবং শোভারাণী মেমোরিয়াল গার্লস কলেজ, জগৎবল্লভপুর ('৭৪)। হাওড়ায় একটিও সরকারী কলেজ নাই। জেলায় একটি মাত্র আবাসিক জুনিয়ার ট্রেনিং কলেজ আছে জগৎবল্লভপুরে। শিক্ষক শিক্ষণকেন্দ্র আছে হাওড়া গার্লস কলেজ এবং উলুবেড়িয়া কলেজ (সহ: শিক্ষা), ১৯৭৩ খৃঃ ২৬শে ডিসেম্বর ইনষ্টিটিউট অফ বায়ো কেমিষ্ট্রি এণ্ড ইণ্ডিয়াণ ড্রাগস্-এর পক্ষ থেকে হাওড়ায় একটি নতুন চিকিৎসা বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্মবার্তা ঘোষনা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বি. আই. এম এস. এই নামে দু-বছরের ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্ত্তিত হয়েছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সাথে আধুনিক ভেষজ বিজ্ঞানের সমন্বয়ে দেশীয় গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী করে কুষ্ঠ প্রভৃতি বহুবিধ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে ইণ্ডিয়ান ড্রাগস মেডিকেল কলেজ এণ্ড হসপিটালে। যেটির অধ্যক্ষ ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়—১০/১, জি. টি. রোড (দক্ষিণ), হাওড়া-৭১১১০১।

থারো-মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া পরিচালিত উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা—১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষ মিলে প্রায় তিনশ।

শিক্ষার্থী—শিক্ষার্থিনীরা সকলেই বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী নন। কেউ শিক্ষক, কেউ চাকুরে, কেউবা অন্য কোথায় নিযুক্ত, সন্ধ্যায় এসে ক্লাস করেন। পাঠ্য সূচীর মধ্যে আছে শরীর বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান, স্ত্রীরোগ বিজ্ঞান, রোগ নির্ণেয় বিদ্যা চোখ-নাক-কান বিষয়ক বিজ্ঞান, শল্য বিজ্ঞান ও মানসিক রোগের চিকিৎসা। দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত যে ওষুধ এখানে ব্যবহৃত হয় সেগুলির জন এ্যালো-প্যাথিরা হোমিওপ্যাথি ওষুধের মতন বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় না। জেলার সর্বপ্রথম বি. টি. কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় '৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন মঠ ও মিশন প্রাঙ্গনে। হাওড়ার ময়দানের নিকটবর্ত্তী মহেশচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক কলেজ এণ্ড হস্‌পিটালের প্রতিষ্ঠায় যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নেন তাঁদের মধ্যে দু-জন হলেন ডঃ ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী এবং অধ্যক্ষ ডঃ নিতাই চক্রবর্ত্তী।

১৯৪২ সালের ভ্যাগর্যান্টস্ এ্যাক্ট পাশ হয় এবং ঐ বছরের অক্টোবর মাসে শিবপুর এলাকায় আন্দুল রোডে ক্যাজুয়াল এ্যাডাল্ট মেল ভ্যাগর্যান্টস্ হোম (Casual adult male vasgants Home) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮ বছরের বেশী ভবঘুরে ছেলেদের এখানে ছুতোর, কামার, তাঁত, সেলুন, বাগান প্রভৃতির কাজ শেখানো

হয়। বর্ধমান শহরের গোপালবাগে অনুরূপ যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল সেটি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে '৬০ সালে একত্রিত হয়।

হাওড়ার পাঠাগার

শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে হাওড়ার পাঠাগার প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীতেই। যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার ও রাখাল রাজ রায় সম্পাদিত ১৩২২ সালের সাহিত্য পত্রিকাতে হাওড়ার কয়েকটি পাঠাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই আর পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ নাই, যদিও অনেক-গুলি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। নামগুলি হল—

অক্ষয় দত্ত স্মৃতি সমিতি ও শান্তি কুটির লাইব্রেরী—বালী, সম্পাদক—রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। ইউনিয়ন লাইব্রেরী—মুগকল্যাণ। উলুবেরিয়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল লাইব্রেরী—সম্পাদক—উমেশ শীল। ডিউক লাইব্রেরী [একদা বাংলার ছোট লাট উইলিয়াম ডিউক এটির উদ্বোধক]—চার্চ্চ রোড, হাওড়া—সম্পাদক—দুর্গাদাস লাহিড়ী। পঞ্চানন লাইব্রেরী—খুরুট পঞ্চানন তলা — সম্পাদক — হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত হয় মুগকল্যাণ ইনষ্টিটিউট লাইব্রেরী —১৮৮৫, স্পোর্টিং ক্লাব লাইব্রেরী (হাওড়া)—১৮৮৯ এবং ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী, হাওড়া—১৮৯৬।

হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অগ্রজ হ'ল হাওড়া জেলা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন। '৫২ সালে ৪/৫ মহাত্মা গান্ধী রোডে এসোসিয়েশনের সূত্রপাত। প্রতিষ্ঠাতাদের পুরোধা ছিলেন পরলোকগত শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য।

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী—১৭৮ শিবপুর রোড, হাওড়া-২

শিবপুর নিবাসী কাঙ্গালীচরণ হালদা মশাই নিজের বাড়ীতে শখ করে যে 'নিউজ রুম'টির সূচনা করেন পরবর্ত্তীকালে তাই রাজনারায়ণ ঘাট রোড ও জি. টি. রোড-এর সংযোগ স্থলে শিবপুর রিডিং রুম নাম নিয়ে নবজন্ম গ্রহণ করে। ১৮৭৮ খৃঃ-এর মার্চমাসে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর এটির নূতন নামকরণ হয় শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী। ১৮৯৯ খৃঃ-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২১৬, জি. টি. রোডে পাঠাগারের নিজস্ব বাড়ী হয়। সে সময় পাঠাগারে নিয়মিত বার্ষিক ১৬ টাকা করে আর্থিক সাহায্যদানকারীদের মধ্যে ছিলেন—মেসার্স কিং এণ্ড কোং, মেসার্স আর নর্থ সন এণ্ড কোং, মিঃ জন ষ্টল এবং বাবু কালীকৃষ্ণ পরামানিক। যাদের প্রচেষ্টায় পাঠাগারটির ক্রমোন্নতি ঘটেছে তাঁদের কয়েকজন হলেন বসন্ত কুমার পাল, বিনোদবিহারী হালদার, হরিদাস মিত্র, ননীভূষণ সিংহ প্রভৃতি। বসন্তকুমার পাল মশাই তাঁর "স্মৃতির অর্ঘ্য" গ্রন্থে লিখেছেন—"লাইব্রেরী হ'লে যে থিয়েটার মঞ্চ আছে তাহা তাঁহারি (হরিদাস মিত্রের) দান।"

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর কিশোর বিভাগের প্রতিষ্ঠা '২৮-২৯ সালে। এই বিভাগে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিনা চাঁদায় বই পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী ও হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনী।

ডিউক পাবলিক লাইব্রেরীর পুরোনাম ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী ও হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনী। ৪-চার্চ রোডে পাঠাগারের নিজস্ব ভবন এখন শ্রীহীন হ'লেও এক সময় বহু উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-বাসর এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বালী সাধারণ গ্রন্থাগার—১৭৬ জি টি রোড, বালী, হাওড়া

বালী গোস্বামী পাড়ায় ১৮৮৫ খৃঃ-এ প্রতিষ্ঠিত বয়েজ এসোসিয়েশন গ্রন্থাগারের নাম ১৮৮৯ খৃঃ-এ হয় ষ্টুডেন্টস এসো-সিয়েশন। ১৯০০-০১ খৃঃ-এ ডিংসাই পাড়ার ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন লাইব্রেরী এবং গোস্বামী পাড়ার বয়েজ রিডিংরুম মিলিত হয়ে ফ্রেণ্ডস রিডিংরুম নাম গ্রহণ করে। ১৯০৪ খৃঃ-এ প্রতিষ্ঠা-টি ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন-এর সহিত যুক্ত হয়ে ষ্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এণ্ড ফ্রেণ্ডস রিডিংরুম নামে পরিচিত হতে থাকে। ১৯১৩ খৃঃ-এ বালী মিউনিসিপ্যালিটির আনুকুল্যে পুণর্গঠিত হয়ে পাঠাগারটি বালী পাবলিক লাইব্রেরী নামে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৩৩ খৃঃ-এর ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ হয় বালী সাধারণ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ নিঃশুল্ক। পাঠা-

গারের সংগৃহীত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা প্রায় দু'শটি, পুস্তক সংখ্যা দু'হাজারেরও বেশী।

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার—৩, লালাবাবু সায়ার রোড, পোঃ বেলুড় মঠ

প্রতিষ্ঠা ১৮৯৫ খৃঃ-এ। বালী পৌরসভার প্রথম অনুদান পাওয়া যায় ১৯০৫ খৃঃ-এ। নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২৮ খৃঃ-এ রসরাজ অমৃতলাল বসুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় একটি বিশেষ তহবিল খোলা হয়। বালী পৌরসভা প্রদত্ত তিন কাঠা তের ছটাক জমির উপর নির্মিত নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন হয় ১৯৪৬ খৃঃ-এ। বর্ত্তমান সম্পাদক—শ্রীকৃষ্ণ হাজরা। পাঠাগারের কিশোর বিভাগে কোন চাঁদা নাই। ফনীভূষণ বিদ্যাবিনোদ রচিত কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রন্থাগারে আছে।

ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী—৪২/৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন

হাওড়ার দ্বিতীয় প্রাচীন গ্রন্থাগার। প্রতিষ্ঠা—১৮৮৪ খৃঃ-এ। নিঃ-শুল্ক পাঠকক্ষ ও শিশু বিভাগ আছে। কলেজের ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ও হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। পাঠাগার কর্ত্তৃক নার্শারী, কিণ্ডার গার্টেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয়।

অন্যান্য পাঠাগার

১৯১৭ খৃঃ-এ চালু হয় গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের

পাঠাগার বিভাগ। হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা '৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। হাওড়ায় স্পনসর্ড এবং পল্লী পাঠাগারের সংখ্যাও অনেক।

প্রদর্শ শালা

জেলায় দুটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শ শালা আছে। প্রথম—আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, পরিচালক আনন্দ নিকেতন সোসাইটি, নবাসন, পোঃ-বাগনান। প্রতিষ্ঠানের ষান্মাসিক মুখপত্রের নাম আনন্দম্। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ঘোড়াঘাটা বা বাগনান ষ্টেশনে নেমে যেতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু মন্দির ও মসজিদের বিবরণ এই সংগ্রহশালায় আছে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারী অনুদান পুষ্ট। দ্বিতীয়—শরৎ স্মৃতি সংগ্রহ শালা, পাণিত্রাস, বাগনান। প্রতিষ্ঠা—'৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। প্রদর্শ শালাটি শরৎ স্মৃতি মন্দির পাঠাগারের একাংশে অবস্থিত।

ছাপাখানা ও তালপাতায় ছাপানো পুঁথি

হাওড়ার সবচেয়ে পুরানো ছাপাখানা এনসাইক্লোপিডিয়া প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশপস্ [বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং] কলেজ প্রাঙ্গণে।

জয়দেব-এর নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কল্যাণপুরের পশুপতি প্রেসের আনুমানিক প্রতিষ্ঠা বৎসর ১৩০৮ সাল। প্রেসটি ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত এই গ্রামে চালু ছিল। হরিপদবাবু বিদ্যাসাগর

মশাইয়ের ছাপাখানাটি কিনে প্রথমে কলকাতায় পরে স্বগ্রাম বাগনান থানার কল্যাণপুরে পশুপতি প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা ছাপাখানার ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হ'য়ে আছেন তালপাতার পুঁথি ছাপিয়ে। ২৩০৯ বঙ্গাব্দের শেষার্ধে তিনি প্রথম প্রকাশ করেন তালপাতায় ছাপানো ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ শ্রীশ্রীচণ্ডী। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়—

শ্রীশ্রীচণ্ডী

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়েন সম্পাদিতা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়—

হাওড়া জেলান্তর্গত কল্যাণপুর পোষ্টাধীন শাস্ত্র প্রকাশ কার্যা-লয়াৎ শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্। মূল্যমেকারৌপ্যকম্।

বিপুল চাহিদা হেতু হরিপদবাবুর জীবিতকালেই চণ্ডী ছাপা হয়েছিল প্রায় চল্লিশ হাজার কপি।

এই প্রেসে ছাপা তালপাতার অন্যান্য পুঁথিগুলি হ'ল—গীতা, কালীপূজা পদ্ধতি, জগদ্ধাত্রী পূজা, ভবদেব, দুর্গাপূজা পদ্ধতি—কালিকা, দেবীপুরাণ ও বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত, ব্রতমালা, নাগরী অক্ষরে চণ্ডী, রুদ্রচণ্ডী, সামবেদীয় সন্ধ্যা, যজুর্বেদীয় সন্ধ্যা, ঋকবেদীয় সন্ধ্যা, দোল-রাসযাত্রা, পঞ্চদেবী [লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা ও গঙ্গা] পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি।

হাওড়ার পাঠাগার সমূহের নাম ও ঠিকানা

অধ্যয়ন সম্মিলনী, ৫৮৬, সার্কুলার রোড। (১৯২৫)

অতুল পাঠাগার, পুরাশ কানপুর। (১৯৪২)

আনন্দ সাধারণ পাঠাগার, নবাসণ, বাগনান।

আমতা পাবলিক লাইব্রেরী। (১৯০৭)

আজাদ হিন্দ লাইব্রেরী, ঘুশুড়ী। (১৯৬৬)

উদীয়মান পাঠাগার, বেনাপুর চন্দনপাড়া, পাণিত্রাস।

উলুবেড়িয়া আনন্দম্ পাঠাগার, উলুবেড়িয়া।

উদয়নারায়ণপুর তরুণ সংঘ পল্লী পাঠাগার। (১৯৪৪)

উৎকল যুবক সংঘ লাইব্রেরী, ৯, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়। (১৯৪৪)

ওয়াদিপুর জনশিক্ষা পাঠাগার, ওয়াদিপুর।

কেন্দুয়া মহাকালী গ্রন্থাগার, কেন্দুয়া।

কানপুর সেবা সঙ্ঘ, কানপুর।

কুলগাছিয়া আদর্শ সংঘ গ্রন্থাগার, মহিষরেখা।

খুরুট বাণী সংঘ, ৩০৫ নেতাজী সুভাষ রোড। (১৯৩২)

গড়ভবানীপুর আর, পি, ই, এন্ড বয়েজ ইউনিয়ন, চিত্রসেনপুর। (১৯৩৯)

গোয়ালদহ জ্ঞানমন্দির, গুজারপুর।

গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ গন্থাগার, পাঁচলা। (১৯০৭)

গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ পাঠাগার বিভাগ।

ঘুশুড়ী সাধারণ গ্রন্থাগার, ৫২ নস্করপাড়া রোড। (১৯৪৮)
চাঁদভাগ শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগার, মুগকল্যাণ।
জাতীয় পাঠাগার, ৮৭/৩ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়। (১৯৪৮)
জয়নগর দেশবন্ধু পাঠাগার, জয়নগর। (১৯৪৫)
জগদীশপুর সাধারণ পাঠাগার, জগদীশপুর।
জয়পুর আর্য সমিতি লাইব্রেরী, জয়পুর। ১৮৯৫)
জুজারসা শক্তি পাঠাগার, জুজারসা। (১৯৪৬)
ঝিখিরা কেদারনাথ সাধারণ পাঠাগার, ঝিখিরা। (১৯১৯)
ডোমজুড় পাবলিক লাইব্রেরী, ডোমজুড়।
ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী, চার্চ রোড।
তাজমহল লাইব্রেরী, পোঃ রামেশ্বরনগর। (১৯৫২)
তরুণ সংঘ পাঠাগার, বাকসাড়া। (১৯২৪)
তাজপুর বীনাপানি পাঠাগার, তাজপুর। (১৯৫১)
দফরপুর রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, দফরপুর।
দেউলপুর পাবলিক পাবলিক লাইব্রেরী, দেউলপুর। (১৯২০)
দীপশিখা লাইব্রেরী, কাষ্ঠশাকর, খোসালপুর।
নবযুগ গ্রন্থাগার, ঘুশুড়ী। (১৯৫৩)
নিশ্চিন্দা জনকল্যাণ সমিতি, বালী। (১৯৫২)
নতুন সমাজ পাঠাগার ও সেবাকেন্দ্র, মৌরেশিয়া ধূলানীমলা (১৯৫৩)
নারীট নবকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার।
নয়াচক শান্তি সাধারণ পাঠাগার।

পল্লীশ্রী সাধারণ পাঠাগার, হীরাপুর।

পাতিহাল সাহাপাড়া আশুতোষ পাবলিক লাইব্রেরী। (১৯২২)

পিপল্‌স্ লাইব্রেরী, রঘুদেবপুর। (১৯৬৬)

প্রগতি সংঘ লাইব্রেরী, ভট্টনগর। (১৯৫০)

ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন লাইব্রেরী, ১৪৬ নেতাজী সুভাষ রোড। (১৮৯৮)

বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার, ৩, লালবাজার সায়ার রোড, বেলুড়।

বালী সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৭৬ জি, টি, রোড, বালী।

ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী, ৪২/৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন।

বাগাণ্ডা সাধারণ পাঠাগার।

বাকসাড়া তরুণ সংঘ লাইব্রেরী

বাঙ্গালপুর রবীন্দ্র পাঠাগার, বাঙ্গালপুর।

বাণীবন কল্যাণব্রত সংঘ, বৃন্দাবনপুর।

বাণী মন্দির, সাঁত্রাগাছি।

বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার, ৪ পাঁচকড়ি মোহান্ত লেন, সালকিয়া ১৯৩৪

বড়গাছিয়া ইউনিয়ন আনন্দ পাঠাগার। (১৯৫১)

বিরামপুর জয়ন্তী পাঠাগার, কল্যাণপুর, বাগনান। (১৯৫২)

ব্রতী সংঘ গ্রন্থাগার, ঘোষপাড়া, বালী। (১৯৪৪)

বাণী পাঠাগার, উলা, হীরাপুর। (১৯৫২)

বঙ্কিম পাঠাগার, কল্যাণপুর। (১৯৪৭)

বালী শিশু সমিতি, ৩১/১, গোস্বামী পাড়া রোড, বালী। (১৯২২)

ভারত পাঠাগার, ২৭ আনন্দ প্রসাদ ব্যানার্জী লেন। (১৯৪৭)

ভাস্কুর আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগার, ভাস্কুর, বলুহাটি। (১৯৪২)

মাধব মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, ১৮ সালকিয়া স্কুল রোড। (১৯১৭)

মাধবপুর সাধারণ পাঠাগার, বেলাড়ী।

মহাত্মা পাঠাগার, খলিসানী।

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী। (১৯০২)

মাহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী, আন্দুল মৌড়ী। (১৮৮৫)

মাকড়দহ সারস্বত লাইব্রেরী [নবপর্য্যায়]। (১৯১৯)

রবীন্দ্র পাঠাগার, গ্রাঃ ও পোঃ পারবাকসী, বাকসী। (১৯৫১)

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, উলুবেড়িয়া। (১৯১৯)

রাজীবপুর অগ্রণী পাঠাগার, উত্তর দুর্গাপুর। (১৯৫০)

রামনগর বীণাপাণি পাঠাগার। (১৯২৮)

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির, পেঁড়ো। (১৩৩৮)

রসপুর পিপলস্ লাইব্রেরী। (১৮৮৩)

রবীন্দ্র পাঠাগার, রামচন্দ্রপুর আমুলিয়া। (১৯৬১)

রবীন্দ্র বিদ্যামন্দির, ৫৩ বারুইপাড়া লেন, হাওড়া-৪। (১৯৪৭)

রঘুনাথপুর সাধারণ পাঠাগার, অভয়নগর। (১৯৩১)

রামকৃষ্ণপুর সংসদ লাইব্রেরী, ১১৯ রামকৃষ্ণপুর লেন। (১৯০০)

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ১১৮ শিবপুর রোড, হাওড়া-২।

শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগার, পাণিত্রাস। (১৯৬৫)

শিবপ্রভা লাইব্রেরী, গ্রাঃ ও পোঃ বেগড়ী, থানা ডোমজুড়। (১৯৫০)

শ্যামপুর প্রিয়নাথ সাহিত্য মন্দির।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার, ডিঙ্গাখোলা। (১৯৫৪)

শহীদ স্মৃতি সংঘ পাঠাগার, গ্রাঃ থানা মাকুয়া, বি, গার্ডেন।

সুহৃদ পাঠাগার, কোর্টগ্রস্‌টার, উলুবেড়িয়া।

সিদ্ধেশ্বরী বিদ্যোৎসাহী পাঠাগার, সিদ্ধেস্বরী।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবেলিয়া পাতিহাল। (১৯৪৪)

সাধারণ পাঠাগার, ইসলামপুর। (১৯৬৭)

সামতা শরৎচন্দ্র লাইব্রেরী, সামতা, বাগনান। (১৯৪৪)

সাহড়া সাধারণ পাঠাগার, সাহড়া, মুগকল্যাণ। (১৯৬৭)

সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী, ২০/২ রামচরণ শেঠ রোড (১৯১৬)

ষ্টুডেন্টস্‌ লাইব্রেরী, ৩৫৪ জি, টি, রোড [নর্থ]। (১৯৩২)

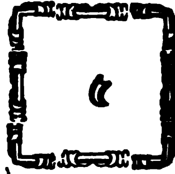
হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জি, টি, রোড।

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ পাঠাগার, ২৩, শিবপুর রোড, হাওড়া।

—: :—



ভাষা ও সাহিত্য



হাওড়ার ভাষা সম্পদ

কলকাতার ভাষার সঙ্গে হাওড়া শহরের কথ্য ও লিখিত ভাষার কোন প্রভেদ নাই। জেলার গ্রামাঞ্চলে স্থান বিশেষে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়।

শহর সহ হাওড়া জেলার প্রধান ভাষা বাংলা। শিল্পাঞ্চলবাসী বাঙালীদের দ্বিতীয় ভাষা হিন্দী। বাংলা অবাঙালীদের দ্বিতীয় ভাষা। সীমাবদ্ধ স্থানে উর্দুর প্রচলন আছে।

হাওড়া জেলার ভাষাতাত্ত্বিক রূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ দত্তের মন্তব্য—হাওড়া জেলার ভাষা বাংলা ভাষার প্রধান পাঁচটি উপভাষার মধ্যে একটি রাঢ়ীর অন্তর্ভুক্ত মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের একটি উপভাষা। অঞ্চলভেদে উচ্চারণভেদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন —"শ্যামপুর, বাগনান, আমতা, উদয়নারায়ণপুর ও পাঁচলার অঞ্চল বিশেষে সব স্বরধ্বনি-ই অল্পবিস্তর নাসিক্যযুক্ত। স্বরধ্বনির এই নাসিক্যতা নাসিক্যহীন স্বরধ্বনি থেকে অর্থের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য

আনে না। উদয়নারায়নপুর, আমতা ও রূপনারায়ণ নদ তীরবর্ত্তী বাগনানের কয়েকটি গ্রাম ব্যতীত অন্য সমস্ত অঞ্চলে অপিনিহিতি অথবা বিপর্যয়/বিপর্যাস-এর পর সাধারণ স্বরধ্বনি দেখা যায়। কিন্তু উপরোল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে সাধারণ স্বরধ্বনি অপেক্ষা বিপর্যয় অথবা য়-শ্রুতি সন্নিবেশিত হ'তে দেখা যায়।"

সময় বিশেষে বাংলা ভাষায় বৈদেশিক শব্দের যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে হাওড়ার ভাষাও সেই নিয়মের অধীন। বৈদেশিক শব্দাবলীর এই অনুপ্রবেশ কখনও বিদেশীদের স্থায়ীভাবে হাওড়ায় বসবাস এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে, কখনও বা বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাব বিনিময়ের সুযোগে ঘটেছে।

মুসলমান বিজয়ের পর স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই ধর্মান্তরিত হন। নাথ সম্প্রদায়ের বহুব্যক্তি মুসলমান হয়েও পূর্ব ধর্মের আচার-আচরণ ভুলতে না পেরে যোগীপীর আখ্যা লাভ করেন। হিন্দু যোগী এবং মুসলমান পীরের সমন্বয়ে যোগীপীর শব্দটির উদ্ভব। এঁদের মন্ত্রতন্ত্রে উর্দু-ফারসীর সঙ্গে বাংলা ভাষার মিশ্রণটি সহজেই চোখে পড়ে। ব্যবহারিক জীবনেও এই শব্দ-গুলির মূল এখন বেশ দৃঢ়। হাওড়ার মুসলমান সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষায় তাঁরা, মুঁই, মুঁর‍্যা, মুঁকে/মুকি, মুঁদিকে প্রভৃতি শব্দগুলি পাওয়া যায়। উলুবেড়িয়া, জগৎবল্লভপুর, সাঁকরাইল,

পাঁচলা প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরণের শব্দ প্রচলিত। বহু সময় প্রতিবেশী হিন্দুরা এই ধরণের শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

ইউরোপীয় জাতি সমূহের মধ্যে জলপথে বাংলায় প্রথম আসে পর্তুগীজরা। সপ্তগ্রামের সহিত বাণিজ্যরত পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের বাংলার মধ্যে হাওড়াতেই প্রথম পদার্পণ ঘটে। সঙ্গত কারণেই ['বাইমেরী' অপভ্রংশে] 'মাইরি' বলছি বাংলা ভাষায় পর্তুগীজ শব্দের অনুপ্রবেশ, যেমন—কেদারা, জানালা, গরাদ এবং বিস্তি—খেলাটি ব্যাতড় প্রভৃতি হাওড়ার পর্তুগীজ বাণিজ্য ঘাটি-গুলি থেকেই শুরু হয়।

কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ

হাওড়ার অঞ্চল বিশেষে এমন কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় অন্যত্র যেগুলির ব্যবহার বিরল। যেমন ধানের গাদা বা স্তূপকে বলা হয় ধানের কাঁড়ি। মুসোটি করা মানে হ'ল পাঁচীলের উপর দিকের দেওয়ালের পাটি শেষ করা। শ্যামপুর, বাগনান অঞ্চলে ঝিনুককে বলে চিচুন [হুগলী জেলার পোলবা থানায় বলে ব্যাগারি; পাণ্ডুয়ায় সিঁতুই, বর্ধমানের জামোরিয়া অঞ্চলে সিঁতুক] এবং হাঁড়িচাচা, উলুবেড়িয়া থানার ধূলাসিমলা গ্রামে হ্যানছানা। এইরকম আরও কয়েকটি শব্দ—

শামুক = ঝামুক

নদীর বাঁধ = নদীর পোল [গাজনকোল-শ্যামপুর ১নং ব্লক]

উঠান = বাকুল
ছুলি = ছুলুতি
কনুই = কোস্তি [গ্রাম—মতিমালা]
শালিখ পাখি = সরো বা সারো পাখি [বাগনান, আমতা এবং শ্যামপুর থানা]



সংবাদ-পত্র—সাময়িক পত্র

অন্ধকার দূর করার জন্তে প্রদীপ জ্বালানো হ'লেও সবচেয়ে বেশী অন্ধকার থাকে প্রদীপের একেবারে কাছের অংশটিতে। কলকাতার পাশে হাওড়ার অবস্থান একই অবস্থার সৃষ্টি করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো যে সময় কলকাতার পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হ'তে লাগল সে সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত কলকাতার সবচেয়ে কাছের শহর হাওড়া থেকে একটিও প্রথম শ্রেণীর সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হ'ল না। উচ্চ কোটির কোন সাহিত্যপত্র দীর্ঘজীবন লাভ করল না। হ'বে কোথা থেকে! পাশ্চাত্য শিক্ষার ঝলকানি কলকাতা থেকে বেরুবামাত্র হাওড়া বাসীদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। সেই আলোয় হাওড়া তার মনপ্রাণ সমর্পণ করল কলকাতাকে। উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে শিক্ষিত ও উদ্যোগী হাওড়াবাসীরা নদী পেরিয়ে রাজধানীতে আসর জমাতে লাগলেন। মহানগরীও তাদের

সাদরে গ্রহণ করল। আজ যেমন ইউরোপ—আমেরিকা, ভারতবর্ষ সহ বহু দেশের প্রতিভাগুলিকে সুযোগ ও অর্থের অক্টোপাশে বন্দী করে ফেলেছে, ব্রিটিশ আমল থেকে হাওড়ার "মাথা"-গুলিও তেমনি কলকাতার টাঁকশালে আটকা পড়তে শুরু করেছে। অবশ্য এ-ধরণের প্রতিকুল অবস্থাতেও সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশে হাওড়ার অবদান এবং ঐতিহ্য অকিঞ্চিৎকর নয়। এই ঐতিহ্যের দু'টি ধারা— ১) হাওড়াবাসীদের অর্থানুকুল্যে ও পরিচালনা বা সম্পাদনায় হাওড়া থেকেই প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা। ২) হাওড়া-বাসীদের অর্থানুকুল্যে বা সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা।

হাওড়ার প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্রের নাম "জনবুল"। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে ম্যাকেঞ্জীস্ ডকের মালিক ম্যাকেঞ্জী সাহেব ইংরাজী ভাষায় এটি প্রকাশ করতেন। পত্রিকাটি ছিল স্বল্পায়ু প্রসঙ্গক্রমে বলি। কলকাতা থেকে প্রকাশিত একই নামের পত্রিকার সাথে এটির কোন সংশ্রব ছিল না। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর প্রকাশিত হয় কলকাতা শহরের প্রথম সংবাদপত্র ক্যালকাটা-জার্ণাল। তারপর কলকাতা থেকে অনেক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীর সব দেশে পৌছে গেছে কিন্তু হাওড়া থেকে একটিও প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকা আজও প্রকাশিত হয়নি। হাওড়া'র প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র "বিবরণ"—সান্ধ্য-দৈনিক। সম্পাদক : শশধর রায়। ৩৩/৪, দীনু

লেন, হাওড়া-১ থেকে ১২.১২.১৯৭৩-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। দাম প্রথম ছিল দশ পয়সা, পরে হয়েছে কুড়ি পয়সা।

হাওড়া বাসীদের দ্বারা পত্রিকা প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রথম নাম আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিকের। বাংলা সন ১২৩৯ সালের ১০ই শ্রাবণ (ইং ২৪.৭.১৮৩২) কলকাতায় সংবাদ-রত্নাবলী নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সাপ্তাহিকটির জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল মাত্র এক বছর তিন দিন। ১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখ এ বিষয়ে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে লেখা হয়। "বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকুল্যে মেছুয়া বাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে সংবাদ-রত্নাবলী আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছুমাত্র রচনা শক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। সংবাদ-রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্মে বিরত হইলে ভূম্যধিকারী সভার পূর্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্তহয়েন।" হাওড়াবাসীর উদ্যোগে সাময়িকপত্র প্রকাশের এটিই প্রথম ঘটনা। নব পর্যায়ে ব্রজমোহন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় পত্রটি আবার ১২৫২ সালের ১লা অগ্রাণ [ইং ১৫।১১।১৮৪৫] আত্মপ্রকাশ করে।

সাময়িকপত্র প্রকাশ করা ব্যতীত জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক একটি মামলায় সম্বাদ-ভাস্কর সম্পাদক গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য্যের জামীনদার

ছিলেন। ১৮৩৯ খৃঃ মার্চ থেকে প্রকাশিত সম্বাদ-ভাস্কর নামক সাপ্তাহিক পত্রটি কলকাতার সিমলা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হত এবং পত্রিকাটিতে আন্দুল রাজের আনুকূল্যের নিদর্শন স্বরূপ আন্দুলাব্দের উল্লেখ থাকত। পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আন্দুলের শ্রীনাথ মল্লিকের নাম পাওয়া যায়। কোন ঘটনায় অসন্তুষ্ট হ'য়ে আন্দুলরাজ রাজনারায়ণ সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে কলকাতার রাজপথ থেকে লোক মারফৎ অপহরণ করলেন। শ্রীনাথ রায়কে অপহরণ ও নির্যাতন করার অপরাধে কিছুদিন হাজতবাসের পর সুপ্রীম কোর্টের বিচারে রাজার হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়।

হাওড়ার মাটি থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্রটির নাম সংবাদ-মুক্তাবলী, শিবপুর থেকে পত্রিকাটি সম্ভবতঃ ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের কোনদিন থেকে প্রকাশিত হ'তে শুরু করে। পত্রিকাটি সম্পর্কে ১২৫৫ সালের ২৯শে চৈত্র [ইং ১০.৪.১৮৪৮] সম্বাদ-ভাস্করে লেখা হয়—

"সংবাদ মুক্তাবলী :—কয়েকমাস গত হইল কলিকাতার গঙ্গার পশ্চিমপারে শিবপুর গ্রামে সংবাদ মুক্তাবলী নামে সাপ্তাহিক এক সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে। আমরা এ পর্যন্ত উক্ত সমাচার পত্রের বিষয়ে কিছু লিখি নাই, কিন্তু দেখিলাম যুব সম্পাদকেরা উত্তমাভিপ্রায়ে কয়েকমাস ঐ পত্র সম্পাদন করিলেন অতএব সাধারণকে অনুরোধ করি উক্ত পত্র সম্পাদকদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি জন্য সহায়তা করেন, কলিকাতা নগরে সমাচার পত্র অনেক

হইয়াছে। পল্লীগ্রামে অধিক হয় নাই……"ইত্যাদি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে—"কালীকান্ত ভট্টাচার্য্য কাগজখানির পরিচালক এবং আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।"

কাগজটির পরমায়ু ছিল এক বছরের মত। ১৮৫৩-তে বালীতে শুভকরী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। শুভকরী সভার প্রচেষ্টায় বালী-গ্রামের প্রথম মাসিক পত্রিকা শুভকরী গঙ্গানন্দ বাচস্পতির সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২'র মে মাসে। পত্রিকাটির আলোচ্য বিষয় ছিল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহিত্য। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে শুরু হয় সংবাদ পরিবেশন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এটির প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস থেকে দ্বারকানাথ দাসের সম্পাদনায় ১, হলওয়েলস্ লেন, মৃজাপুর কলিকাতা থেকে আয়ুর্বেদ পত্রিকা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। পত্রিকাটির সঙ্গে হাওড়ার কিছু সম্পর্ক ছিল এ তথ্য জানা যায় সোমপ্রকাশে প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞাপনটি থেকে—

"সম্প্রতি আয়ুর্বেদ পত্রিকা নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হাবড়ার সিবিল সারজন শ্রীযুক্ত ডাং রবার্ট বার্ড মহোদয়ের সাহায্যে প্রাকৃতযন্ত্রে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মনুষ্যদেহের কিভাব, দেহমধ্যে কিরূপে রোগপ্রবেশ করে, সেই রোগ হইতেই বা কি প্রকারে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তাহার উপায় এবং নানাবিধ বিধান

প্রভৃতির বিবরণ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার মাসিক মূল্য ।।০, অগ্রিম বার্ষিক ৫.০০ এবং মফঃস্বলে মাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৮.০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

হাবড়া জেনারেল হাসপাতাল শ্রীদ্বারকানাথ দাস সাং—বংশবাটি।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উলুবেড়িয়াতে আত্মপ্রকাশ করে রাজনৈতিক পাক্ষিক "গ্রামবাসী"। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে পরিণত হয়। ১৮৭৪-এর কোন সময় আত্মপ্রকাশ করে সাপ্তাহিক হাবড়া-হিতকরী। লেখকবর্গের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বেতড় গ্রাম থেকে হাবড়া-হিতকরী নামে প্রকাশিত আর একটি পত্রিকার কথা জানা যায় যার কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রকাশক শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। মূল্য প্রতি সংখ্যা দু'আনা, বার্ষিক ৪.৫০, মফঃস্বলে ৬টাঃ, বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পংক্তি প্রথম দুইবার দু'আনা। সে যুগের কলকাতায় নামকরা সংবাদ-পত্র ছিল বেঙ্গলী। বেঙ্গলী সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ উত্তর-জীবনে বাসা বাঁধেন বেলুড়ে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক হলধর ন্যায়রত্নের পৌত্র কৈলাসচন্দ্র বিদ্যাভূষণ [বাং ২৫.৮. ১২৬৬—২৭.১১.-১৩০৯] সোমপ্রকাশ সম্পাদকের মৃত্যুর পর উক্ত পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়ে নিজেই পত্রিকাটির সম্পাদক ও পরিচালক হ'ন। আন্দুলের

বিহারীলাল সরকার [১৮৫৫—১৯২১ খৃঃ] বঙ্গবাসী পত্রিকা সম্পাদনার জন্য ৩.৬. ১৯১৫ তারিখে রায়সাহেব উপাধি পান।

উনবিংশ শতাব্দীতে আরও কয়েকটি পত্রের কথা জানা যায়। এম. এল. বর্মণের সম্পাদনায় ১২৮৯ সালের ফাল্গুনে [ইং ১৮৮৮] শালকিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বসন্ত সমীরণ। উলুবেড়িয়ার হিতকরী সভা ১২৯৫ সালে [ইং ১৮৮৮] সাপ্তাহিক সমীরণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হাওড়া শহরের খুরুট অঞ্চল থেকে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় ১৩০৪ সালের ভাদ্রে [ইং ১৮৯৭] নবীন লেখা ও সমালোচনা ও সমালোচক নামে একটি মাসিক (?) পত্র প্রকাশিত হয়। ১৩০৫ সালে প্রকাশিত মাসিক কোকিলের সম্পাদক ছিলেন নিশিকান্ত ঘোষ। ১৩০৮-এ অমৃতলাল কুণ্ডু'র সম্পাদনায় শালকিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সর্বজন সুহৃদ। বিংশ শতকের প্রথম দিকের সাময়িক পত্র সমূহের কয়েকটির নাম, ঠিকানা ও সম্পাদকের নাম হ'ল—বিশ্বদূত—সরোজেন্দ্র পালচৌধুরী, ৯৩ কালীকুণ্ডু লেন। তাম্রলিপ্ত পত্রিকা—(১৩২১) যোগেন্দ্র নাথ সিংহ ও রাজেন্দ্রনাথ সোম, ৪৪ তেলকল ঘাট রোড, বার্ষিক মূল্য—১'০০। তিলিবান্ধব—[১৩১৬] বহিদাস পাল ১ বাঁটরা রোড, কদমতলা, বার্ষিক মূল্য—১'০০। নন্দিনী-আশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ, ৪ তেলকল ঘাট রোড। সাহিত্য-সংবাদ—[সচিত্র ১৩১৮] ধীরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী, প্রতি সংখ্যা ।০ বার্ষিক মূল্য—২'০০। কোন সময় দুর্গাদাস লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে

প্রমথ সান্যাল মহাশয়ও উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এছাড়া ছিল হাওড়া দীপিকা, গ্রামের ডাক, শক্তি এবং উর্দ্দু ইবরৎ।

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ৮.৫.১৯২৬ তারিখে সভায় ঠিক হয় হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট প্রকাশ করা হবে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৪৮ খৃঃ স্বল্পকালের জন্য দেবেন ঘোষের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট আত্মপ্রকাশ করে।

কিছুদিনের জন্য আত্মপ্রকাশ করে বিলুপ্ত হয়েছে এধরণের কয়েকটি পত্রিকার নাম :— নব্যভারত (মাসিক) ৯৩, রামকৃষ্ণপুর লেন, তরঙ্গিনী (হিন্দী মাসিক) ৫৫, অরবিন্দ রোড, সালকিয়া, জাগ্রত ভারত (ত্রৈমাসিক ১৯৬২) ৫৬, বাকসারা রোড, সম্পাদক— নিরঞ্জন ঘোষ। রেখা ও বাণী—১৯৬৩।

হাওড়ার প্রথম কিশোর মাসিক "উন্মেষ" ১৩৪৬ সালে ১০৪/৩ জি. টি. রোড (উত্তর) সালকিয়া থেকে শংকর মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল ছয় পয়সা, বার্ষিক এক টাকা দশ আনা। সন ১৩৫৮ সালের শরৎকালীন সংখ্যাই পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা। প্রথম ত্রৈমাসিক কবিতা সংকলন প্রকাশের গৌরবও শংকর মিত্রের। তাঁর সম্পাদনায় ১০৪/৩, জি. টি. রোড থেকে ত্রৈমাসিক কবিতা সংকলন 'উজ্জয়িনী'র প্রথম সংখ্যা

প্রকাশ পায় আশ্বিন ১৩৬০-এ। সংকলনটির প্রতি সংখ্যার দাম ছিল চার আনা।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে সক্রিয় ছিল শিবপুরের Riverside Institute. নদীকূল সমিতির মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হ'ত হস্তলিখিত পত্রিকা Riverside Institute Magazine—যার প্রথম সম্পাদক ছিলেন বসন্তকুমার পাল। সমিতির সাহিত্য অধিবেশনগুলিতে যোগ দিতেন কবি গিরিজা প্রসন্ন বসু, জেলা শাসক মিঃ ডিউক প্রভৃতি।

পল্লীগ্রামের সুখ দুঃখের কথা প্রচারের উদ্দেশ্যে সন ১৩২৯ সালের বাজে শিবপুরবাসী শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের পুত্র সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলকাতা থেকে অক্ষয়কুমার সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পল্লীশ্রী, প্রতি সংখ্যা তিন আনা, বার্ষিক ২ টাকা। শরৎচন্দ্রের মহেশ গল্পটি বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হবার পর লেখকের অনুমতিক্রমে এতে আবার ছাপা হয়। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শেষকথা" কাহিনীটিতে পাওয়া যায় হাওড়ার তৎকালীন বস্তিজীবনের বাস্তব-চিত্র। কল্যাণপুর নিবাসী হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৮-এ প্রতিষ্ঠা করেন এদেশের প্রথম নিয়মিত গোয়েন্দা পত্রিকা "রোমাঞ্চ"। কলকাতার হরিতকী বাগান লেন থেকে রঞ্জিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই মাসিক পত্রিকাটি এখনও প্রকাশিত হচ্ছে।

হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তার কয়েকটির নাম ঠিকানা ও সম্পাদকের নাম হল—

শঙ্খরোল—শাঁখরাইল, মহেঞ্জোদাড়ো (১৯৬৩) ত্রৈমাসিক, ৫৫/৪, নটবর পাল রোড—সমীর রায়। কসল—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া। সিন্ধুসারস—প্রশান্ত দাস। রেখা ও লেখা (বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা) প্রাণগোপাল আচার্য্য, ৭, বেনারস রোড, সালকিয়া। সদ্‌গোপ সমাচার (ত্রৈমাসিক), ৭, ঠাকুরদাস ঘোষ ষ্ট্রীট, বেলুড় মঠ। যুগবাণী (১৯৫৭, সাহিত্য মাসিক) এম. এল. মুখার্জী, ৫/১, হরিকুমার ব্যানার্জী লেন, বালী। অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ৫. ১০. ৬৯ তারিখে প্রকাশিত হয় সংবাদ সাময়িকী "হাওড়া সমাচার"।

জেলার প্রথম কারিগরী বিদ্যাসংক্রান্ত পত্রিকা—বি. ই. কলেজ বার্ষিকী ১৯৪৯-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮তে অজিত কুমার বোসের সম্পাদনায় ২৪/৬, বৃন্দাবন মল্লিক লেন থেকে প্রকাশিত হয় ইংরাজী মাসিক কমার্স সার্ভিস রিপোর্টার। ১৯৬০-এ ইংরাজী বার্ষিক ইঞ্জিনীয়ারিং ইণ্ডাস্ট্রিজ অব হাওড়া—এন. পালের সম্পাদনায় ১৯৮, বেলিলিয়াস রোড থেকে আত্মপ্রকাশ করে। ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়াম কোং-র মুখপত্র ইণ্ডালুমিন বুলেটিন ১৯৬৫-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আশীষ কুমার

ঘোষ। রোটারী ক্লাব অব হাওড়া'র ইংরাজী সাপ্তাহিক বুলেটিন "দি হুইল" প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের সম্পাদনায় ২/৩, লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন থেকে প্রকাশিত হয়। এক সময় প্রফুল্লবাবুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'ত সাপ্তাহিক "বিচার"।

হাওড়া জেলার জীবিত পত্র-পত্রিকাকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বয়জ্যেষ্ঠ হ'ল হাওড়া-বার্তা। ডাঃ শম্ভুচরণ পালের সম্পাদনায় ৩৭৪, জি, টি. রোড, হাওড়া-৬ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির শুরু পাক্ষিক হিসাবে ৯.৮.১৯৫২ তারিখে, দাম ছিল এক আনা, বর্ত্তমানে সাপ্তাহিক, দাম কুড়ি পয়সা। সাহিত্য ও সংবাদ পরিবেশন ব্যতীত কৃষি সংখ্যা সমবায় সংখ্যা, প্রভৃতি বিশেষ সংখ্যাগুলি এবং ছোটদের মহল, মহিলা মজলিস পত্রিকাটির অন্যতম আকর্ষণ। আরও কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকের নাম সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোন কোনটি এখন আর প্রকাশিত হয়না।

১। অভিনব অগ্রণী—দিলীপ বাগ, ৮০, বৈষ্ণবপাড়া লেন, হাওড়া-১

২। অভিমান - স্বপন মাখাল, লালবেলাগড়ি, চিত্রসেনপুর

৩। অকথন—নিতাই দাস, আমতা

৪। অয়ন—শংকর চক্রবর্ত্তী, ৫৮, ঘোষের লেন, বেলুড়

৫। অভ্যুদয়—শিবেন চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল পাল, ১৪৩/৭ শিবপুর রোড [অধুনালুপ্ত]

৬। অনুত্তম শশধর রায়, ৩৩/৪ দীনু লেন [অধুনালুপ্ত মিনি সাহিত্য পত্রিকা]

৭। অনুপম— মৃগাঙ্কশেখর রায় ও সমরেন্দ্র দাস, ২৯/১ উমাচরণ ভট্টাচার্য্য লেন

৮। অর্কিড—সুনীল মিত্র, বাজেশিবপুর

৯। অংশ—রঞ্জিত পাল, মল্লিকচক, খিলা

১০। অরুনোদয়—সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, ৩১ উপেন মিত্র লেন

১১। অক্ষর—চিত্তরঞ্জন মল্লিক, ১৯ শালকিয়া স্কুল রোড

১২। অরিন্দম—মৃগাঙ্ক রায়

১৩। আর্য নারী— শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ৯৪ শান্তিরাম রাস্তা, বালী

১৪। আশাবরী—শিশির কুমার মাইতি, ২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন সাঁত্রাগাছি

১৫। আনন্দম্—তারাপদ সাঁতরা, নবাসনের আনন্দ নিকেতন কীর্ত্তিশালার মুখপত্র। আলোচ্য বিষয়—পুরাতত্ত্ব, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

১৬। আমতা বার্তা—সুজিত রাণা, আমতা

১৭। আলিম্পন—নিমাই দাস, ৫৬/১১ রামমোহন মুখার্জী লেন

১৮। আন্তর্জাতিক ছোট গল্প—সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০/৬ মোহনলাল বাহালরালা রোড, বালী

১৯। আকাশ প্রদীপ

২০। ইঙ্গনা—সুব্রত চক্রবর্তী, ধাড়সা, সাঁত্রাগাছি

২১। ইকোন (ইংরাজী)—অনিমেষ ঘোষ, ১০৫ এম. সি. ঘোষ লেন

২২। ইণ্ডিয়ান হোম—সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ২০ শিবপুর রোড [অধুনালুপ্ত]

২৩। উত্তর পথ—শম্ভু ভদ্র, ১২৯ নেতাজী সুভাষ রোড

২৪। এবং ক্রতু—বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, স্বপন ঘোষ, ১৯/১ নন্দলাল ব্যানার্জী লেন

২৫। একতারা- ভবানী মজুমদার, ১০১ মাকড়দহ রোড

২৬। এবং—কল্লোল চক্রবর্তী, ১৯/১ নন্দলাল চ্যাটার্জী লেন, কোনা

২৭। কোরক [পরে কোরক সরণী]—দিবাকর ভৌমিক, সীমচক, ধুরখালী

২৮। কৌষিকী—আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, ১১৬/২ বৃন্দাবন মল্লিক লেন

২৯। কৈশোর—অধ্যাপক সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৪/২ ধর্মতলা লেন
[পরিবর্তিত নাম সুকান্ত]

৩০। চিরকুট—দিলীপ রায়, ১১ উমেশ ব্যানার্জী লেন [অধুনালুপ্ত]

৩১। চরৈবেত—রাধারমণ চক্রবর্তী, শিশির মাইতি, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, ২৪ ঠাকুর রামকৃষ্ণ লেন

৩২। চিরন্তনী—রমেন্দ্র নাথ কাঁড়া, তাজপুর, আমতা

৩৩। চারণ—তপন ঘোষ, ৪/১ নারায়ণ ঘোষ লেন

৩৪। ছন্দনীড়—উৎপল কুণ্ডু ও চিন্ময় কুণ্ডু, ষষ্ঠিতলা, রামরাজাতলা

৩৫। জনবাণী—৫/১ হরিকুমার ব্যানার্জী লেন।

৩৬। জাগরণী—শ্যামাপদ ঘোষাল, জগাছা

৩৭। জয় বাংলা—ভবানী প্রসাদ সেনশর্মা, সৌমেন্দ্র নাথ সরকার
৭/১ রামকিনু সরকার লেন, মিনি সাহিত্য সংকলন

৩৮। জয়গুরু—বালী। ধর্ম বিষয়ক পাক্ষিক

৩৯। জার্নাল—সৌমিত্র রায়

৪০। ঝড়—গোপাল চক্রবর্তী, ৪২/১ হাজরা লেন, বালী

৪১। ঢেউ প্রণব কুমার পাল, ১৩৮/২ বেনারস রোড

৪২। ত্রিমাসিক—নির্মল পাল, ২ অবিনাশ ব্যানার্জী লেন

৪৩। তৃষ্ণা -২ কান্তি চন্দ্র গোস্বামী লেন, বালী

৪৪। দৃশ্যপট শিবেন চট্টোপাধ্যায়, ১৪৩/৭ শিবপুর রোড

৪৫। দেশহিতৈষী—তারাপদ মিত্র, মাকড়দহ রোড, কদমতলা

৪৬। দেশ বিদেশ—সরল সেন, ২৬/৩০ কৈ পুকুর লেন

৪৭। ধ্রুবতারা—প্রবীর দত্ত, কেদার ভট্টাচার্য্য লেন

৪৮। নিখাদ—বিশ্বনাথ রক্ষিত, আমতা

৪৯। নিছক সংবাদ—গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, অমিত দত্ত,
৩৫/২ নবীন মুখার্জী লেন

৫০। নদী—অশোক ভট্টাচার্য্য, ২১২ বলরাম পোতা, পাঁচলা।

৫১। নীহারিকা-অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, মাকড়দহ

৫২। নিঃসঙ্গ অবসরে—বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
৩৬/৫/৬ ভট্টাচার্য্য পাড়া লেন

৫৩। নৈবেদ্য—সুধীর দে, ৪৭ শরদিন্দু শেখর শেঠ লেন

৫৪। নীল নির্জন—সমর কুমার নন্দী, ১০ কেদার মুখার্জী লেন

৫৫। পদক্ষেপ—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, জাতীয় সংঘ, শিবপুর।

৫৬। পরিক্রমা—চক্রবাক্ (সুনীল দাস) ২, শিবপুর রোড।

৫৭। পরাগ—আমতা।

৫৮। প্রভাতী—দিলীপ ভট্টাচার্য্য, ৫২/১/৪, দেশপ্রাণ শাসমল রোড।

৫৯। প্রচ্ছদ—সুচী সোম, ২৯ নীলমণি মল্লিক লেন।

৬০। পর্ণসুচী—ব্রজেন্দ্রসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, অচল জঠ পুকুর, হাওড়া-৪

৬১। পিকান—এন. এস. বরিভ, ১৬, মুকরাম কানোরিয়া রোড।

৬২। প্রকাশ (হিন্দী) কামাখ্যা শংকর ত্রিবেদী, সালকিয়া।

৬৩। পটভূমি—জগদিন্দ্র নন্দী, ৭, বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেন।

৬৪। প্রচ্ছদ—হিরন্ময় ঘোষাল, নীলমণি মল্লিক লেন।

৬৫। প্রজ্ঞালোক—বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, ৩৫ উপেন মিত্র লেন।

৬৬। প্রচেষ্টা—প্রণব সরকার, অন্দুল-মৌড়ী।

৬৭। পত্রালী—ধ্রুব বিকাশ দাস ও জনার্দ্দন গোস্বামী, ৭৩, কৈলাস বসু লেন।

৬৮। পূর্ব্বাভাষ—অনির্বাণ রায় চৌধুরী, মানিকপুর, পেঁড়ো।

৬৯। পিলসুজ—সমীর রায়, ১৫/১/১, ওলাবিবিতলা বাই লেন।

৭০। ফসল—নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সালকিয়া।

৭১। বৈশ্য তেলি বান্ধব—সন্তোষ কুমার সাধুখাঁ, ৩২৯, নেতাজী সুভাষ রোড।

৭২। বেতাল কথা—২, রামগোপাল স্মৃতিরত্ন লেন।

৭৩। বন্ধু—দেবাশীষ কুমার, মদন চক্রবর্ত্তী, তাপস আদক, ১১০, নেতাজী সুভাষ রোড।

৭৪। বালুচর—পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, অসিত সেন, দেবব্রত ঘোষ ২৬/৩০, কৈপুকুর লেন,

৭৫। বিন্দু—জহর ঘোষ, বাণী বসু, ২, গোস্বামী পাড়া লেন, বালী।

৭৬। বিচিত্রা—নলিনী কুমার চক্রবর্ত্তী, জীবন ভৌমিক, সুব্রত সাহা, ৬৫, তর্ক সিদ্ধান্ত লেন, বালী।

৭৭। বাগনান বার্তা—গৌর বরণ ভট্টাচার্য্য, কাঁটাপুকুর, বাগনান।

৭৮। বিভিন্ন কোরাস—সুনীল মিত্র, বাজে শিবপুর ২য় বাই লেন।

৭৯। বিশারী—অতুল দত্ত, নিধুগোপাল পাল, ১২, ত্রিপুরা রায় লেন

৮০। বর্ত্তমান—গৌতম চট্টোপাধ্যায়. ১১৭, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড।

৮১। বিশ্বপথিক—নলিনা কান্ত ভট্টাচার্য্য, দাশনগর।

৮২। বৈশ্বানর—হারাধন সাউ, ৪৭, মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য রোড।

৮৩। ভাবীযুগ—সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ৪৪, কাজী কুমার মুখার্জী লেন।

৮৪। ভালোই মন্দই—প্রভাষ দত্ত, ৫/১, মদন বিশ্বাস লেন।

৮৫। মধ্যাহ্ন সূর্য – মলয় চট্টোপাধ্যায়, ডোমজুড়।

৮৬। মশাল – নিমাই মান্না, চাকপোতা, আমতা।

৮৭। মহাপৃথিবী—রমা ঘোষ, ১১, ঠাকুরদাস দত্ত ১ম লেন।

৮৮। মিমি – বরুণ মজুমদার, সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১২০/১, রামকৃষ্ণপুর লেন,

৮৯। মণিমুক্তা – শ্রীমতী বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, ২০. দেবেন্দ্র গাঙ্গুলী রোড।

৯০। রেনে শাঁপ – এণাক্ষী বিশ্বাস, ৬/৭/২, ভৈরব দত্ত লেন। (বর্ত্তমান ক্লাইভে)

৯১। লোক বিজ্ঞান – ডাঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ২০, শিবপুর রোড।

৯২। লোভাসের – শম্ভু ভট্টশালী, শ্রীমণি বাগান লেন।

৯৩। লেখন – সুবোধ প্রামাণিক ও বিমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, শাঁখরাইল।

৯৪। লিলাক – (ইংরাজী) ডি. লক্ষীনারায়ণ, ২৬]২, বৃন্দাবন মল্লিক লেন।

৯৫। লিখতে পড়তে শেখো – পাপিয়া ঘোষ, বাগনান।

৯৬। শতরূপা – নির্মল কুমার খাঁ, ১৪, মাকড়দহ রোড।

৯৭। শ্রমবার্তা – বিভূতি নন্দী, ৪, নিত্যধন মুখার্জী রোড।

৯৮। শঙ্কর – (হিন্দী লিলুয়া।

৯৯। শ্রীমা সারদা – (ধর্মীয়) স্বামী অমিতানন্দ, শ্রীযোগেশ্বরী রামকৃষ্ণ মঠ, ভট্টনগর।

১০০। শিল্পী—তপন কর, পার্থ বসু, কুলগাছিয়া।

১০১। শম্পা—স্বপন নন্দী, কানপুর।

১০২। শব্দায়ণ—অরিন্দম ব্যানার্জী, ৯৬, মধুসূদন বিশ্বাস লেন।

১০৩। শঙ্খ—অসিত চট্টোপাধ্যায়, কেদার ভট্টাচার্য্য লেন।

১০৪। সাহিত্য বাণী—আশ্রাস চন্দ্র মজুমদার, ২৬/১, কৈপুকুর লেন।

১০৫। সায়েন্স ওয়ার্ল্ড—শ্রীরাম দাস, হালদারপাড়া লেন।

১০৬। সংকেত—বঙ্কিম পাঠাগার, কল্যাণপুর।

১০৭। সপ্তর্ষি—চণ্ডীপ্রসাদ সরকার, অশোককুমার ঘোষ, শিবপুর।

১০৮। সম্বোধন—শচীনন্দন আঢ্য, ৯২, শরৎ চ্যাটার্জী রোড।

১০৯। সমব্যথী—সরোজ কুমার চক্রবর্তী, ধাড়সা, সাঁত্রাগাছি।

পত্রিকাটি একযোগে হাওড়া ও শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত।

১১০। সাধারণ তন্ত্রী—সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ২০, শিবপুর রোড।

১১১। সাত্ত্বিক—বরুণ মজুমদার, ১২০/১, রামকৃষ্ণপুর লেন।

১১২। স্বাক্ষর—শ্রীমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, ৪৭, রাজবল্লভ সাহা লেন।

১১৩। সিন্ধুমারস—প্রশান্ত দাস, ৫০, কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেন।

১১৪। সুবর্ণপথ—অর্দ্ধেন্দু কুমার মুখোপাধ্যায়, ৪৪, কৈলাস বোস লেন।

১১৫। সমকাল—বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও সুনীল হাজরা, ৩৬, নেপাল সাহা লেন।

১১৬। সমবায় বার্তা—সমীর কুমার পাঁজা, ৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড।

১১৭। সোনার বাংলা—শৈলেন শেঠ, ৪৫, যাদব দাস লেন।

১১৮। সাহিত্য প্রয়াসী—৪৫, যাদব দাস লেন।

১১৯। সৌভ্রাত্রিম—তরুণ পল্লো, পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, কদমতলা।

১২০। স্ফুলিঙ্গ—জয়ন্ত সিং, ৯৫, রাজবল্লভ সাহা লেন।

১২১। স্ফুটনিক—প্রদীপ তালুকদার, ১২/২ কলাবাগান লেন

১২২। হোমিও মেডিকেল ক্লাব পত্রিকা (ইংরাজী ও বাংলা)—ডাঃ নির্মল কুমার সরকার, ৬২/১, নেতাজী সুভাষ রোড।

১২৩। হাতিয়ার—নিমাই মান্না, চাকপোতা, আমতা।

১২৪। হুতাশন—রুশেচন্দ্র চক্রবর্তী, ২৯/৫, রামজী হাজরা লেন।

১২৫। হরফ—১৫ সিদ্ধেশ্বরীতলা লেন।

১২৬। হাওড়া কাহিণী—অসিত বরণ সাউ ও আভাস চন্দ্র মজুমদার, ২৬/১/এ, কৈপুকুর লেন।

এ ছাড়াও অধুনাতন ঈশান, অনির্বাণ, চলন্তিকা, ঝকমারী, নক্ষত্র, বিশাখা, মহেঞ্জোদাড়ো, শলাকা, উলুখড়, শান্দ, বর্ণালী, যেঁজুতি, ছুটির বাঁশী প্রভৃতি পত্রিকার কোন কোনটি আজও প্রকাশিত হয়।

হিন্দুস্থান সমাচার

১৯৫৭-৫৯ খ্রীঃ-এ সর্বভারতীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হিন্দুস্থান সমাচারের পঃ বঙ্গে কার্য্যালয়টির অবস্থান ছিল বালীতে শ্রীসুকুমার গোস্বামীর বাড়ীতে এবং তিনিই ছিলেন এটির মুখ্য কার্য্যনির্বাহক অফিসার।

হাওড়া প্রেস ক্লাব

৭২, চিন্তামণি দে রোডে হাওড়া প্রেস ক্লাবের সদর দপ্তর। কার্য্যকরী সমিতি (১৯৭৯)-তে আছেন সভাপতি ডাঃ শম্ভু রেণপলি, কার্য্যকরী সভাপতি নির্মল খাঁ, সহ সভাপতি ডাঃ দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষমাশংকর দ্বিবেদী, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, যুগ্ম সম্পাদক সন্তোষ কুমার মিত্র, কাজল সেন, সহঃ সম্পাদক সুধীর দে, সুকুমার দত্ত ও শ্রীমতী বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ তাপস কুমার কুণ্ডু।

সাহিত্য সম্মিলন—সাহিত্য বৈঠক

বাংলা পাঁজির মতে তারিখটা ছিল ১২ই ভাদ্র ১২৫৯, ইংরাজী ক্যালেণ্ডার মতে ২৬শে আগষ্ট ১৮৫২, সেদিন সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়—

"আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি হাবড়া জিলার অন্তঃপাতি সাঁতরাগাছী গ্রামে যে বঙ্গভাষানুশীলন সভাসংস্থাপনের

কল্পনা হইয়াছিল তাহা গত রবিবার অপরাহ্ন চারিঘটিকা সময়ে কতিপয় কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী যুবক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার সভাপতিত্বপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নীল কমল ভাদুড়ী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য সহকারী সম্পাদকস্বরূপ মনোনীত হইয়াছেন······।"

এই ঘটনার পর থেকে বহু সাহিত্য সমিতি ও সম্মেলনের মাধ্যমে হাওড়াবাসীরা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে আসছেন তার লিখিত প্রমাণ পত্র দুর্লভ নয়। ১৩২২ সালের কয়েকটি প্রধান সাহিত্যসেবী প্রতিষ্ঠানের নাম—শিবপুর ওরিয়েণ্টাল পঞ্চবটি লিটারেরি ক্লাব—৪৮, চৌধুরী পাড়া লেন, সাহিত্য সম্মিলন—ডিউক লাইব্রেরী ৪নং চার্চ রোড, সম্পাদক বেদাচার্য্য দুর্গাদাস লাহিড়ী, শিবপুর সাহিত্য সংসদ, শিক্ষাসমিতি—বালী, জগদ্বল্লভপুর সাহিত্য সমিতি, শহরের মধ্যাঞ্চল পঞ্চাননতলার পারিজাত সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন ব্যোমকেশ অধিকারী [বন্দ্যোপাধ্যায়] ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষদিকে হাওড়া টাউন হলে শিবপুর ইন্‌স্টিটিউট একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিলেন। সভায় শরৎচন্দ্র এবং সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৭ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী শিবপুর সাহিত্য-সংসদ শরৎচন্দ্রের একটি সম্বর্ধণ সভার আয়োজন করেন। শরৎচন্দ্রের ৫৮তম জন্মদিনে হাওড়া টাউন হলে পারিজাত সমাজ একটি সভার আয়োজন করেন।

সভায় শরৎচন্দ্রকে যে মানপত্রটি দেওয়া হয় সেটির রচয়িতা ছিলেন ঝাঁটরা মধুসূদন পাল চৌধুরী স্কুলের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক অযোধ্যা নাথ অধিকারী [সাহিত্যিক নাম প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়]।

বাংলা ১৩২১ সালে ডিউক লাইব্রেরীর সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ী যে সাহিত্য সম্মিলনের সুচনা করেন তার প্রথম সভাপতি ছিলেন জেলা শাসক মিঃ হপ্‌কিন্স। জেলায় বড় রকমের সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৬ই, ৭ই, ও ৮ই বৈশাখ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হাওড়া শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে দ্বাদশ অধিবেশন হয়েছিল তার কথা। হাওড়ার পক্ষ হ'তে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহেন্দ্র নাথ রায়, সম্পাদক দুর্গাচরণ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরিশ চন্দ্র বসু। সাহিত্য সম্মিলনের সাথে একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনের মূল সভাপতি ফণিভূষণ তর্কবাগীশ অষ্টাদশ অধিবেশন পাবনা শহরে অনুষ্ঠান হ'বে বলে ঘোষণা করেছিলেন। কার্য্যগতিকে পাবনায় অধিবেশন করা সম্ভব না হওয়ায় ১৯২৯ খ্রীঃ-এ অষ্টাদশ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া জেলার মাজু'তে। মাজু সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন রায় বাহাদুর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

ডঃ সুবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক—মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরা ছিলেন যথাক্রমে ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার এবং ডঃ একেন্দ্র নাথ ঘোষ। সভাপতির ভাষণে রায় বাহাদুর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মৌখিক বক্তৃতায় বলেন "সংগ্রহ করিতে পারিলে হাওড়া জেলায় মধ্য হইতেও যে প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসা যথেষ্টই চরিতার্থ হইতে পারে, অনেক কিছু প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হাওড়া জেলার গ্রামগুলি ঘুরিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়।"

১৩৬৬ সালে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয় মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবচকে। সম্মিলনের তদানীন্তন সম্পাদক ছিলেন হাওড়াবাসী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম মাসিক সাহিত্য সভা ১৫. ৪. ১৯৬২ তারিখে রবিবার, সাড়ে তিনটায় মৈত্রেয়ী দেবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া জেলার চন্দ্রভাগ গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগারে।

সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বর্ত্তমান নাম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন। হাওড়া জেলায় নিঃ ভাঃ বঃ সাঃ সম্মিলনের একটি শাখা আছে। শাখার প্রথম কার্য্যালয় ছিল ৩৭৪, জি. টি. রোড (উত্তর) সালিখায়, বর্ত্তমানে ২৩, জি. টি. রোড, বেলুড়।

উক্ত সংস্থার ১৯৭৬-৭৭ সালের কার্য্যনির্বাহক সমিতির সদস্যগণ হলেন সভাপতি—ডাঃ শম্ভুচরণ পাল, সহঃ সভাপতি—ডাঃ দ্বিজেন্দ্র লাল ঘোষ, মায়ালতা রায়, গোপাল মুখোপাধ্যায়, নলিনী বশিষ্ট, তাবাপদ সাউ। যুগ্ম সম্পাদক—নীরেন সেন অচল ভট্টাচার্য্য সহঃ সম্পাদক—সুধীর চৌধুরী, ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অজিত দাস। সদস্যগণ—অশোক চট্টোপাধ্যায়, সুমন চৌধুরী, বৈদ্যনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়। কোষাধ্যক্ষ—কুবের হাজরা, হিসাব পরীক্ষক—বংশীলাল সবকার।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে নিঃ ভাঃ বঃ সাঃ সম্মিলনের গোরক্ষপুর অধিবেশনে প্রাচ্যবাণী মন্দিরের পক্ষে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করার জন্য হাওড়া থেকে যান মৃত্যুঞ্জয় মিত্র, সুনীল দাস, অনাথশরণ ভট্টাচার্য্য, অনিন্দসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, হিরন্ময় রায়চৌধুরী, কানাইলাল ভট্টাচার্য্য, শান্তিনাথ ঘোষ কুমার হালদার এবং ধীরাজ সাহা।

প্রতিষ্ঠালগ্নে নাম ছিল সালিখা সঙ্গীত সমাজ, বর্তমান নাম গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ। ১৯১২ খ্রীঃ-এ প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটিতে রায় বাহাদুর জলধর সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রতিষ্ঠিত পূর্ণিমা-মিলন উৎসব প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সময়ে নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর আবৃত্তি' চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, নলিনীকান্ত সরকার ও অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়-এর কৌতুক অভিনয় এবং অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র সঙ্গীত সভার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে। সমাজ আয়োজিত প্রকাশ্য সাহিত্য সম্মেলনে যেদিন

সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন স্বর্ণকুমারী দেবী সেদিনের অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ৩০. ৩. ১৯২১ তারিখের দি ইংলিশম্যান পত্রিকায় লেখা হয়—

This is the first occasion on which a distinguished lady literateur has been elected as president of a public literary gathering.

সমাজের ঠিকানা—১২, শিব গোপাল ব্যানার্জী লেন।

অভিনব অগ্রণী সাহিত্যিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে কিশোর লেখক সম্মেলন বড় আকারে হয় ১৯৬০ খ্রীঃ-এ হাওড়া টাউন হলে। সভাপতি ছিলেন রাণা বসু, সাহিত্য প্রতিযোগিতার বিচারক যামিনী কান্ত সোম এবং গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। ৯.৭. ১৯৬৭তে শুদ্ধসত্ত্ব বসুর সভাপতিত্বে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় পাঠাগারে বসে হাওড়ার প্রথম কবি সম্মেলন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২৩শ বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় শ্যামপুরে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০-৩১মে। সভাপতি ছিলেন নির্মল কুমার বসু, উদ্বোধক রবীন্দ্রলাল সিংহ। পঞ্চত্রিংশ সম্মেলন ১৩-১৫ই এপ্রিল ১৯৭৯ বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরীতে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—শঙ্করী প্রসাদ বসু। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি বর্ণালী ও হাওড়া জেলা সমাজবাদী যুবসংঘের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাধারাণী দেবী, সভাপতি প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিঃ অতিথি নরেন্দ্রদেব। সাহিত্য প্রয়াসীর উদ্যোগে বার্ষিক হাওড়া জেলা লেখক সম্মেলন প্রথম শুরু হয় ২. ৩. ১৯৭৩ তারিখে হাওড়া গার্লস কলেজে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ নিমাই সাধন বসু। উদ্বোধক—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় পাণিত্রাস গ্রামে ২. ২. ১৯৭৪—এ যেখানে মূল সভাপতির ভাষণে, হাওড়ায় সাহিত্য সম্মেলনের ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"একসময় হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের একটি স্থায়ী কার্য্যালয় ছিল।" ১৯২১-২২-এ হাওড়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের হাওড়া শাখাটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৯-৪০-এ বি. কে. পাল স্কুলে পঙ্কজভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাওড়া শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পেঁড়োগ্রামের ভারতচন্দ্র মেলার প্রথম বর্ষের সম্পাদক—ডঃ অশোক কুণ্ডু, এবং ১৬. ১. ১৯৭৭ এর সভায় উপস্থিত ছিলেন আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করী প্রসাদ বসু, সুধীর কুমার মিত্র, অচল ভট্টাচার্য্য ও আরো অনেকে। নিঃ ভাঃ শিশু সাহিত্য সম্মেলনের পঃ বঃ শাখার কার্য্যালয় হাওড়া শহরের ৮০, বৈষ্ণবপাড়া লেনে। ১৩৮৩-৮৪ সালের সম্পাদক দিলীপ বাগ, সহঃ সম্পাদকদ্বয়—অজিত দাস, অচল ভট্টাচার্য্য।

সালকিয়ায় ব্রজমোহন দাসের বাড়ীতে একদা নিয়মিত সাহিত্যের আড্ডা বা মজলিস্ হতো। আড্ডায় যোগদানকারী কয়েকজন হ'লেন ললিত মাধব সেনগুপ্ত; ডাঃ শম্ভুচরণ পাল,

তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও কাশীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজমোহন বাবু ছিলেন কলকাতার রবিবাসর নামক সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের একজন উৎসাহীকর্মী ও সংগঠক। হাওড়ায় রবিবাসরের এখন যে দু'জন সদস্য আছেন তাঁরা হ'লেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাওড়া বার্তা সম্পাদক ডাঃ শম্ভুচরণ পাল। এঁদের উভয়ের আহ্বানেই হাওড়াতে একাধিকবার রবিবাসরের অধিবেশন বসেছে।

শ্রীরাম ঢ্যাং রোডের ঢ্যাং-দেদের বাড়ীতে যে সাহিত্যের মজলিস হতো তাতে যোগ দিতেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। সালকিয়ার ত্রিপুরা রায় লেনের ছোড়দার চায়ের দোকানে একদা প্রতি রবিবারে সন্ধ্যায় সাহিত্যের "আড্ডা" বসত। চা-সিগারেটের সঙ্গে এখানে গল্প-কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত থাকতেন কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

হাওড়া-বার্তা পত্রিকা দপ্তরে প্রতি ইংরাজী মাসের দ্বিতীয় রবিবার সন্ধ্যায় সাহিত্য-বৈঠক বসে। ৮০, বৈকুণ্ঠপাড়া লেনে অভিনব-অগ্রণী সাহিত্য-গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠকের দিন বুধবার। দিলীপ বাগ, পঞ্চানন রায়চৌধুরী, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত দাস, অসিত দত্ত, ভবানী প্রসাদ মজুমদার, আভাস মজুমদার, নয়ন রঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীমতী বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, উৎপল হোমরায়, রেবা ঘোষ ও আরও অনেকে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকেন। 'ঈগল'

'অঙ্কুর' প্রভৃতি পত্রিকার উদ্যোগে সালকিয়ার বেনারস রোডের একটি চায়ের দোকানে মাঝে মাঝে সাহিত্যের আড্ডা বসে।

বালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিচক্র মাসিক সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন কবি গোপাল চক্রবর্তী ও রুবী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া খুরুটের মাধব ঘোষ লেনে ইউনেস্কো ক্লাব অফ হাওড়া প্রতিমাসের শেষ শনিবার সাহিত্য সভার আয়োজন করতেন। একসময় সপ্তপর্ণীর মাসিক কবিতা পাঠের বসত সেন্টটমাস চার্চ স্কুলে। ৪, নবীন সেনাপতি লেনে পঙ্কজলাল দাসের বাড়ীতে অবস্থিত রবীন্দ্র-সমিতির [১৯৪২] সাহিত্য, সংগীত ও আলোচনা বাসরের বর্তমান সভাপতি প্রমথ নাথ বিশী। এককালে এই আসরে নিয়মিত আসতেন তারাকালী বসু, রামরেণু মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ধ্রুব মজুমদার, প্রদ্যুৎ মিত্র, বলাই সরকার, ডঃ নিমাই সাধন বসু, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রভাকর মিত্র, শিশির মাইতি প্রমুখেরা।

শিবপুরের ভাবীযুগ পত্রিকা কার্য্যালয়ে অনুশীলনী সাহিত্যিক গোষ্টির উদ্যোগে প্রতি রবিবার সকালে সাহিত্য-বৈঠক বসে। বেণীমিত্র লেনের রেনবো ক্লাবে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আবৃত্তি, সংগীত ও সাহিত্য পঠ হয়।

মধ্য হাওড়ার সাত্বিক সাহিত্য গোষ্ঠী এবং ক্ষণস্থায়ী হ'লেও অধ্যাপক জীবনশেঠ প্রতিষ্ঠিত "পুরোধারী"-কে কেন্দ্র করে একসময় বেশ জমজমাট সাহিত্যের আসর বসত। বিংশ

শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রামকৃষ্ণপুর লেনের নৃসিংহ নিকেতনে "হাওড়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের" সাহিত্য-মজলিশ ছিল জমজমাট। পরিষদের মূল সভাপতি ছিলেন—যামিনী কান্ত সোম, যুগ্ম-সম্পাদক ডঃ নিমাই সাধন বসু ও হরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য বৈঠকে যোগ দিতেন চরণদাস ঘোষ, রামপদ মুখোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ শেঠ, অধ্যক্ষ বিজয় ভট্টাচার্য্য, ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করী প্রসাদ বসু, শঙ্কর [মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়] প্রভৃতি।

কয়েকজন সারস্বত সাধকের কথা

সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনাকারী হাওড়াবাসীদের মধ্যে কয়েকজন হলেন শ্রীধরাচার্য্য (অদ্বয় সিদ্ধি, তত্ত্ব প্রবোধ, তত্ত্ব সংবাদিনী সংগ্রহ, ও ন্যায় কন্দলী), ভরত মল্লিক (চন্দ্র প্রভা ও রত্ন প্রভা) এবং নাট্যকার কৃষ্ণ মিশ্র—প্রবোধচন্দ্রোদয়। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের মতে—অনঙ্গরঙ্গ ও মেঘদূত-এর "অর্থবোধিনী মালতী" নামক টীকার লেখক কল্যাণমল্ল ভূপতিরও বাস ছিল ভুরশুটে।

এর পর বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ লগ্নে—

মন্দ মলয়জ, পবন বহ মৃদু, ও সুখ কোকরু অন্ত
সরবস ধন, দোঁহার দুঁহু জন, কহয়ে রায় বসন্ত।

ভুরশুটের বিদ্যাপতি উপাধিধারী কবি বসন্ত রায়ের (১৪৩৩-১৪৮১ খ্রীঃ) বসন্ত-সুকুমার কাব্যে গোবিন্দ দাসের উল্লেখের আধিক্যহেতু অনেকের মতে দুই কবি সমসাময়িক।

মঙ্গলকাব্যের প্রধান দেব-দেবী মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শিব ও দুর্গাকে অবলম্বন করে কতকগুলি আখ্যা কাব্য রচিত হয়েছিল যেগুলির প্রকৃতি ছিল মঙ্গলকাব্যের মতো। এই ধরণের একটি কাব্যের নাম শিবায়ণ, রচয়িতা—রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র।

"মিরাস বন্দিনু বাস্ত রসপুর দেশ / এতদূরে ভাইরে বন্দনা হইল শেষ।" কবি যেখানে কাব্যের বন্দনা অংশ শেষ করেছেন সেই পংক্তি দু'টি উদ্ধৃত করেই আমরা তাঁর বন্দনা শুরু করছি। রসপুর দামোদর নদতীরবর্তী আমতা থানার একটি গ্রাম। আনুমানিক ১৫৯০-১৬৩০ খ্রীঃ-এর মধ্যে রচিত কালিকাপুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি থেকে আহরিত শিবপ্রসঙ্গ নিয়ে রচিত গ্রন্থটিকে শিবমঙ্গল আখ্যা দিয়েছেন। গ্রন্থে শিবের চরিত্র হ'ল—

"চরণ সুশীতল / অরুণ শতদল / ভকত পিয়ে মকরন্দ"

ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"বাংলাদেশের যদি কোন কবি গ্রাম্য মঙ্গল কাব্যকে পুরাণের সীমানায় তুলে ধরতে প্রয়াস করে থাকেন তবে তিনি হ'লেন শিবমঙ্গলের কবি রামকৃষ্ণ রায়।" কাব্যটিতে সামান্য কয়েক পংক্তি গদ্য রচনার যে আভাষ পাওয়া যায় বাংলা গদ্য সে সময় যে অবস্থায় ছিল সেই পটভূমিকায় তা অচিন্ত্যনীয়। উদাহরণ—"পার্বতী ভাগীরথী স্নান করিতে গেলেন এমত সময়ে শঙ্কর মনের দুঃখে নারদকে কহিতেছেন অবধান করহ" —অথবা, "ভাইরে, নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন,

এমত সময়ে কেমন স্ত্রীলিঙ্গ দেবতা সকল আসিতেছেন, অবধান করহ।" এর বহু পরে ফোর্ট উইলিয়মী গদ্যের জন্ম। কবির পিতামহ যশশ্চন্দ্র নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পিতার নাম কৃষ্ণ রায়। জাতিতে দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ। পূর্ব উপাধি দেব, পরে রায়। ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিন বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরাম সৈন্য পাঠিয়ে কবির গৃহদেবতা রাধাকান্ত বিগ্রহটি অধিকার করার অল্পদিন পরেই নব্বই বছর বয়সে শোকাহত কবির তিরোধান ঘটে।

বর্ধমান রাজ কৃষ্ণরামের হত্যাকারী শোভা সিংহ যখন কৃষ্ণরাম-কন্যার ছুরিকাঘাতে নিহত হন তখন ধর্মমঙ্গল রচয়িতা কবি যদুনাথ বা যাদব রায়ের ভাষায়—"সেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমার।" ঐতিহাসিকদের মতে ঘটনাটির কাল ১৬৯৬ খ্রীঃ। অতএব যদুনাথের ধর্মমঙ্গল সেই সময় রচিত হয়েছিল। কাব্যটিকে কবি "আগমপুরাণ" আখ্যা দিয়েছেন। কাব্যে হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং মুসলমান পীর-ফকিরদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। হরিশ্চন্দ্র, তার পুত্র লুইচন্দ্র ও রাণী মদনাবতীর কাহিনীর বর্ণনাভঙ্গী অতি পরিচ্ছন্ন। যেমন বালক লুইচন্দ্রের প্রতি দুশ্চিন্তাগ্রস্তা মাতা মদনাবতীর নিষেধ বাণী—

বাছা না যাইয় বল্লুকার বনে
কি জানি আছয়ে ভালে　　　নিশি অবসান কালে
বিপরীত দেখিনু স্বপনে
কোলে বইস দেখি চাঁদমুখ
তোমার বিপদবাণী　　　কহিতে বিদরে প্রাণী
মনে বড় পাইয়াছ দুখ।

খোড়হাট গ্রাম নিবাসী হরিদেব শর্মা বা দ্বিজ হরিদেব (১১২৮-৩৩ সাল) ১৭২৭ খ্রীঃ-এ বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়কে নিয়ে রচনা করেন রায় মঙ্গলকাব্য। ১৩৬৭ সালে বিশ্বভারতী প্রকাশিত সাহিত্য প্রকাশিকা ৪র্থ খণ্ডে হরিদেবেররচনা বাণীতে আছে রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল। ১২৭৯-এতে "বেনজির বন্দরে মুণিব" রচনা করেন জনাব করিমুদ্দিন। বান্ধবপুর অথবা গোবিন্দপুর গ্রামবাসী মুহম্মদ খাতের মুন্সি রচিত কয়েকটি গ্রন্থা-গোলে হরমুজ (১২৬১), নূরনামা (১২৭৮) আখবারস সালাত (১২৭৮) মেফতাহল জেল্লাত (১২৮০) শাহনামা (১২৮২) তুতিনামা (১২৯৭) প্রভৃতি। বালিয়া পরগণার অন্তর্গত ধসাগ্রামের জোনার আলি রচনা করেছেন কজিলাত বাঃচাঁদ (১২৯৪), জোবেদা খানম্ (১২৯২) প্রভৃতি।

এ যাবৎ হাওড়ার সর্বাপেক্ষা লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি হলেন রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, যিনি—

"ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদা ভাবে হতকংস,
ভুরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের স্থত, ভারত ভারতীযুত, ফুলের মুখটি খ্যাত,
দ্বিজপদে স্থমতি।"

ভারতচন্দ্রের জন্ম হাওড়া ষ্টেশন থেকে মাইল কুড়ি দূরে আমতা থানার অন্তর্গত পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়া গ্রামে (জে. এল. নং ১৬৬) ১৭২৭ খৃঃ-এ, শিক্ষা দেবানন্দপুরে (হুগলী), কবিখ্যাতি কৃষ্ণনগরে (নদীয়া) এবং শেষ জীবন কাটে মূলাজোড়ে (২৪ পরগণা), মৃত্যু পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

পলাশীর যুদ্ধ বাংলার রাজনৈতিক যুগ পরিবর্তনের যেমন সূচনা করেছে, তেমনি সাহিত্যেরও। এইসময় বাংলা ভাষার রূপান্তর প্রায় বর্তমান কালের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল। সংস্কৃত থেকে বাংলায় পুরাণাদির অনুবাদ এবং মঙ্গলকাব্যের কাহিনীকারদের লিপিকুশলতায় তৎসম এবং ইসলামী শব্দের ব্যবহারে বাঙালী রপ্ত হয়ে উঠেছিল। রাঢ় অঞ্চলের ভাষারই তখন সাহিত্যে প্রাধান্য। গদ্যের না হলেও পদ্যের ক্ষেত্রে হাওড়ার একাধিক কবি তখন সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

শ্রীরামপুরের গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যকে বলা হয় প্রথম বাঙালী পুস্তক ব্যবসায়ী। ১৮১৬ খ্রীঃ-এ গঙ্গাকিশোর কলকাতার ফেরিস এ্যাণ্ড কোম্পানীর ছাপাখানা থেকে ৬টি ছবিসহ ৩১৮ পাতার যে বইটি প্রকাশ করেন, সেটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল। অনুমান

এটিই প্রথম বাংলা সচিত্র বই। অন্নদামঙ্গল ব্যতীত ভারতচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্যে দু'টি সত্যপীর কথা, রসমঞ্জরী, বিবিধ বিষয়ক কবিতাবলী, নাগাষ্টক, গঙ্গাষ্টক এবং চণ্ডীনাটক (অসম্পূর্ণ)। খিল ভারতচন্দ্র নামে চৌর পঞ্চাশৎ নামক সংস্কৃত গ্রন্থটির অনুবাদটি অনেকের মতে ভারতচন্দ্রের রচনা নয়।

উঃ মাজু নিবাসী রামসদয় পাঠক চূড়ামণির পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দেরচিত সত্যনারায়ণ পুঁথির রচনাকাল—

"ইন্দুপরি সিন্ধুশোভে বসু ঋতু শেষে,
শকে সাঙ্গ হ'ল গ্রন্থ আষাঢ়ের বিশে।

টীকা: ইন্দু—১, সিন্ধু—৭, বসু—৮, ঋতু—৬। অর্থাৎ পুঁথিটির রচনা ১৭৮৬ শকাব্দের ২০শে আষাঢ় শেষ হয়। "মুনি-বালকের বিদ্যালাভ" শীর্ষক গ্রন্থটির রচনাকার কালীকৃষ্ণ ঘোষাল। হুগলীতে খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর ঘোষাল মশাই যেখান থেকে বইটি ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। দেবনাগরীতে শব্দ—কল্পদ্রুম, রচনা করেন মাজু গ্রামের হরিচরণ বসু।

১৭৬০-এ ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৩১ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন ব্যক্তিত্ব ধর্মী কবির দেখা পাওয়া যায়নি। এই যুগ কবিওয়ালাদের যুগ। তর্জা, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, হাফ্-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, বসা ও দাঁড়া কবিগান, টপ্, কীর্তন, টপ্পা, তুকগীতি, সমস্তই কবিগানের অন্তর্গত। গানই এ যুগের সাহিত্য। এই গান রচনায় সমধিক কৃতিত্ব দেখান

শালকিয়া'র রামবসু [১৭৮৬-১৮২৮]। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে—যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গালা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিওয়ালা দিগের কবিতায় "রামবসু"। যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্র সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে "রামবসুর গীত"।

ব্যাঁটরা গ্রামে ১২০৮-এ [ইং ১৮০১] মতান্তরে ১২০৭ [ইং ১৮০০]-সালে কায়স্থ বংশে ঠাকুরদাস দত্তের জন্ম। পুত্র লক্ষীনারায়ণ পিতা ঠাকুর দাস সম্পর্কে লিখেছেন—

বহু শিক্ষা লাভ কিংবা চাকুরী গ্রহণ।
এ সকলে ঠাকুরের না উঠিল মন ॥
পিতৃসখা রাম বসু কবিত্বের যশে।
পবিত্র করিল মন বাণী সুধা রসে ॥
কবিতা পাঁচালী, যাত্রা, বাউল, সঙ্গীত।
এ সকল আলাপনে হয় হরষিত ॥
অসংখ্য পাঁচালী রচি কবিতা ও গান।
দেশে প্রচারিয়া পান অজস্র সম্মান ॥
সুকবি সে দাশুরায়, সুধী কীর্ত্তিমান।
যাঁহার পাঁচালী কাব্য নব অবদান।
ঠাকুর দাসের কাব্য করি আস্বাদন।
"দাদা" বলি, "কবি" বলি, করেন বন্দন ॥

অমরকোষের বঙ্গানুবাদ শব্দক—মুক্তরঙ্গিনী (১৮৩১) এবং শব্দ কল্পলতিকা নামক অভিধানদ্বয়ের রচয়িতা জগন্নাথ প্রসাদ বসু মল্লিকের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আন্দুলের জমিদার বংশে। উনবিংশ শতাব্দীর কবি আব্দুল রহিম থাকতেন শালিখায়। মীর হাসানের ফার্সীকাব্য মিছার-উল-বায়ান অবলম্বনে রচিত তাঁর প্রেমলীলা কাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সামাজিক চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশের অমরকীর্ত্তি সটীক "তত্ত্ব চিন্তামণি" প্রকাশ।

মধুসূদন দত্ত মাইকেল হবার পর হিন্দু কলেজ ছেড়ে হাওড়ার বিশপস্ কলেজে পড়তে আসেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। এখানেই তিনি ইউরোপের ক্লাসিক সাহিত্য এবং আধুনিক ভাষা ও ভাবপ্রকরণ শেখার সুযোগ পান, যা ভবিষ্যতে তাঁর কাব্য চিন্তার বনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। এক দিকে তিনি যেমন পয়ার ও ত্রিপদী'র নিগড় ভেঙে বঙ্গছন্দ সরস্বতীকে মুক্তি দিয়েছেন অপর দিকে তেমনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যে তিনি ভারতচন্দ্রীয় ছন্দ ও গীতিধর্মিতার অনুসরণ করেছেন। মধুকবি প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে মাজুগ্রামের বেণীমাধব চক্রবর্তী ১৬৪০ সালে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত জটায়ুপতন কাব্য-গ্রন্থটি রচনা করেন। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ এযাবৎ বহু ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করেছেন। কিন্তু নিজেকে ইঞ্জিনীয়ার কবি রূপে পরিচিত করেছেন এমন ছাত্র পেয়েছেন মাত্র

একজন, তিনি যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)। একদা কল্লোল গোষ্ঠীতে বিশেষ জনপ্রিয় এই কবি রবীন্দ্রনাথ দ্বারা অনুপ্রাণিত অথচ রাবীন্দ্রিক প্রথা বিমুক্ত নূতন পথের দিশারী। নিজের ভাষায় যতীন্দ্রনাথ হলেন ইঞ্জিনীয়ার কবি বা লোহার ফুলদানী। ডঃ সুকুমার সেনের মতে—এদিক দিয়া তিনি আমাদের কবিদের মধ্যে একক।

কাব্যক্ষেত্রে যেমন ভারতচন্দ্র, কথাশিল্পের ক্ষেত্রে তেমনি শরৎচন্দ্র হাওড়ার সাহিত্য জগতের আর এক সূর্য। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রেঙ্গুণ থেকে ফিরে হাওড়া শহরের প্রথমে ৬ ও পরে ৪ বাজে শিবপুর কাষ্ঠবাই লেনে [অধুনা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেন] বাসা বাঁধার পরই তিনি বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথা শিল্পীর সম্মান পান। বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষণীয়া, শ্রীকান্ত (১ম—৪র্থ পর্ব), দেবদাস, নিষ্কৃতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন, স্বামী, দত্তা, ছবি, গৃহদাহ, নারীর মূল্য, বামুনের মেয়ে, রমা, তরুণের বিদ্রোহ, স্বদেশ ও সাহিত্য, অনুরাধা, সতী ও পরেশ, বিপ্রদাস প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে তাঁর হাওড়ায় আসার পর।

শুভস্য শীঘ্রং, হাস্য তরঙ্গিণী প্রভৃতির রচয়িতা নাট্যকার, কবি ও সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মিত্রের [১৭৮৬-১৮২৩] পৈত্রিক নিবাস শালকিয়ায়। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা সমূহের মধ্যে ঢাকা দর্পণ-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবপুর বাজারের নিকট বাস করতেন ঔপনাসিক রামপদ মুখোপাধ্যায়। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যো-

পাধ্যায় এবং কবি গিরিজাপ্রসন্ন বসু'র সাথে শিবপুরের এবং রায় জলধর সেন বাহাদুরের সাথে শালকিয়ার সাহিত্য সেবীদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল। বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত ভূদেব চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে এবং কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষক হিসাবে হাওড়া জেলা স্কুলের সাথে যুক্ত ছিলেন। কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন মধুসূদন বিশ্বাস লেনে। জেলাস্কুলে তাঁর ছাত্রদের একজন ছিলেন বাণীকুমার।

উর্বশী [১৮৬৬] এবং উষা [১৮৭১] রচনা করে বাংলার প্রথম নাট্য রচয়িত্রীর সম্মান পেয়েছেন শিবপুরের কামিনী সুন্দরী দেবী। তাঁর ছদ্মনাম ছিল দ্বিজতনয়া। বালীর চন্দ্রমোহন মজুমদারের কন্যা এবং ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের পত্নী জগন্মোহিনী রচিত সংগীত পুস্তকের নাম জগৎহার। দায়িত্বশীল সরকারী অফিসার যামিনীকান্ত সোমের নাম শিশু সাহিত্যিক হিসাবে বহুল প্রচারিত। শালকিয়ার ব্রজমোহন দাশের উপন্যাস গুলির নাম মেওয়া, বনফুল, বেইমান ও বিয়ের কনে।

কর্ম জীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যাসার্ধ করে সুখপাঠ্য কাহিনীবৃত্ত রচনা করে সুনাম অর্জনকারীদের পুরোভাগে আছেন শঙ্কর বা মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। "কত অজানারে" আমাদের কাছে জানিত করার জন্য চিহ্নিত হ'বার পর তিনি "চৌরঙ্গী" হ'য়ে "ঘরের মধ্যে ঘর"—এ পৌঁছে গেছেন। হাওড়ার ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে বর্তমানে তিনিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। সুকন্যা'র [বিনীতা বন্দ্যো-

পাধ্যায়] "খড়ির লিখন"ও কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক গ্রন্থ। তাঁর নূরজাহান একই সঙ্গে ইতিহাসও উপন্যাস। তাঁর ক্লিয়োপেট্রা,, কুমারীরাণী এলিজাবেথ এবং নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতিও এই জাতীয় গ্রন্থ।

সাঁত্রাগাছি নিবাসী চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এক নূতন ধারার প্রবর্তক। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ব্যতিরেকে তিনি রচণা করেছেন সাহিত্য জিজ্ঞাসার রবীন্দ্রনাথ, দুইনারী ও তিন নায়িকা, সম্পাদনা করেছেন বেশ কয়েকটি গ্রন্থাবলী। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু—১/বি, ওলাবিবিতলা লেন, বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনাকারী। বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গ্রন্থ। তাঁর ক্রিকেট নিয়ে লেখা বইগুলিও যথেষ্ট জনপ্রিয়। অধ্যাপক ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক-সংস্কৃতি প্রভৃতি লোক-সংস্কৃতির উপর বহু গবেষণা মূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক নিমাইসাধন বসু লিখেছেন Indian awakening and Bengal. উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন শীর্ষক গ্রন্থটিই বর্তমানে সাহিত্যের সবচেয়ে দামী বই। আশী টাকা দামের এই গ্রন্থটির রচয়িতা উলুবেড়িয়া কলেজের অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী। পুরাশ-কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও বঙ্গীয় সাহিত্য সম্পাদক ডঃ অশোক

কুণ্ডু'র বঙ্কিমচন্দ্রের উপর গবেষণা সমালোচক মহলে আদৃত হয়েছে। একই কলেজের অধ্যাপক কবি নীরেন্দু হাজরা ও সুদেব সানা [অনির্বাণ রায়চৌধুরী] বহু গবেষণা মূলক প্রবন্ধের রচয়িতা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সরল দে প্রভৃতির সাহিত্য সৃষ্টি সাহিত্য জগতে হাওড়ার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বাজে শিবপুর নিবাসী এ্যাড্ভোকেট ও অধ্যাপক বলাই বন্দ্যোপাধ্যায় বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধের রচয়িতা। তিনি 'শরৎ পরিক্রমা' শীর্ষক স্মৃতিকথা রচনা করে ১৩৮২ সালে সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী পুরস্কার পেয়েছেন। কদমতলা থেকে প্রকাশিত ট্র্যাজেডির তত্ত্ব ও রূপ এবং ভারত সাধন (কবিতা)'র রচয়িতা জীবনকৃষ্ণ শেঠ প্রবীণ সাহিত্যসেবী ও বহু গ্রন্থের লেখক। একই এলাকায় বাস করেন অযোধ্যানাথ অধিকারী যাঁর সাহিত্যিক নাম প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শঙ্কর মিত্র যিনি কবিতা, গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধ রচনায় সমান দক্ষ। হাওড়া জেলার পুরাকীর্ত্তি-কে কলমবন্দী করেছেন বাগনান বাসী তারাপদ সাঁতরা। বেলুড়ের শিবচরণ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে থাকেন কবি নাট্যকার ও সাংবাদিক নীরেন সেন। দুটি নয়ন মেলে'র কবি অজিত দাসের বাস সালকিয়ায়। কথা-শিল্পী কুমার মিত্র ও ভূমিলক্ষ্মী সম্পাদক—শান্তি কুমার মিত্র থাকেন মধ্য হাওড়ায়। শিবপুর ট্রাম ডিপোর কাছে থাকেন "ভাবীযুগ" সৃষ্টিতে ব্যস্ত-উপন্যাসিক, কবি ও প্রাবন্ধিক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়।

গেষ্ট-কীন-উইলিয়াস্-এর অফিসার প্রীতিশ নন্দীর এবং লোক-নাথ চ্যাটার্জী লেন নিবাসী শৈবাল চ্যাটার্জীর ইংরাজীতে কবিতা রচনার খ্যাতি আছে।

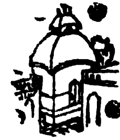
১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারীতে পাণিত্রাসের শরৎ মেলার হিরন্ময়ী মঞ্চের প্রথম অনুষ্ঠান ছিল অচল ভট্টাচার্য্যের শরৎচন্দ্র (জীবন নাট্য)-এর অভিনয়। অভিনয় করেছিলেন জগৎ মজুমদারেব পরিচালনায় অনুষ্টুপ নাট্য গোষ্ঠী। প্রযোজনা—নি. ভা. ব. সা. সম্মেলনের হাওড়া শাখা। জহর শিশুভবনের বার্ষিক উৎসবে অচল ভট্টাচার্যের দেশের ডাক, মরণফাঁদ প্রভৃতি নাটকগুলিও মঞ্চস্থ হয়েছে। নাট্যকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়ন আহুত সাহিত্য প্রতিযোগিতায় একাঙ্ক নাটক রচনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। যুগান্তর, আনন্দবাজার, লোকসেবক, সাহিত্যভারতী, তেপান্তর, রামধনু, যষ্টিমধু ও অন্যান্য বহু পত্রিকায় এঁর গল্প, প্রবন্ধ নাটকাদি প্রকাশিত হয়েছে।

বিভিন্ন সময়ে যে সব হাওড়াবাসী বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডার পুষ্ট করেছেন তাঁদের সাহিত্যকৃতির সম্যক মূল্যায়ণ গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এমনকি সকলের নামোল্লেখও সম্ভব না হওয়ায় মার্জনা প্রার্থনা করে মাত্র কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন সাহিত্য সেবীর নাম উল্লেখ করছি। এঁরা হ'লেন—চরণদাস ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় চৌধুরী, অশোক কুমার সেনগুপ্ত, স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়,

পঞ্চানন রায়চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায়, কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ, জিয়াদ আলি, দিলীপকুমার মিত্র, অধ্যাঃ দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাঃ সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রদোষ দত্ত, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, শিলাজ ভদ্র, শিশির লাহিড়ী, শশধর রায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ দাস, শম্ভু রক্ষিত, অমরনাথ বসু, বিজয় মাখাল, দিলীপ বাগ, অজিত বাইরী, প্রশান্ত দাস, অনিল কুমার দলুই, অজিত কুমার হাইত, ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির কর, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, নয়ন রঞ্জন বিশ্বাস, প্রণব মুখোপাধ্যায়, নিমাই মান্না, দেবব্রত ঘোষ, দেবী রায়, অধ্যাপক নিশীথ মুখোপাধ্যায়, আভাস মজুমদার, বীণা চট্টোপাধ্যায়, নিমাই মান্না, বাসুদেব মোশেল বরুণ মজুমদার এবং হৃষীকেশ ঘোষ।

স্মরণযোগ্যকালের কয়েকজন সংস্কৃত নাট্যকার হলেন ধার্সা'র দুর্গাপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ—একালব্য গুরু দক্ষিণম্, প্রয়োপবেশনম্, কালী কিঙ্কর কাব্য ব্যাকরণতীর্থ—অহল্যা চরিতম্, নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ—কালিদাসঃ, প্রহ্লাদ বিনোদম্, ধ্রুবপ্রসাদম্ প্রভৃতি।

—: :—



লোকপ্রকৃতি



৬

গোড়ার কথা

বাংলায় আর্য বসতি বিস্তারের পূর্বে বর্তমানে যে জনপদটির নাম হাওড়া, সেখানকার অধিবাসীরা ছিল সম্ভবতঃ দ্রাবিড়জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এদের সম্পর্কে 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মন্তব্য—'দ্রাবিড় ভাষী লোকদের প্রকৃতি ছিল কর্মঠ ও উদ্যমশীল, সংঘশক্তিতে দৃঢ়, শিল্প-সুনিপুণ এবং কতকটা অধ্যাত্ম রহস্য সম্পন্ন। এদের মধ্যে সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী বিভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের ছুৎমার্গ ও শ্রেণী পার্থক্য পরে আর্যভাষী সমাজে খানিকটা সঞ্চারিত হয়েছিল।

এদের কাহিনী আচারাঙ্গসূত্র নামক জৈন পুঁথিতেও আছে।

বাংলায় আর্যবসতি বিস্তারের অনেকদিন পর হাওড়া এলাকায় আর্যজাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। ঠিক কোন সময়ে হাওড়ায় আর্যজাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলা মুস্কিল।

বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৮৭৮খ্রীষ্টাব্দে, কায়স্থ কৌস্তুভ মতে ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আর দত্তবংশমালা মতে ৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের রাজা ছিলেন আদিশূর। আদিশূরের আমলে কনৌজ থেকে পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণের সংগে যে পাঁচজন কায়স্থও বাংলায় আসেন তার মধ্যে দত্ত বংশের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় হাওড়া জেলার বালী গ্রামে।

"ঘোষ, বসু, দত্ত, মিত্র এই চারিজন,/দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন, ঘোষ বংশ আকনা গ্রামে, বসু বংশ মাহীনগরে, দত্তবংশ বালী গ্রামে এবং মিত্রবংশ বড়িশায় বসবাস শুরু করেন। সে সময় উক্ত চারিটি গ্রামই সপ্তগ্রামের এলাকাভুক্ত ছিল। দত্ত বংশীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোত্তম এসেছিলেন হাতীতে চড়ে। সুতরাং নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব অস্বীকার করে "দত্ত কারও ভৃত্য নয়, সংগে এসেছিল" এ কথা ঘোষণা করায় দত্তদেরকে কুলীন না করে মৌলিক শ্রেণী ভুক্ত করা হয় এরকম প্রবাদ আছে।

ঘোষ, বসু, মিত্র কুলের অধিকারী,
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি,

—দ্বিজ ঘটক চূড়ামণি কারিকা।

পুরুষোত্তম দত্ত বালীতে প্রথম বাস শুরু করার পর, তাঁর অষ্টম অধস্তন পুরুষ নারায়ণ দত্ত কৌলীণ্য প্রথার প্রচলনের সময় বল্লাল সেনের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন কেহ কেহ এরূপ মতও পোষণ

করেন। পুরুষোত্তমের অধস্তন একাদশ পুরুষ মুরারি দত্তকে গৌড়ের সুলতান দিল্লীতে ফিরোজ শা তুঘলকের রাজসভায় দূতরূপে পাঠান। মুরারি'র কনিষ্ঠ পুত্র ৩েক'ড় [দেবদাস] "চৌধুরী" উপাধি পান ও আন্দুলের জমিদার হন। পরবর্তীকালে এই বংশের গোবিন্দ শরণ দত্ত আন্দুল ছেড়ে গঙ্গার পূব পাড়ে বদর রসা নামক চড়া'য় বসবাস শুরু করেন। অনেকের মতে সেই জায়গাটিই আজকের "কলিকাতা" মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সেদিনের গোবিন্দপুর গ্রাম এবং গোবিন্দ দত্ত-ই কলকাতার হাটখোলার দত্ত বাড়ির আদিপুরুষ।

ভট্টনারায়ণের সহিত আগত মকরন্দ ঘোষের অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ নিশাপতি বালীতে এসে বাস করেন। বালীর ঘোষ বংশের শুরু তাঁর থেকেই। কৌলীণ্য প্রথা প্রচলনের সময় কাশ্যপ গোত্রীয় বহুরূপ বল্লাল সেনের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন। বহুরূপের উর্ধতন অষ্টম পুরুষ বীতরাগ ওঝা কান্যকুব্জ থেকে বাংলায় এসে পৌণ্ড্র-বর্ধন বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের পৌণ্ড্রবর্ধনে বাসকারী শাখার উপাধি হয় মৈত্র বা চৌধুরী। এই বংশেরই অধস্তন পুরুষ স্যার আশুতোষ চৌধুরী, মেজর জয়ন্ত নাথ চৌধুরী এবং নাটোরের রাজবংশ। যে শাখা রাঢ় অঞ্চলে চলে আসেন তাঁদের উপাধি হয় চট্টোপাধ্যায়। সে শাখায় জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র, ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার। এই বংশের ২৬তম পুরুষ ভগবানচন্দ্র, মধ্য হাওড়ার কদমতলার অন্তর্গত কাঁটাপুকুরে বাস করতে থাকেন, এই অঞ্চলে তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণও হয়েছে।

কান্যকুব্জ হ'তে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছান্দড়। ছান্দড়ের উত্তরাধিকারীদের একজন কংসারি মিশ্রের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রামনাথ ঘোষাল মাজুর ঘোষাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও ওই গ্রামের প্রথম চতুষ্পাঠী স্থাপয়িতা। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আয়োজিত পণ্ডিত সম্মেলনে এই বংশের টীকারাম ঘোষাল পাণ্ডিত্য ও বিচার বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বিশেষ প্রশংসা ভাজন হ'ন।

আন্দুলের মল্লিক ও মিত্র বংশের কীর্ত্তি কাহিনী বিশেষভাবে বিদিত। লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে কাশীনাথ মল্লিক কটকের দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁর পৌত্র যোগেন্দ্র নাথ ১৮৪৮-এ আন্দুলে একটি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান রামচন্দ্র রায় সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভকে সাহায্য করেন। ক্লাইভের সুপারিশে বাদশা শাহ আলম ১৭৬৫-তে রামচন্দ্রের পুত্র রামলোচনকে রাজা উপাধি দেন। রামলোচন ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় জমিদারীতে আন্দুলাব্দের প্রচলন করেন।

বালীমেল ও ভুরিগাঞী

কৌলীণ্য প্রথা প্রবর্তিত হ'বার দশ পুরুষ পরে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক মেল বন্ধন প্রথার সৃষ্টি করেন অর্থাৎ বিভিন্ন দোষে দুষ্ট কুলীনদেরকে ছত্রিশভাগে বা মেলে বিভক্ত করেন। ছত্রিশ মেলের মধ্যে একটি হ'ল বালীমেল।

ফুলিয়া খড়দো দেহাটা বাঙালো বালি সংজ্ঞকাঃ
নড়িয়া ষড়িমে মেলাঃ প্রকৃতি গ্রাম নাম নামতঃ

অপর একটি মেলের নাম রাঘব ঘোষলী। রাঢ়ীয় কুলাচার্য শ্যাম চতুরানন লিখে গেছেন—বিষ্ণুদাস ঘোষলী ছিল

ঘটকে কীর্ত্তি করি ঘোষাল করিল
এই বিষ্ণু কন্যা চট্ট বিষ্ণু বিয়া কৈলা
তৎ পশ্চাৎ লখাই বন্দ্যো। কন্যা আনি দিলা।
এই দোষে লখাই পুত্র বালী গ্রামে বৈসে
লখাই স্থগিদ্ কথোকালে কেশরকুনী দোষে।

নিবাস-গ্রামানুসারে দেবীবর ঘটক ব্রাহ্মণগণকে যে ছাপান্নটি গাঞী-তে বিভক্ত করেন তার মধ্যে ভুরশুটের নামে ছিল ভুরিগাঞী।

ভুরি গাঞীর ব্রাহ্মণরা কুলীন নন, শ্রোত্রিয়, কারণ কুলীনের নবধা লক্ষণের মধ্যে একটি গুণ আবৃত্তিতে এঁরা খাটো ছিলেন, অর্থাৎ পুত্র কন্যার বৈবাহিক আদান-প্রদানে যথেষ্ট সাবধান ছিলেন না—বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র রমেশ চন্দ্র মজুমদার।

কয়েকটি ছড়া ও প্রবন্ধ

গ্রাম্য ছড়া ও প্রবাদবাক্যের মধ্যেও লৌকিক ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। এ্যারিষ্টটলের ভাষায় প্রবাদ হ'ল Fragments of an elderwisdom. হাওড়াতেও এ ধরণের ছড়ার ছড়াছড়ি—স্থানা-ভাবে যার কয়েকটির মাত্র এখানে আলোচনা করা সম্ভব হ'বে।

'গঙ্গার পশ্চিমকূল/বারাণসী সমতুল।'

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত হাওড়া বারাণসীর ন্যায় পবিত্র জ্ঞানে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার দীর্ঘদিন পূর্বেই সালকিয়া, শিবপুর, রাম-কৃষ্ণপুর ও বালীতে এসে বসবাস শুরু করেন। জনশ্রুতি মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির পর বহু ব্রাহ্মণ পরিবার কলকাতা ছেড়ে গঙ্গার পূব পাড়ে এসে বাসা বাঁধেন।

ভারতে প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাগজ তৈরীর গৌরব হাওড়ার। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বালী মিল্‌স্‌-এর প্রতিষ্ঠা হয় আধুনিক প্রথায় কাগজ তৈরীর জন্য। ছাপার কাজ তখনও এদেশে শুরু হয়নি। বালীর এই গৌরব-কথা লৌকিক ছড়ায় আজও বেঁচে আছে– 'কাগজ, কলম, কালি-তিন নিয়ে বালী।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের কথা, বালীতে বিদ্যালয় স্থাপন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সেবার কাজে অগ্রণী—শ্রীচরণ, শান্তিরাম ও বীরেশ্বর স্মরণীয় হয়ে রইলেন গুণমুগ্ধ প্রতিবেশীদের ছড়ায়—

ছিরে, বিরে শান্তিরাম
তিন নিয়ে বালিগ্রাম।

শান্তিরাম যাঁর ডাক নাম—তাঁর পোষাকী নাম ছিল অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ব্যানার্জী পাড়ায়। শান্তিরাম রাস্তা বালির এখন একটি উল্লেখযোগ্য পথ। বীরেশ্বর চ্যাটার্জী থাকতেন চৈতল-পাড়ায় আর বিবির ডাঙ্গায় ছিরে ওরফে শ্রীচরণ মুখার্জী।

মশা, মাছি ও নেশাখোরদের উপদ্রবে বিপর্যস্ত সালকিয়াবাসীরা নিজেদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা ছড়ার মধ্যে বেঁধে রাখলেন—

মশা, মাছি, কলকে
তিন নিয়ে সালকে।

মশা শুধু সালকেতে নয়—সারা হাওড়া জুড়ে।

ডাঁশ, মশা, মাছি,
তিন নিয়ে সাঁতরাগাছি।

শিবপুরেও এই প্রাণীটির যথেষ্ট আধিপত্য। কিন্তু সেখানকার লোকের গানে এত বিভোর যে মশার গুঞ্জন তাতে চাপা পড়ে গেছে।

গাইয়ে, বাজিয়ে, সুর
তিন নিয়ে শিবপুর।

আজকের মত সেদিনের উলুবেড়িয়াও ছিল হাওড়ার অন্যতম কর্মব্যস্ত অঞ্চল। এই কর্মব্যস্ততা বজায় রাখার কাজে যাদের সাহায্য ছিল অপরিহার্য তাদের নিয়ে ছড়া তৈরী হল—

ঘেঁটেল, চেটেল, আর ফড়ে,
এই তিন নিয়ে উলুবেড়ে।

ভাগীরথীর পশ্চিমে উলুবেড়িয়া, পূর্বে অছিপুর, তখন রেল হয়নি, বাস হয়নি। দেশ-দেশান্তরেই হোক, এ পাড় থেকে ও পাড়েই হোক যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল জলপথে, উলুবেড়িয়ার

ঘাটে গঙ্গায় যারা যাত্রীদের পারাপারের কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের বলা হ'ত ঘেঁটেল। দ্বিতীয় মত, সামন্ত নৃপতিদের ঘাঁটি রক্ষকদের বলা হত ঘাটিয়াল, অপভ্রংশে ঘেঁটেল। যাত্রীদের সাময়িক আশ্রয়স্থল 'চটি'র মালিক বা তদারককারীরা হ'ল চেটেল। ফড়ে বলা হ'ত যারা কাঁচা-তরিতরকারী শাক-সব্জীর ব্যবসা করত—তাদের উলুবেড়িয়ার জম-জমাট হাটকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছিল এই ফড়ে শ্রেণী।

খাল, নালা বন্যা / তিন নিয়ে খালনা

তা সত্ত্বেও, খালনা ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, গ্রামের প্রধান তিন ব্যক্তির উপাধি—রায়, বাড়ুজ্যে, মোল্লা / এই নিয়ে খালনা।

জেলার দঃ পূঃ রেল পথের অন্যতম বিখ্যাত ষ্টেশন বাগনান। ঠিক কোন সময় থেকে এ অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়েছে নিশ্চয় করে বলা শক্ত। লৌকিক ছড়ায় জানা যায় অঞ্চলটির বাসিন্দাদের কথা—

দুলে, কাপালী, মুচুরমান
এই তিন নিয়ে বাগনান।

দুলে জাতির বসবাস পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই অল্প বিস্তর। এদের পেশা মাছ ধরে বিক্রী করা। কাপালী জাতির বংশগত জীবিকা আ'জ নানা কারণে বিড়ম্বিত হলেও গৌরবজনক ভারতীয় পাট শিল্পের প্রথমশিল্পী এরাই, যখন পাট ছিল কুটির শিল্পের কাঁচা মাল, চটকল প্রতিষ্ঠার আগে, সে যুগে বাগনান শহরের সীমান্তে

বসবাসকারী কাপালী জাতিই ছিল চট ও শনের থলে, দড়ির প্রভৃতির প্রস্তুত কারক। বাগনান অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরও যথেষ্ট বসতি ছিল। বিখ্যাত সফরদান পীর সাহেবের সমাধি এই এলাকাতেই।

তেল, তামাক, খ্যাংরা কাটি
এই তিন নিয়ে বলুহাটি।

বলুহাটীতে তামাক ব্যবসায়ীর সংখ্যা আগের থেকে কমে এলেও এখনও মল্লিক পরিবার তিন পুরুষের এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছেন। সরস্বতী নদী তীরবর্তী গ্রামটিতে নারিকেল গাছের সংখ্যা প্রচুর— যা থেকে খ্যাংরা কাটি পাওয়া যায়। আগে গ্রামে কলুবাড়ী ছিল। তেলকল হ'বার পর, কলুর বলদের চোখের ঠুলি খুলে গেছে।

কোন জিনিস খুব উঁচু হ'লে বলা হয়—উঁচু যেন পেঁড়োর মন্দির। পেঁড়ো আমতা থানার একটি গ্রাম। এই গ্রামে ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজবংশীয়দের নির্মিত বেশ উঁচু একটি মন্দির থেকেই প্রবাদটির জন্ম।

জেলার অধিবাসীদের এবং তাদের উপজীবিকার কথা ছেড়ে এবার আসুন তাদের বেশবাস, চালচলন আর আকৃতির বর্ণনায়।

'গোঁফ ছাটা লম্বা দাড়ি, / তার হচ্ছে রাণা'র বাড়ি।'

আকৃতির বর্ণনা শুনেই বোঝা যাচ্ছে রাণা হ'ল একটি মুসলমান প্রধান গ্রাম।

গ্রামের আদিবাসীদের উপজীবিকা নিয়ে একটি ছড়ায় কৌতুক করা হয়েছে—পা গোদা গোদা, মাথা হেঁড়ে

তার বাড়ী ভুলগেড়ে।

ভুলগেড়ে গ্রামের অধিবাসীদের পা-গুলি গোদা গোদা অর্থাৎ মোটা এবং মাথাটি হেঁড়ে বা বড়—ছড়ায় একথা বলা হলেও এটি একটি কৌতুক কথা। আসলে ভুলগেড়ে গ্রামের অধিবাসীদের উপজীবিকা, গ্রাম-গ্রামান্তরের হাটে ও মেলায় ফুল এবং ফলের চারা বিক্রী করা। জল-কাদার পথে মাথায় বোঝা নিয়ে তারা যখন হেঁটে যেত তখন দূর থেকে তাদের কাদা ভর্তি পা-গুলি দেখতে গোদা গোদা আর ঝাঁকা শুদ্ধ মাথাটি হেঁড়ে বা বড় বলে মনে হত।

এই জাতীয় দু'টি ছড়া—কাঁড়ার, করাত্তি, জোলা,

তিন নিয়ে সোণা তলা।

জেলে, কলু এবং নাপতের ক্ষুর,

তিন নিয়ে রঘুনাথপুর।

পাল ও সেন যুগে হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার বাছরী গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল তার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কয়েক বছর হল আবিষ্কৃত হয়েছে। সে যুগের পোড়া মাটির মূর্তি ও বাসনপত্রের ধ্বংসাবশেষ গ্রামটির চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়ান আছে যে সাবধানে পা না ফেল্লেই রক্তপাতের সম্ভাবনা। গ্রামটির এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ছড়া তৈরী হল—

বাছরীর ম্যাটি যাবে গুটি গুটি,
যদি যাও ছুটে খোলাম যাবে ফুটে।

বাছরী গ্রামে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রের টুকরা আশুতোষ মিউজিয়ামে এবং পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি মন্দিরে আছে।

সাঁকরাইল থানার সারেঙ্গা গ্রামে একদা এমন সব ডাকাত—পরিবারের বাস ছিল যে, সে সব বাড়ীর মেয়েরাও ছিল পুরুষদের সক্রিয় সহযোগিনী। এই গ্রামের বাসুদেব মোশেল মশায়ের কাছে শুনতে পেলাম এমন একটি ছড়া যাতে গ্রামের এই বৈশিষ্ট্যটি চিত্রিত হয়েছে—সারেঙ্গার এমনি মাটি,

মেয়েরা খেলায় লাঠি।

আরও কয়েকটি ছড়া হল—

১। কলের ওঁচা সোনা, দেশের ওঁচা কোণা
[কোণার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কোন ব্যক্তির রচনা।]

২। গঙ্গা ডুবু ডুবু, ইটারাই ভাসে, সোনার শিবপুর দাঁড়িয়ে হাসে।
[হাওড়া শহরস্থ শিবপুর নয়, এটি কুড়চি শিবপুর বা সিংটি শিবপুর]

৩। জয়পুরের চোপা / থালনার খোঁপা,
আমতার টান/কোঁদল করবি যদি রামচন্দ্রপুরের মেয়ে আন।

প্রবাদ-প্রবচনের পথে গুটি গুটি হাঁটলে আমরা খুঁজে পাবো লোক-প্রকৃতির এমনি অনেক বর্ণনা, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের দু'একটি

টুকরা—যা নাড়া-চাড়া করতে করতে হয়ত পৌঁছে যাব সাহিত্যের বাঁধান সড়কে। তাই কোন অঞ্চলের লোকপ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পেতে হলে সেই অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনকে অবহেলা না করে তার সাহায্য আমাদের গ্রহণ করতেই হ'বে।

সমাজ ব্যবস্থা

বিভিন্ন প্রকারের উৎসব অনুষ্ঠানে আত্মীয়-কুটুম্বগণ ত বটেই পাড়া-প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধবদেরও সমাবেশ প্রয়োজনীয় এবং সকলের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করা কল্যাণকর বলে ভাবাই আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার সনাতন রীতি। সামাজিক রীতি-নীতি-ভঙ্গকারীদের জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুতর যে শাস্তি বরাদ্দ ছিল সেটি হল "একঘরে" করা।

সেকালের গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে 'একঘরে' হয়ে থাকা কিরকম মর্মান্তিক ছিল তা আজকের নগরজীবনে অভ্যস্ত আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তাই এক ঘরে যাতে না হতে হয়, পক্ষান্তরে সামাজিক মর্য্যাদা বাড়ে সকলেই এরূপ কাজ করার জন্য সচেষ্ট হ'ত—ফল তার যত মর্মান্তিকই হোক না কেন। সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হল বিবাহ। বিবাহ বিষয় ধর্মাচণের নামে অধর্মাচরণ কতদূর প্রশ্রয় পেয়েছে প্রথমে সেটিই বিচার করে দেখা যাক।

বিবাহ

গৌরী দান করলে পুণ্যলাভ হয়, মেয়ের পিতা মাতার এ

ধারণা হিন্দুযুগের। তারই জের টেনে মুঘল আমলে ত বটেই ব্রিটিশ যুগের সুরুতেও এদেশে দশ থেকে বার বছরের মধ্যে মেয়েদের বিবাহ হওয়াই ছিল সাধারণ ঘটনা। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল বালী গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কুলীন বৈদ্য পরিবারের শ্রীচন্দ্র কুমার মজুমদারের বড় মেয়ে জগন্মোহিনী দেবীর বিয়ে হয় ন-বছর বয়সে। পাত্র শ্রী কেশবচন্দ্র সেন, উত্তর জীবনের ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখের বহুদিনের চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে বাল্য বিবাহের উপর প্রথম সরকারী বাধা আসে ১৯২৯-এর সর্দা আইনে যখন বিয়ের বয়স কমপক্ষে মেয়েদের পনের এবং ছেলেদের আঠার করা হয়। ১৯৫৪-র বিশেষ বিবাহ আইনে আবার মেয়েদের ও ছেলেদের বিয়ের বয়স কমপক্ষে যথাক্রমে আঠার ও একুশ বলে ধার্য করা হয়।

সে যুগে বাল্যবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কুপ্রথা চালু ছিল—পুরুষদের বহু-বিবাহ। বহু-বিবাহের সর্বাধিক প্রচলন ছিল কুলীনের কুল রক্ষায়। কুলীনের সঙ্গে সব কয়টি মেয়ের বিয়ে দিলে সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যেত। কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক যিনিই হন না কেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের বিধান এটির শক্তি বৃদ্ধি করে।

মিঃ ও ম্যালী এবং মনোমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত হাওড়ার পুরানো ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে উল্লেখ আছে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বালীতে এক কুলীন ব্রাহ্মণ মারা যান যাঁর ধর্মপত্নীর সংখ্যা ছিল পুরো একশ'। জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার ১২ই বৈশাখ ১২৪৩ সালের [ইং ২৩,৪,১৮৩৬]

সংখ্যায় বহুবিবাহকারী কুলীন ব্র'হ্মণদের যে তালিকাটি প্রকাশ করা হয় তাতে দেখা যায় বালী গ্রামের রামজয় চট্টোপাধ্যায় মাত্র বাইশ বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের বহু বিবাহ— ১ম পুস্তক অনুসারে, মাজুর ৪০ বছরের হরশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং নারীদের ৩৫ বছরের ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের অর্ধাঙ্গীনির সংখ্যা মাত্র পাঁচ। অনুমান বয়স বাড়ার সাথে সাথে উক্ত সংখ্যার নিশ্চয়ই পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছিল।

সর্বশেষ হিন্দু বিবাহ আইনে একটির বেশী ধর্মপত্নী রাখার বিধান না থাকায় এগুলি এখন গল্প কথায় পরিণত হয়েছে। তবে আইন চ'লু হ'বার আগেই, শিক্ষার অগ্রগতির ফলে একটি কনের জন্য একটি বর প্রথার চলন হয় এবং বরের যোগান চাহিদা মত বৃদ্ধি না পাওয়ায় বরের বাজার দর চড়ে গিয়ে 'বর পণ' প্রথার উদ্ভব হয়। এই কু-প্রথা রোধের জন্য সরকার এবং জন-মানস অচিরে সক্রিয় হয়ে ওঠায় এখন এটি বে-আইনী কার্য্য হিসাবে গণ্য হয়।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কথা। বিধবা বিবাহের জন্য বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রাণতুচ্ছ করা পরিশ্রমের ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টার কথা ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। বহুদিনের আন্দোলন ও বহু প্রকারের বাক-বিতণ্ডার পর বিধবা বিবাহ আইন চালু হওয়া সত্ত্বেও বিধবা বিবাহের হার এখনও যৎসামান্য। বালীবিদ্বৎ সমাজের কিছু প্রভাব শালী ব্যক্তি বিধবা বিবাহ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সমর্থক থাকা সত্ত্বেও

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা বেলুড় নিবাসী সত্যচরণ চ্যাটার্জীর এক প্রবন্ধে দেখা যায় ঐ গ্রামবাসী জমিদারবাবু কামাখ্যানাথ চ্যাটার্জীর পৌত্রী সত্যবালা বিয়ের অল্প দিন পরেই বিধবা হন। পিতা 'সর' বাবু মেয়েকে বেথুন কলেজে পড়িয়ে শিক্ষিত করে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে সচেষ্ট হ'ন, বাঙালী পাত্র না পাওয়ায় অবশেষে বিলাত ফেরৎ গুজরাটী ব্রাহ্মণ ডাঃ দেশাইয়ের সংগে মেয়ের বিয়ে দেন।

সতীদাহ

ধর্মাচরণ বিকৃত হয়েই অধর্মের উৎপত্তি ঘটায় এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই অধর্মাচরণগুলিও অনুষ্ঠিত হয় ধর্মের দোহাই দিয়ে। এইরকম একটি অধর্মাচরণ একদা হিন্দুসমাজে অনুষ্ঠিত হত বিশেষ উৎসাহ সহকারে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে 'সতীদাহ'—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকেও স্বামীর চিতায় দাহ ক'রা—নাম দিয়ে। ভারতভূমির অন্যান্য অংশের ন্যায় হাওড়াও যে সতীদাহরূপ পুণ্য কাজে পিছিয়ে ছিল না তার সমর্থন পাওয়া যায় শ্রীরামপুর মিশনারীদের একটি সমীক্ষায়। সমীক্ষায় যে ফলটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভাইস প্রোভোষ্ট ও ক্লাসিকসের অধ্যাপক ক্লড বুকাননের গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে সেটি পড়লে জানা যায় ১৫, ৪, ১৮০৪ থেকে ১৫, ১০, ১৮০৪-এর মধ্যে কলকাতার আশে পাশে তিরিশ মাইলের ভিতর যে ১৬ জন সতী হয়েছিল তার মধ্যে শিবপুর থেকে বালীর মধ্যে সতী হয়েছিল দশজন।

পঃ বঙ্গে সতীদাহের প্রাচীনতম নিদর্শন ফলকটি পাওয়া গেছে বালী ঘোষ পাড়া থেকে। এখন এটি আছে কলকাতা যাদুঘরের বেঙ্গল আর্ট গ্যালারীতে। পোড়ামাটির ফলকের এক পিঠে আছে—

ব্রজনাথ

বিমলা

সতীদাহ—১২০৬

অপর পিঠে—শ্রীম. সু. ঘো. দুই হাতের ছাপ, ১২৮৫। যাদুঘর এবং বালী ঘোষপাড়া নিবাসী শ্রীটিকেন্দ্রজিৎ ঘোষের কাছে থেকে এ বিষয়ে যা তথ্য সংগ্রহ করেছি তা হ'ল—শ্রীটিকেন্দ্রজিৎ ঘোষের প্রপিতামহ মধুসূদন ঘোষ [১২০২-১২৮৬ বঙ্গাব্দ] ১২৮৫ সালে অর্থাৎ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফলকটি উৎকীর্ণ করেন তাঁর প্রপিতামহ ব্রজনাথ ঘোষ ও প্রপিতামহী বিমলার স্মরণে। ব্রজনাথ বাবু মারা গেলে পত্নী বিমলা সহমৃতা হন ১২০৬ সালে অর্থাৎ ১৮০০ খৃষ্টাব্দে। ফলকের পিছনদিকে মধুসূদন ঘোষ শ্রীম. সু. ঘো বলে স্বাক্ষর করেছেন ১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, যখন তিনি ঘটনাটির স্মরণে এটি প্রোথিত করেন। শ্রীটিকেন্দ্রজিৎ ঘোষের ব্যক্তব্য স্ব-পুত্র মধুসূদন বাবু শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কাছে ইংরাজী শিখেছিলেন বলেই এই ধরনের সংক্ষেপে-স্বাক্ষর করতে অনুপ্রাণিত হন। ১৮২১-এর পার্লামেণ্টারী কাগজপত্রে দেখা যায় সালকের সতী-সংখ্যা ১৮১৫-তে ৪ জন, ১৮১৬'য় ১০ এবং ১৮১৭-তে ৯ জন। ১৮১৫-তে সতীদাহের উপর কিছু সরকারী বাধা নিষেধ আরোপ

করা হয়। ঐ বছরের ২১শে জুন ঘুসুড়ীতে এক পোদ্দার-স্ত্রী'র সহমরণের দৃশ্য লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি মন্তব্য করেন—যদিও দেশীয় বহু ব্যক্তি প্রথাটির প্রতিকুল মত পোষণ করেন তথাপি প্রথাটি একেবারে বন্ধ করতে আরও বহু সময় লাগবে।

১৮২১-এ সালকেতে তারিণী বাড়ুয্যে মারা যান বেলা একটায়। তাঁকে দাহ করা হয় বেলা ৫টায়। সহমরণে যান তাঁর ১৭/১৮ বয়স্কা সুন্দরী স্ত্রী। কিন্তু ১৮২৬-এ সতী হওয়ার অনুমতি আনতে দেরী হওয়ায় মৃত্যুর চতুর্থ দিনে একটি শবদাহ করা হয়। সতী হ'ন মৃতের তিন স্ত্রী'র মধ্যে দু'জন। একজন সতী'র ব্যবহারে কোন চাঞ্চল্য দেখা না দিলেও অপরজন কোন সময় পালাবার চেষ্টা করে বিফল হ'লে ভয়ে ও উত্তেজনায় মূর্ছিত হয়ে পড়েন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর মতে তাকে মাদক জাতীয় কিছু সেবন করান হয়। শ্মশানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের আপত্তিতে সতীদের বাঁশ দিয়ে বাঁধা না হলেও তাদের চিতায় শোয়ান'র পর বড় বড় কাঠ এমনভাবে সাজানো হয় যাতে তাদের পক্ষে চিতা থেকে উঠে পালানো সম্ভব না হয়। ১৭, ৪, ১৮২৪ তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়—সালিকা নিবাসী ত্রিশ বৎসর বয়স্ক গৌর বাজাল-নামক এক ব্যক্তি ২২শে চৈত্র ওলাওঠা হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। পরদিবস প্রাতে তাহার আত্মীয়-স্বজন দারোগাকে সম্বাদ কহিল তাহাতে রিপোর্ট হইয়া অনুমতি প্রাপ্তির বিলম্ব হওয়াতে সে শব চারিদিবস পর্য্যন্ত ছিল। শোনা গেল যে, তৃতীয় দিবসে সেই স্ত্রী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া

শবের পার্শ্বে পাগলিনী প্রায় শয়ন করিয়াছিল। পরে অনুমতি হইলে অনায়াসে শবসহ অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে।

সেকালের সংবাদপত্রের পাতা থেকে The days of John Company নামক পুস্তকে নিম্নোক্ত বিবরণটি মুদ্রিত হয়েছে— বৃহস্পতিবার ৬, ৪, ১৮২৮-এ হাওড়া থেকে একটি সতীদাহের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী "বেঙ্গল হরকরা ও ক্রনিকল" এর সম্পাদককে লিখছেন—

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, গতকাল সকালে শালকিয়াতে যে সতীদাহটি অনুষ্ঠিত হয় তাহার একটি বিবরণী পাঠাইলাম। পত্রটির মাঝে দু'লাইনের একটি কবিতা এবং শেষে একটি উদ্ধৃতি আছে :—

'Tis fired
All that of living or dead remains
In one wild voar expired

* * * * *

In vitum qui Survat idem facit occidenti.

সহৃদয় ও অকুতোভয় সমাজ সংস্কারকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড বেন্টিক কর্তৃক সতীদাহের সাহায্যকারীকে নরহত্যারূপ দণ্ডনীয় অপরাধের অপরাধী

হিসাবে ঘোষণা। সতীদাহের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় দলগুলি যখন কলকাতার আকাশ বাতাস গরম করে তুলেছিল তখন হাওড়াতেও তার কিছুটা আঁচ এসেছিল। হাওড়াতে সতীদাহ নিবারণে দৃঢ় সঙ্কল্প রামমোহনপন্থীদের অন্যতম ছিলেন আন্দুল রাজ কাশীনাথ।

দাস-ব্যবসা

প্রাচীন ভারতে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আলু পটলের মত মানুষ বিক্রীর খবর না পাওয়া গেলেও পিতা অর্থের বিনিময়ে পুত্রকে বিক্রী করছে—দারিদ্রতাবশতঃ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক—এরকম কাহিনী শোনা যায়। পৌরাণিক যুগের কাহিনী শূনঃশেফের বৃত্তান্তও বহুল প্রচারিত। ঐতিহাসিক যুগেও এরকম ঘটনার নজীর আছে।

স্বনামধন্য মুর্শিদকুলী খাঁ নাকি এইরকম ভাবে বিক্রী করা এক ব্রাহ্মণ সন্তান। তাঁর বাবা একবেলা পেট ভরে খেতে পাওয়ার জন্যই তাঁকে বিক্রী করেছিলেন। একদা দাস ছিলেন পরে রাজা হয়ে ভারত শাসন করে গেছেন দিল্লীতে এরূপ একটি বংশের বৃত্তান্ত আমরা সকলেই পড়েছি। আবার বাংলার ঘাটে ঘাটে এক সময় 'ভরা'র মেয়ে বিক্রী হত—নাম ভাঁড়িয়ে, জাত ভাঁড়িয়ে। কিন্তু দাসব্যবসা বলতে আমরা মানুষ কেনা-বেচার যে ব্যবসাটির কথা বোঝাই তার প্রকৃতি কিন্তু ভিন্নরূপ।

সারা পৃথিবীতে যে দাস ব্যবসা রহিত করার স্বপক্ষে মানব-বিবেক জাগরিত হয়, ভারতে সেই কুখ্যাত প্রথাটির প্রচলক একান্ত-ভাবে পর্তুগীজরা—সহযোগী ছিল আরাকানী মগ এবং সময় বিশেষে কিছু এদেশের লোকও।

ভারতে ক্রমশঃ অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির সঙ্গে বাণিজ্যে হেরে গিয়ে পর্তুগীজরা লাভজনক দাসব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে। সঙ্গী হিসাবে গ্রহণ করে আরাকানীদের। 'তালগাছের আড়ে। আছে আকানড়ে। ছেলেধরার ভয় হয়েছে। পথে বেরিওনারে বাবা'—ছড়াটিতে আরাকানীদের দাস হিসাবে বিক্রীর জন্য শিশু মৃগয়ার চিত্রটি ধরে রাখা হয়েছে। পর্তুগীজ বোমেটেদের বলা হত 'হারমাদ'—সম্ভবত 'আরমাডা' শব্দের অপভ্রংশ, আ'ড়কাঠি নিযুক্ত হত দেশীয় লোকেরা।

নদীবহুল হাওড়া জেলায় পর্তুগীজ জাহাজের আনাগোনার সুবিধা থাকায় এবং এই জেলা সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি হওয়ায় ব্যবসা এমন ফলাওভাবে চলতে লাগল যে, ভারতস্থ ইংরাজ ও ফরাসী সরকারও এই ব্যবসা থেকে কিছু মুনাফা করার লোভ ছাড়তে পারলেন না। দাস কেনা এবং বেচা দু-রকম কাজের ওপরই শুল্ক ধার্য করা হল। ইংরাজ সরকারের শুল্ক হার ছিল চার টাকা চার আনা। ফর'সী এলাকায় দাসখৎ লেখবার স্ট্যাম্প পেপারের দাম ছিল পাঁচসিকা (একটাকা পঁচিশ পয়সা) এবং দাস প্রতি মূল্যানুপাতিক শুল্ক হার শতকরা পাঁচ টাকা।

কায়িক পরিশ্রমে কিছুটা অপটু হলেও নম্রস্বভাব ও বিশ্বস্ততার জন্য আন্তর্জ্যাতিক বাজারে ভারতীয় ক্রীতদাস সুনাম অর্জন করেছিল ভারতীয় ক্রীতদাস-কুলশ্রেষ্ঠ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল বাঙালী ক্রীতদাসগণ। বাঙালী ক্রীতদাসদের বেশীর ভাগ সংগ্রহ করা হত হিন্দুদের মধ্যে থেকে। একজন যুবতী ক্রীতদাসীর বাজারদর ১৯টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত হত। এইচ. জে. রেণীর বই পড়লে জানা যায় আর সব পণ্যের মত মানুষ বিক্রীরও বিজ্ঞাপন দেওয়া হত কাগজে।

মিঃ সি. এন. ব্যানার্জী এক সময় হাওড়'র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন—এইসব বিজ্ঞাপনে বিক্রয়-যোগ্য বালক-বালিকাদের নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া হত। বিভিন্ন জায়গা থেকে দাস-দাসী হিসাবে বিক্রীর জন্য ছেলে-মেয়ে যোগাড় করত এমন এক বুড়ীর কথাও তিনি তাঁর An account of Howrah past and present-গ্রন্থে লিখে গেছেন। বইটির ১৯ পৃষ্ঠায় আছে :

Slavery was in vogue in Howrah. Public advertisements appeared in those days giving a minute description of the boy or girl to be sold or bought and I remember an old lady still living speapking of the slave girls she had bought on different times when she lived in Howrah........The difficulty arose from the simple

fact of its being an instition of old standing introduced into the country by the Mahomedans, encouraged by the Dutch and prized by the Portuguese, who were actively engaged with the Mugs in carrying off people of both sex forcibly. Their depredations were at their height during 1760—1770. During 1770 they came close to Howrah and the alarm was so great that an iron chain had to be thrown across the river to stop them.

কালক্রমে সব ব্যবসার মত দাস ব্যবসাতেও তেজীর পর মন্দা এল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৮৯ খ্রীঃ-এ এদেশ থেকে ক্রীতদাস রপ্তানী করা চলবে না বলে আইন জারী করেন। আইন করে ১৮১১ খ্রীঃ থেকে এদেশে ক্রীতদাস আমদানী করাও নিষিদ্ধ হয়। কেবল দেশের মধ্যেই এই ব্যবসা চালু থাকে। ১৮৩২ খ্রীঃ-এচালু হয় জেলা কর্ডনিং—দুই জেলার মধ্যে দাস কেনা-বেচা চলবে না। ১৮৪৩ খ্রীঃ-এ ঘোষণা করা হয়—অতঃপর দেওয়ানী আদালতে দাস-দাসীর উপর দাবী জানিয়ে আর নালিশ করা চলবে না। অবশেষে ১৮৬০ খ্রীঃ-এআইন করে ব্যবসাটিকে সম্পূর্ণরূপে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়।

ধর্মাচরণ

॥ চণ্ডী ও দুর্গা আরাধনা ॥

আদিতে কি ছিল সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে মধ্যযুগে সবদেশের মানুষের কার্যকলাপই যে ছিল ধর্মকেন্দ্রিক তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বৈদিক ধর্মাচরণকে লৌকিক আচার-আচরণের মধ্যে মিশিয়ে আমাদের শাস্ত্রকারেরা এমন সব বিধান তৈরী করলেন যে তার মধ্যে নির্বিবাদে ঢুকে গেল—স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি —এমন আরও কত কি। বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—দূর্গাপূজা যেটি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবের যোগ্যতা অর্জন করেছে সে সম্পর্কে দু'একটি কথা বললেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। তবে দূর্গার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে চণ্ডী সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

দূর্গাপূজা দশপ্রহরণধারিণী রিপুদলবারিণীর পূজা। বাংলার শক্তি আরাধনা কিন্তু আরও প্রাচীন। অতীতে শক্তি আরাধনা চণ্ডীপূজা নামেই চলিত ছিল। এর একটা কারণ এই হতে পারে—হাওড়ায় আর্যবসতি বিস্তারের আগে যে আর্যেতর জাতি এ অঞ্চলে বাস করত চণ্ডী ছিলেন তাদের আরাধ্যা দেবী। আর্যেরা এ অঞ্চলে আসার পর চণ্ডীদেবী তাঁদের কাছ থেকেও পূজা পেতে শুরু করেন। এক এক জায়গায় চণ্ডীর এক এক নাম

কালীঘাটে কালীবন্দ, বেতোড়ে বেতাই।
পূরুটে ঠাকুর বন্দ, আমতায় মেলাই॥

বেতোড় যখন ছিল বন্দর বিশেষ তখন সন্নিহিত বেতবনের মধ্যে যে চণ্ডী পূজিত হতেন তিনি সাধারণের কাছে বেত্রচণ্ডীকা বা বেতাইচণ্ডী নামে পরিচিতা ছিলেন। বেতোড়ের বন্দর-সৌভাগ্য অস্ত গেলে ধনিক-বণিক কুল যখন তাঁকে ছেড়ে যান তখন থেকেই বেতাইচণ্ডী ঠাকুরাণীও এই এলাকা পরিত্যাগ করে প্রথমে আসেন শিবপুরে ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেনে, তারপর শিবপুরেরই দক্ষিণে জি. টি. রোডের পার্শ্ববর্তী বেতাইতলার বর্তমান মন্দিরে। শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে বেত্রচণ্ডীকার বিবরণ আছে।

আমতার মালাইচণ্ডী বা মেলাইচণ্ডীয় স্থান ত্যাগ করেছেন। দামোদর নদের অপর পারে জয়ন্তী গ্রাম থেকে এপারে মেলাইগ্রামে এসে উঠেছেন। জয়ন্তীগ্রামেই চণ্ডীদেবীর প্রথম আবির্ভাব। লৌকিক প্রবাদ—উন্মমত্ত শিবের স্কন্ধস্থিত সতীদেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হলে বাঁ-পায়ের মালাইচাকি এখানে পতিত হওয়ায় এই পীঠস্থানের উদ্ভব। বলাবাহুল্য এটি গল্পই। একান্নপীঠের যে পৌরাণিক তালিকা তাছে তার মধ্যে মেলাইচণ্ডীর নাম কিন্তু পাওয়া যায় না। তবে এটি যে একটি প্রাচীন শক্তিপীঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলে এঁর উল্লেখ আছে।

জয়ন্তীতে যখন দেবীর অধিষ্ঠান ছিল তখন পুরোহিত প্রত্যহ দামোদর পেরিয়ে (লৌকিক কাহিনী—কুমীরের পীঠে চেপে) ওপারে গিয়ে চণ্ডীর পূজা করে আসতেন। পরে স্বপ্নাদেস পেয়ে দেবীকে মেলাইগ্রামে নিয়ে আসা হয়। এ বিষয়ে যে কাহিনীটি

প্রচলিত আছে তা হল—দামোদর নদে কোন এক এক বণিকের নুণের নৌকা ডুবে যায়। বণিকের প্রার্থনায় চণ্ডীদেবী সন্তুষ্ট হন। দেবীর বরে নুনের নৌকা ফিরে পাওয়ায় বণিকের অর্থে মেলাইচণ্ডীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। এটি প্রায় ৩১৫ বছর আগের ঘটনা। অনেকে দাবি করেন যে মেলাইচণ্ডীর মন্দিরই এ জেলার সবচেয়ে পুরানো মন্দির।

স্বর্গত বারীন মৈত্র তাঁর 'যেতে যেতে' গ্রন্থে মেলাইচণ্ডী সম্পর্কে যা লিখেছেন সেটিও ভেবে দেখার মত। তাঁর মতে—আমতা মাহিষ্য প্রধান মেদিনীপুর জেলার সংলগ্ন থাকার ফলে প্রাচীনকাল থেকেই ঐ অঞ্চল মাহিষ্য ধীবর প্রভৃতির সংস্কৃতিতে পুষ্ট ছিল। আমতার চণ্ডীঠাকুরাণী সেই আর্যেতর সমাজের থেকে ক্রমশঃ সরতে সরতে নবকলেবরে ব্রাহ্মণ্য সমাজের হাতে আত্ম-সমর্পণ করেছেন।

ইছাপুর গ্রামের সৌমচণ্ডী মূর্তি অসুর নিধনকারিণী রুদ্রমূর্তি নয়। সৌম, শান্ত, বরাভয়দায়িনী করুণাময়ী মাতৃমূর্তি। প্রবাদ ব্যাসদেব ধ্যানে বসে এই মূর্তির দর্শন পান এবং এঁর পূজা-পদ্ধতি রচনা করেন।

মাকড়দহে সরস্বতী নদীর তীরে মাকড়চণ্ডীর অবস্থান। আমতার রসপুর গ্রামে পূজিতা—গড়চণ্ডী। কাসুন্দিয়ার ওলাইচণ্ডী মুসলমান ফকির প্রতিষ্ঠিত বেদীর ওপর পূজিতা। আরও অনেক চণ্ডীদেবীর আরাধনা হাওড়ায় প্রচলিত। যেমন—কল্যাণচণ্ডী

(তীরন্দাজদের আরাধ্যা), মাকালচণ্ডী (জেলেদের দেবী), সোমাই-চণ্ডী (পানচাষী ও ব্যবসায়ীদের দেবী)। এছাড়াও—ডাকাইচণ্ডী, বিরাইচণ্ডী, বীরকুলচণ্ডী প্রভৃতি। বস্তুত—হাওড়ার মত চণ্ডীপ্রীতি বা ভীতি অন্য কোন জেলায় দেখা যায় না। ভয়ে কি ভক্তিতে জানিনা কিছু কিছু স্থানে শীতলাদেবীকে বলা হয়—বসন্তচণ্ডী।

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের সিদ্ধান্ত—'চণ্ডী আদিতে অষ্ট্রিক বা দ্রাবিড়গোষ্ঠীর দেবী ' বেদের রুদ্র—বৌদ্ধ প্রভাবে শান্ত শিবমূর্তি পরিগ্রহ করেন। এর পরই মনসা, চণ্ডী এবং অন্নদামঙ্গলের মাতৃ-রূপিণী দেবীর প্রধান্য পরিলক্ষিত হয়। এবং শিব পরিবারের কর্তা হিসাবে গণ্য হতে থাকলেও সংসার উদাসীন বৃদ্ধ ব্যক্তিরূপেই চিত্রিত হতে থাকেন।

চণ্ডীপূজার প্রাচীনতা সত্বেও শরৎকালে শিবপত্নী দূর্গার আরাধনাও বাংলার অন্যান্য জেলার মত হাওড়াতেও বিস্তৃতি লাভ করে বহু প্রাচীনকাল থেকেই। অবশ্য কালীপূজাও বাংলাদেশে কম বিস্তৃতি লাভ করেনি! কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখে গেছেন—

যেখানেই বাঙালী / সেখানেই দলাদলি
যেখানেই দূর্গা-কালী / সেখানেই পাঁঠাবলি

কবির উক্তিটি বর্তমানকালে সর্বাংশে না হলেও অনেকাংশে সত্য। বাঙ্গালী দলাদলি ও দূর্গা-কালীকে না ভুললেও পাঁঠাবলির প্রচলন প্রায় রহিত করে এনেছে। এমন এক সময় ছিল যখন বলি ছাড়া শক্তি পূজাই হত না।

অতীতে দুর্গা ছিলেন কেবলমাত্র রাজা, মহারাজা, ধনিক, বণিকগৃহে পূজিতা। যে সব কারণে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উদ্ভূত হয়ে শারদীয় দুর্গাপূজা বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবে পরিণত হয় তার মধ্যে দুটি মুখ্য কারণ ছিল। একটি—মানবিক, অপরটি—অর্থনৈতিক। দেবী দুর্গা শুধু একা পূজিতা হননা, সঙ্গে থাকেন পুত্র-কন্যাগণ। এটিকে বাঙালী পারিবারিক চিত্রের প্রতিচ্ছবি বললে অত্যুক্তি হয় না। পূজায় অর্থনৈতিক দিক ব্যতীত একটি সামাজিক দিকও আছে। এই পূজায় সমাজের সর্বস্তরের লোক অংশ গ্রহণ করে। অর্থও পায়। দুর্গাপূজার আয়োজন করতে হলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে বেশ্যাদ্বার পর্যন্ত দৌড়তে হয়। কামার, কুমোর, জেলে, মালী প্রভৃতি সমাজ বন্ধুরাও অবশ্য প্রয়োজনীয়।

এই জেলার আন্দুল রাজবাড়ীর একটি প্রথা ছিল—বিজয়া দশমীর দিন স্থানীয় তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও প্রতিমা বরণের জন্য আমন্ত্রিত হত। অনুমান, বাংলায় আর্যবসতি বিস্তারের প্রথম যুগে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের (আর্যেতর) লোকেদের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল থাকাতেই প্রথাটির উদ্ভব। গ্রামের অবস্থাপন্ন যে সব লোক দুর্গাপূজার প্রবর্তন করতেন তাঁরা মালী, কামার, কুমোর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেদের চাষবাসের জন্য জমি দিয়ে রাখতেন যাতে পূজার সময় তারা জিনিস বা শ্রম দেয়।

রাষ্ট্র যখন ছিল কেবলমাত্র পুলিশীরাষ্ট্র—কল্যাণকর রাষ্ট্র

নয়—তখন কেন্দ্রীভূত সম্পদের সুষ্ঠু না হলেও কিছুটা সমাজের সকলের মধ্যে বণ্টন করার জন্য আমাদের শাস্ত্রকারেরা যেভাবে দুর্গাপূজার বিধান দিয়ে গেছেন তাতে ধনবণ্টন বিষয়ে তাঁদের সমাজ-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা না করে উপায় নেই।

সমাজের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এখন যেমন জন্মদিন বা বিবাহ-বার্ষিকীতে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিগত উৎসবে হোটেলে বা বাড়ীতে 'পার্টি' দিয়ে নাম কিনতে চান, পাশ্চাত্য প্রভাবমুগ্ধ হবার আগে এদেশে নাম প্রচারের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ছিল বাড়ীতে বারমাসে তের পার্বণ করা ও সেই উপলক্ষে আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে খাওয়ান। পার্বণগুলির মধ্যে দুর্গাপূজা যখন শ্রেষ্ঠপূজা হিসাবে গণ্য হতে শুরু করল তখন ব্যয়-বাহুল্যের জন্য সকলে এর অনুষ্ঠান করতে পারত না। কেননা তখনও বারোয়ারী পূজার (সার্বজনীন) প্রচলন হয়নি।

গ্রাম হাওড়ায় প্রায় ৩০০ বছরের পুরাণো কয়েকটি পূজার সন্ধান পাওয়া যায়। উদয়নারায়ণপুর গ্রামের বিনোদবাটী নামাঙ্কিত মুখোপাধ্যায় বাড়ীর দুর্গাপূজা তার মধ্যে একটি। এখানের পূজার বৈশিষ্ট হল—গৃহস্বামী মুখোপাধ্যায়রা নিজেই পূজা করেন। বিনোদবাটী থেকে প্রায় দু'মাইল দূরের শিবপুর গ্রামের (শিংটী শিবপুর) গাঙ্গুলী বাড়ীর পূজায় এখনও বলি হয়। এই শাক্তবাড়ীর এক পুত্র শৈব আরাধনায় আকৃষ্ট হয়ে তারকেশ্বরের পূজায় ব্রতী হন। শিংটী শিবপুরের চক্রবর্তীবাড়ীর কাষ্ঠনির্মিত জয়চণ্ডী-দুর্গার

পূজাও বহুদিনের পুরাতন। এঁদের প্রতিমার বিসর্জন হয় না।

আমতা থানার গাজিপুর গ্রামের বন্দোপাধ্যায় বাড়ীর দুর্গাপূজাও প্রায় পাঁচ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন পূজা। অবশ্য এই পূজার শুরু এঁদের হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামের আদি বাসস্থানে। তবে এঁদের হাওড়ায় বসবাসও শতাধিক বৎসরের অধিক। এঁদের প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হল—মাত্র মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির পূজা হয়—সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি থাকে না।

বালীর বুড়িমার আটচালায় দেবী দুর্গাই বুড়ীমা নামে পূজিতা হন। দেবী সিংহবাহিনী বটে তবে সিংহের শরীরে ঘোড়ার মুখ। জনশ্রুতি তিন-চারশো বছর আগে নদীয়ার স্বনামখ্যাত পণ্ডিত রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কারকে মুঘল দরবার থেকে বালী গ্রামের চৈতল-পাড়ায় ২৮০ বিঘা জমি দান করায় পণ্ডিত মশাই এখানেই স্থায়ী-ভাবে বসবাস করতে থাকেন। এই বংশেব রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য (চট্টোপাধ্যায়) আটটি চালা তৈরী করে টোল প্রতিষ্ঠা করেন ও দুর্গাপূজার প্রবর্তন কবেন। পূজায় পাঁঠা বলিও হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ পূজাটিকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন দুর্গোৎসব বলে দাবী করেন।

হাওড়া শহরের পূজাগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী ৺বটকৃষ্ণ পালের পৈত্রিক বাড়ী (শিবপুরের প্রাক্তন ট্রামডিপোর নিকট) দুর্গাপূজায় এখনও মোষ বলি হয়। এবাড়ীর দুর্গার নাম অভয়া—যাঁর হাত মাত্র দুটি। শিবপুর সালকিয়ার কয়েকটি বাড়ীর

পূজায় এখনও পাঁঠাবলির প্রচলন আছে।

১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের সিদ্ধান্ত অনুসারে বেলুড়-মঠে প্রথম দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজারী ছিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল, তন্ত্রধারক স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। পূজার নয় মাস পরেই স্বামীজির মহাপ্রয়াণ ঘটে।

বাংলায় সার্বজনীন পূজা শুরুর বছর দুই-তিনেব মধ্যেই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ায় সার্বজনীন দুর্গাপূজা হয় রামাচরণ কুণ্ডু'র নরসিংহ দত্ত রোডস্থ উদ্যানে যার উদ্যোক্তা ছিলেন হরেন্দ্রনাথ ঘোষের নেতৃত্বাধীন হাওড়া সেবা সংঘ। পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ৩৬ দিন ব্যাপী প্রদর্শনীটির উদ্বোধক ছিলেন শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তা।

পূজা উপলক্ষে গ্রামের সকলকে পেট ভরা প্রসাদ বিতরণের প্রথা আজ আর নাই। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বদলের ফলেই প্রথাটির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন একার অর্থে ও সামর্থ্যে পূজার পরিবর্তে বারোয়ারী পূজারই সংখ্যাধিক্য। মূর্তি নির্মাণে বৈচিত্র্য, মূর্তিগঠনের উপাদানে বৈচিত্র্য এবং বিচিত্র মণ্ডপ ও আলোক-সজ্জা বারোয়ারী পূজা-সমূহের অবদান।

প্রতিমা ও পূজায় বৈচিত্র্য

প্রচলিত দুর্গা মূর্তির পরিবর্তে অনেক জায়গায় শুধু শিব-দুর্গা, কোথাও বা দশ-মহাবিদ্যা মূর্তিও দুর্গাপূজার বিধানে পূজিতা হন। মাটির পরিবর্তে কেউ বাঁশের, কেউ তুষের কেউ বা ধানের শীষের

বা অন্য কোন উপাদানে মূর্তি গড়েন। আগে স-পুত্র-কন্যা দেবী দুর্গার মূর্তি একটি চালচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের যুগে আজ প্রত্যেকের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে।

রসপুরের রায় পরিবারের আদি পুরুষ যশশ্চন্দ্র শেরশা'র সমসাময়িক, তাঁর প্রবর্তিত দুর্গাপূজায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর সংস্থান কার্ত্তিক-গণেশের নীচেয়। ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে প্রায় ১৬৫ বছর আগে ঝিকিরা গ্রামে আসেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টাচার্য্য পরিবার। আদি বাসস্থানের ধারা অনুযায়ী এঁদেরও বাড়ীর প্রতিমায় লক্ষ্মীর নীচেয় কার্তিক এবং সরস্বতীর নীচেয় গণেশের অবস্থান। এঁদের মতে পদ্ধতিটির নাম "জ্ঞান সিদ্ধ"। জ্ঞান বা সরস্বতীর নিচেয় সিদ্ধি বা গণেশের স্থান। রাউতারা গ্রামের ঘোষ পরিবার জাতিতে কায়স্থ হ'লেও একসময় নিজেরাই নিজেদের দুর্গাপূজায় পৌরহিত্যকরতেন। তাই এ-বাড়ীর পূজাতে শালগ্রাম শিলা [নারায়ণ] থাকেন না এবং চণ্ডীপাঠ হয় না। বর্তমানে ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হ'লেও এখনও নিজেরাই ঘট স্নান করিয়ে এনে মণ্ডপ পর্য্যন্ত পৌঁছে দেন। এঁদের প্রতিমার চালচিত্রে থাকে কেবলমাত্র চামুণ্ডা মূর্তি। লক্ষ্মী-সরস্বতীর অবস্থান কার্ত্তিক-গণেশের নীচে।

১৯৭৬-এ হাওড়ায় যে ক'টি দুর্গাপূজা হয়েছে তারমধ্যে কদমতলা চিত্তরঞ্জন স্মৃতি মন্দিরের শোলার দুর্গা প্রতিমাটি হাওড়া নাগরিক কমিটির বিবেচনায় শিল্প নৈপুণ্যের বিচারে হাওড়ার মধ্যে

শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় প্রতিমা শিল্পী অম্বর সমাদ্দার ৫০১ টাকা পুরস্কার লাভ করেন।

শারদা গ্রামে শারদা পূজা নিষেধ

শারদা আমতা থানার কুশবেড়িয়া অঞ্চলের একটি গ্রাম। গ্রামে দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ। কারণ হিসাবে শ্রীমতী অভয়া ভট্টাচার্য্য জানাচ্ছেন—"গুরুজনদের মুখে শোনা—দশপ্রহরণ ধারিণী মা দুর্গা স্বয়ং এদেশে অধিষ্ঠিতা হন এবং স্বপ্নাদেশ হয়ে বলেছিলেন এদেশে কোনদিন দুর্গাপূজা করা চলবে না। সেই থেকে এই গ্রামের নাম শারদা এবং দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ হয়। আদেশ লঙ্ঘনকারী জনৈক ব্যক্তিকে দেবী সমুচিত শাস্তিও দিয়েছিলেন।" জেলায় আরও দু' একটি গ্রামের অধিবাসীদের বিশ্বাস তাদের গ্রামে দুর্গাপূজা করা অনুচিত। সার্বজনীন পূজা অবশ্য বর্তমানে এসব গ্রামে অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে। প্রজা সাধারণের দারিদ্র্যতা, প্রজারাও দুর্গাপূজা করে জমিদারদের সমকক্ষ খ্যাতি অর্জনে যাতে না করতে পারে সেজন্য ভূস্বামীদের নিষেধাজ্ঞা, কোথাও বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জমিদারের পূজাতে আপত্তি-ই মনে হয় উক্ত নিষেধবাণী'র জন্মদাতা।

কয়েকটি শক্তি পূজা

চণ্ডী ও দুর্গা ব্যতীত কালীপূজার প্রচলনও হাওড়ায় যথেষ্ট। থালোড়ের পুরাতন কালীমন্দিরটির ব্যয় নির্বাহার্থে আনুমানিক পাঁচশ বছর আগে রাজা কন্দর্প রায় প্রায় তিন'শ পঁয়ষট্টি বিঘা জমি

দান করেছিলেন। বেলুড় বাজারের কাছে জি. টি. রোডের ধারে রাণী কাত্যায়ণী ট্রাষ্ট পরিচালিত সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। নেতাজী সুভাষ রোডের উপর কালীবাবুর বাজারের কাছেও একটি সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির আছে। কাসুন্দিয়া শিবতলার কিছু দূরে ওলাবিবি তলা লেন ও হাজার হাত কালীতলা লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত হাজার হাত কালীর মন্দির। কলকাতার চোরবাগান নিবাসী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামীয় জনৈক ব্যক্তি আঃ ১৯১০ খ্রীঃ-এ গুরুর নির্দেশে তাঁর হাওড়ার জমিতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। শেষ জীবন তিনি মন্দিরের কাছেই কাটান। এখানে বৈশাখী পূর্ণিমায় উৎসব হয়। এখন থেকে আট পুরুষ আগে আত্মারাম মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিতা ভুবনেশ্বরী আজ বলুহাটি গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যুগ্ম-সিংহবাহিনী মূর্তিটি প্রায় দুর্গা প্রতিমার ন্যায়। লক্ষ্মী-সরস্বতীর ন্যায় দু'পাশে জয়া-বিজয়া, বৃষভ বাহন মহাদেব পৃথকভাবে অবস্থিত। দোল-পূর্ণিমার পূর্বদিন পূজারম্ভ, পরের দিন বিসর্জন। পূজায় ছাগ বলি হয়।

আমতা থানার রসপুর গ্রামে বিন্ধ্যবাসিনী পূজায় নবমীর দিন মোষ ও পাঁঠা বলি হয়। বলির পর কাটা মহিষ মুণ্ড নিয়ে চামুণ্ডা নৃত্য করা হয়, পূজার শুরু হয়েছিল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। বেলুড় শিবতলা বারোয়ারী কমিটির ব্যবস্থাপনায় ১৭৭ বছরের পুরাতন শ্রীশ্রীবিন্ধ্যবাসিনীর তিনদিনব্যাপী পূজা ও পনেরোদিনব্যাপী মেলা হয় গ্রীষ্ম ঋতুর শেষার্ধে কোন এক শনিবার। প্রবাদ ঘোড়াসুরের অত্যাচারে পীড়িত দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বিন্ধ্যবাসিনী

দেবীকে অসুর বধের জন্য পাঠান। দেবী কর্তৃক অসুর নিহত হলে দেবতারা নিয়ত দেবীর আরাধনা শুরু করেন। ইন্দ্র আনন্দে সু-বৃষ্টি দেওয়ায় বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হয়ে ওঠে, সু-বৃষ্টির আশায় পূজিতা বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনীর অনুকরণে তৈরী অষ্টভুজা দেবী মূর্তি সিংহের উপর উপবিষ্টা, দুই পাশে জয়া-বিজয়া এবং নীচেয় মহাদেব। যে কৃষি-জীবি-সম্প্রদায় বালীগ্রামের আদি বাসিন্দা নিঃসন্দেহে তারাই এই পূজার প্রবর্তক।

জনৈক সন্ন্যাসী কর্তৃক বাকসাড়া গ্রামে নবনারী পূজার প্রবর্তনের পর সাতঘড়া গ্রামে নবনারী পূজার [১৩১৩] সালে প্রচলন হওয়া সত্ত্বেও শেষোক্ত পূজাস্থানটি পুরাতন নবনারীতলা হিসাবে খ্যাত। নয়জন গোপনারীর বিচিত্র অঙ্গ সংস্থাপনে সৃষ্ট অবিকল একটি হস্তীদেহের উপর আসীন মূর্তিযুগল রাধাকৃষ্ণের। তাই এটিকে শক্তিপূজার অন্তর্গত করা ঠিক নয়—যদিও নাম নবনারী। গোকুল এবং মহাবলীপুরমে নবনারীর এই কুঞ্জর মূর্তি খোদিত আছে। নয়জন নারী হ'লেন শ্রীরাধা এবং তাঁর আট সখী ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী। জীর্ণ প্রথম মন্দিরটি ১৩৩২ সালের ১৮ই আশ্বিন যোগীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত এবং পরে নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সাতঘরার নবনারীর বার্ষিক পূজা শুরু হয় বৈশাখী পূর্ণিমায়। বাকসাড়া'র নবনারী ও ইছাপুরের সৌম্যচণ্ডীর পূজার শুরু অক্ষয় তৃতীয়ায়। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার দুই নবনারী, সৌম্যচণ্ডী

ও রামরাজার বিসর্জন একত্রে হয় রামকৃষ্ণপুর ঘাটে।

ডাকিনী পূজা হয় বাগনান থানার কল্যাণপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে ডাকিনীতলায়। একটি বাঁশ পুঁতে তার তলায় কিছু খৈ ঝুলিয়ে রেখে তার তলায় ডাকিনীর পূজা করা হয়। ১৬৬৩ খ্রীঃ-এ [১০৬৯ সালে] পাঁচলা গ্রামে মহাদেব চন্দ্র যে বাসন্তী পূজা শুরু করেন ষষ্ঠপুরুষে সেটি ৩৫, নবীন মুখার্জী লেন, শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়ে আজও পূজিতা হচ্ছেন।

রামরাজা পূজা

সাঁত্রাগাছির রামরাজাতলায় এবং বালীর রামনবমীতলায় রামচন্দ্রের মন্দির আছে।

বারেন্দ্রভূমি হ'তে আগত সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বাৎস্য গোত্রীয় চন্দ্রশেখর সান্যাল—কত বছর আগে নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত—সাঁত্রাগাছিতে বসবাস শুরু করেন। এঁরই গৃহদেবতা শ্রীরামচন্দ্র। জমিদরী ও চৌধুরী খেতাব পাবার পর এই বংশের অযোধ্যারাম চৌধুরী সাড়ম্বরে রামচন্দ্রের পূজা আরম্ভ করেন। এসব প্রায় দু'শো বছরেরও আগের কথা। প্রতিষ্ঠার সময় পুরোহিত ছিলেন হলধর ন্যায়রত্ন। এখন এটি বারোয়ারী পূজার রূপ নিয়েছে। পূজা আরম্ভ—চৈত্রমাসে রামনবমীর দিন, শেষ—শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার। শ্রাবণ মাস মলমাস হ'লে বিসর্জন আশ্বিনে। ২৩ ফুট উঁচু প্রতিমায় রামসীতা ব্যতীত আরও ২৪টি বিগ্রহ আছে।

অধ্যাপক দীপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অনিমা মুখোপাধ্যায়-দ্বয়ের মতে বহুপূর্বে রামরাজা বিজয়ার দিনে নিচের ছড়া গানটি গাওয়া হ'ত—

আহা মরি কি সভা হেরি সখের বাজারে
ধন্য ধন্য এই বারোয়ারী ঠিক যেন অযোধ্যা পুরী
সবাই বসে ব্রহ্মচারী, জপে রাম হরে।
দক্ষিণ হতে উলুবেড়ে, যত সব লোক আসে নৌকা চড়ে
রং মেখে সং নড়ে চড়ে, তুড়ুক সওযার ঠ্যাকার করে।
আহা মরি কি সভা হেরি সখের বাজারে।

গড়ভবানীপুর বাজারে কিছুকাল আগে থেকে রামচন্দ্রের বারোয়ারী পূজা শুরু হয়েছে। বালীর রামনবমীতলায় রামচন্দ্রের পূজার শুরু প্রায় দু'শো বছর আগে, নিত্য পূজিত এগারটি বিগ্রহের মধ্যে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মূর্তিগুলি অষ্টধাতুর। রামের অভিষেকের সময় হনুমান তের নদীর জল এনে রামকে স্নান করিয়েছিলেন। সেই ঘটনার স্মরণে রামনবমীর আগের দিনে হনুমানজীর মূর্তিটিকে পাল্কী করে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়। ফেরার সময় তের ভাঁড় জল নিয়ে আসা হয়। পরদিন সেই জলে রামের স্নান হয়। আগে এই স্নানের খবর পাওয়ার পর সাঁত্রাগাছিতে রামের পূজা ও মেলা শুরু হয়।

শিব ও পঞ্চানন্দ

দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। হাওড়ায় তিনি বহু জায়গায় পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দ নামে পূজিত।

অনেকের মতে পঞ্চানন্দ হলেন কোচ জাতীয় রমণীর গর্ভজাত শিবের পুত্র। ঘোড়ার পিঠে বসা উগ্রমূর্তি পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজার মন্ত্র : আদিত্য নিরঞ্জন নৈরাকার ন গ্রস্ত পঞ্চানন ধর্মায়ে নমঃ। পূজায় সর্বত্র ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করলেও উলুবেড়িয়ার জয়পুর গ্রামে পঞ্চানন্দের পূজারী হলেন জাতিতে বাগদী। হাওড়া ময়দানের নিকটবর্তী পঞ্চাননতলার নামকরণ পঞ্চানন্দের পূজাস্থল হিসাবেই।

হাওড়ার মধ্যে জয়পুর (আমতা), নার্না (ডোমজুড়), শশাটি (শ্যামপুর) প্রভৃতি জায়গার পঞ্চানন্দ পূজা বিখ্যাত। এখনও ছোট ছেলেমেয়েদের অসুখ করলে পঞ্চানন্দের পুরোহিতরা ঝাড়-ফুঁক করেন, তাবিচ-কবচ দেন। কোথাও বা এঁরা ওঝা রূপে বিষ নামান।

পঞ্চানন্দের পূজার সঙ্গে একদিকে তান্ত্রিকতা অপর দিকে নাথ যোগীদের নিরঞ্জন ধর্ম ঠাকুরের উপাসনা মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। ধ্যান, মন্ত্র, জপ ও ছড়ায় আরবী ফারসী শব্দের সমাবেশ ঘটেছে। বাউড়িয়াতে নাথ যোগীদের মঠে পূজা পান কালী ও শিব।

হুগলী জেলায় যেমন তারকেশ্বর, হাওড়ায় তেমনি কল্যাণেশ্বর। শিব-পুরাণ অনুসারে—রাঢ়ে চ তারকেশ্বর, গঙ্গাতীরে চ কল্যাণেশ্বর। কল্যাণেশ্বর শিবের সেবাইতের উপাধি ঘোষাল। প্রায় ৫০০ বছর আগে আলোচ্য শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ভাগ্নে হৃদয় ও গুরু তোতাপুরী:ক নিয়ে এই শিবমূর্তি দর্শন করেন ও পূজা করেন। আজও প্রতি সোমবার বেলুড় মঠের মহারাজগণ এই শিবের পূজাদিতে আসেন।

গড়ভবানীপুরে একটি শৈব মঠ আছে। পেঁড়ো থেকে মাইল চার দূরে কাটিশাকরা গ্রামে আকবরের আমলে রাজা রুদ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন· রুদ্রেশ্বর শিব। লালকিয়ায় শেঠ বংশীধর জালান স্মৃতি মন্দিরে বঙ্গেশ্বর শিবের অধিষ্ঠান ২০০১ সম্বৎ থেকে। প্রায় দেড়শো বছর আগে ওদং গ্রামবাসী মহেন্দ্র পোদ্দার নামীয় জনৈক সুবর্ণ বণিক কাশী থেকে একটি শিবলিঙ্গ নিয়ে এসে নিজ গ্রামে যাজনিক ব্রাহ্মণের অভাবে পার্শ্ববর্তী বেড়াবেড়ি গ্রামে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করেন।

হাওড়ার অনেকগুলি পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজারী ও সেবায়েত নাথ যোগীরা। এঁরা বেশ কিছু ধর্ম ঠাকুর, শীতলা. শিব ও কালী ঠাকুরেরও প্রতিষ্ঠাতা।

ধর্মপূজা

ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত লৌকিক কাহিনীটি হ'ল—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টির পর যখন সেটিকে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনে চিন্তা-মগ্ন তখন তাঁর দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করে আবির্ভূত হন ধর্মঠাকুর। পরে কোন সময়ে কোন কারণে নারায়ণের সংগে ধর্মঠাকুরের বিবাদ ঘটলে নারায়ণের অভিশাপে ধর্মঠাকুরের পূজারীরা হন অন্ত্যজ শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ।

এক সময় গাছের তলায় প্রস্তরমূর্তিতে ধর্মঠাকুরের পূজা যেখানে শুরু হয়েছিল কালক্রমে সেই জায়গাগুলিই ধর্মতলা নামে পরিচিত হ'তে থাকে। হাওড়াতে অনেক জায়গারই নাম ধর্মতলা। আদিতে ধর্মঠাকুরের পুরোহিতরা ছিলেন ডোম, পোদ বা বাগ্‌দী জাতীয়। বিষয়টির প্রতি কটাক্ষ করে এক সময় ছড়া বাঁধা হয়েছিল—

ধর্ম ঠাকুর যেটা, সেটা ফিরিঙ্গি না গোরা

বামুনের হাতে নেয় না পুজো, পূজারী তার ডোম ব্যাটারা।

পূজার উপকরণ ছিল—পচাই মদ, চাল ও দুধ। বলির জন্য নির্বাচিত হত - শূকর বা মুরগী। ক্রমে বলি বন্ধ হ'ল, পূজার উপকরণেও পরিবর্তন ঘটল। মন্দির তৈরী হ'ল এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হলেন। পূজার মন্ত্র ও পদ্ধতি হাকন্দ বা ময়ূরভট্ট, রূপরাম এবং ঘনরামের ধর্মমঙ্গল অনুসারে রচিত। পূজা সারা বছরই হয়, তবে জাঁকজমক দেখা যায় বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায়। অনেকে বলেন—ধর্ম ঠাকুরের মূর্তিবিহীন পূজা এবং বার্ষিক উৎসবের দিন—বুদ্ধের জন্মদিন—বৈশাখী পূর্ণিমা'তে নির্দিষ্ট হওয়াটি বৌদ্ধ প্রভাবের ফল। অনেক জায়গায় শীতলা বা পঞ্চানন্দের পুরোহিতদের মত, ধর্মঠাকুরের পুরোহিতরাও কোন কোন অসুখের ওষুধ দেন।

ধর্মঠাকুরকে সাধারণে এত আপন মনে করত যে, মানুষের পরিবর্তে তাঁকেই দলিলে ইসাদী বা সাক্ষী মেনেছেন। রসপুর নিবাসী শ্রীপাঁচুগোপাল রায় মহাশয় দু'টি দলিলের উল্লেখ করে

বলেন—প্রথম দলিলে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে আমতা থানার কলিকাতা গ্রামের শ্রীজগমোহন খাঁ প্রভৃতি "ইসাদ শ্রী৺ শ্রীশ্রীধর্মদেবতা" এবং দ্বিতীয় দলিলে রসপুর গ্রামের ১২৫১ বঙ্গাব্দের একটি কর্জ পত্রে "ইশাদ শ্রীশ্রীধর্মদেবতা" লিখিয়া ধর্মঠাকুরের প্রতি আস্থা দেখান। সত্যই "দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি।"

আরও কয়েকটি পূজা ও উপাসনা স্থল

দশনামীপুরী সম্প্রদায় কর্তৃক রামরাজাতলার সাবিত্রীপীঠস্থ শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠা তারিখ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমানন্দ পুরী স্বামী। শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তিটি শ্বেত পাথরের। জনশ্রুতি মঠ প্রতিষ্ঠার আগে এই জায়গায় রামপূজার প্রবর্তক চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ নাকি চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে মহাবীর জয়ন্তী উৎসব এবং কার্ত্তিকী কৃষ্ণা চতুদর্শীতে মহাবীর নির্বাণ উৎসবের অনুষ্ঠান করতেন। কাসুন্দিয়া এবং চক্রবেড়ের সংযোগস্থলে এক সিদ্ধপুরুষ তিব্বতী বাবার আশ্রম আছে। নিম্বার্ক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী—সংসার জীবনে যিনি তারাকিশোর রায় চৌধুরী এম, এ. বি. এল হিসাবে পরিচিত ও হাইকোর্টের উকিল ছিলেন—শালিমারের নিম্বার্ক আশ্রমের [১৩০৯] প্রতিষ্ঠাতা। উলুবেড়িয়ার নিকট বাণীবনে একটি ব্রাহ্ম মন্দির আছে। সাঁত্রাগাছিতে ১৮৫৭ খ্রী-এ একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮৬৪

খ্রী-এ বিলুপ্ত হয়। রামকৃষ্ণপুরের ব্রাহ্ম সমাজটির আয়ুষ্কাল ১৮৬১ খ্রীঃ থেকে ১৮৬৮ খ্রীঃ পর্যন্ত। বেলুড়ের মুখার্জী লেনে শিখ সম্প্রদায়ের একটি গুরুদ্বারা আছে।

সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিণরায় বাঘের দেবতা। হাওড়া শহরে এঁর আবির্ভাব কিভাবে বলা শক্ত। কারো মতে ইনি ছিলেন ভুরশুট রাজবংশের কোন পরাক্রান্ত নৃপতি, কেউ বলেন রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি। অর্থাৎ রাজা বা সেনাপতি যেই হোন না কেন বিশেষ কোন কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে দক্ষিণরায় কাল-ক্রমে দেবতায় পরিণত হয়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পূজা পাচ্ছেন। ২৬৬, নেতাজী সুভাষ রোডের মন্দিরটিতে শীতলা ও কালীর পাশে আছে নিত্য পুজিত দক্ষিণ রায়ের বাঘে চড়া মূর্তি। এছাড়া আছেন বরাঠাকুর, কালুরায়, ও বাঁকুড়া রায়। বাঁকুড়া রায়কে বাংলা কবিতায় শিবের পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাগনান থানার অন্তর্গত সাঁওতা গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে মনসা, জরৎকারু ও বাসুকীর সার্বজনীন পুজার সংগে জড়িত হয়ে আছে রাখাল বালক ও মনসার কাহিনী। রাখাল বালকেরা খেলার ছলে মনসা গাছে পূজা করাতেই মনসাদেবী সন্তুষ্ট হয়ে রাখালদের আশীর্বাদ করার ঘটনাটিই কাহিনীটির উপজীব্য। চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন নীলের অর্থাৎ মহাদেবের পূজা অনেক জায়গাতেই প্রচলিত আছে। ঐদিন বাগনান থানার বাঙ্গালপুর গ্রামে হর-পার্বতীর

বিবাহ অনুষ্ঠান ও কামিক্ষে পর্ব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের অংগ হিসাবে একটি মাছ কেটে তার রক্ত পূজার ঘটের জলের সংগে মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে ঐ জল একজন সন্ন্যাসীর মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হলে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। পাঁচলা-বাসুদেবপুরে মাঘী-পূর্ণিমায় নারায়ণের রথযাত্রা হয়। ছু-ঠাকুরের পূজা হয় কার্তিক মাসের সংক্রান্তি অথবা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবিবার। এঁকে কেউ বলেন সূর্যদেব, কেউ দুর্গা। বালীর ৫, কে, পি, কুমার স্ট্রীটস্থ শনি ঠাকুরের মন্দিরে দৈব ঔষুধ দেওয়া হয়। শনি ঠাকুরের মূর্তিটি লম্বায় দেড় ইঞ্চি, ওজনে ১৫০ গ্রাম, প্রতিষ্ঠাতা অরবিন্দ যশ। কোন ধাতু দিয়ে মূর্তিটি নির্মিত তা আজও নির্ণয় হয় নাই। আসল মূর্তিটি বার্ষিক পূজার দিন ব্যতীত সব সময় ঘটের জলে ডোবান থাকে। নিত্য পূজা হয় একটি পাথরের মূর্তিতে। সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ পূজা হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয় প্রচেষ্টার সুন্দর নিদর্শন। সত্যনারায়ণের ব্রত কথায় আছে—'পুরাণ-কোরাণ কিছু নহে মতান্তর' এবং 'যেই রাম সেই রহিম নাম একই হয়, ত্রি-ভুবনে নাহিক দুই জানিবে নিশ্চয়'। সত্যনারায়ণ পাঁচালীকারদের মধ্যে দু-জন সমধিক প্রসিদ্ধ—শঙ্করাচার্য ও রামেশ্বর। রামেশ্বরের সাকিম—বরদাবাটি, যদুপুর গ্রাম। গ্রামটি বাগনান থানার নবাসন গ্রামের সন্নিকটস্থ। জি. টি. রোড ও শিবপুর রোডের সংযোগস্থলে পূজা পান পীরবাবা। ওলাবিবির

পূজায় প্রচলনও হাওড়ায় যথেষ্ট। এগুলি হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-সমন্বয়ের উদাহরণ।

হাওড়া শহরে জন্মাষ্টমী উৎসব প্রতিপালিত হয় হাওড়া টাউন হলে, ১৯৩০ খ্রীঃ থেকে ১৯, এম, সি, ঘোষ লেনে ডাঃ পুলিন বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে তাঁদের নিজ বাটীতে এবং আরও কয়েকটি জায়গায়।

মসজিদ ও মাজার

জগৎবল্লভপুর থানার ঝিংরা গ্রামের মসজিদটির নির্মাণকাল ১৮৫৬ বা ৫৭ খ্রীঃ, নির্মাতা হুগলীর এককালীন জেলা শাসক দবীরুদ্দিন ম্যাজিষ্ট্রেট। হাওড়ায় অনেকগুলি মসজিদ আছে—যেখানে পৌষ সংক্রান্তিতে বা ১লা মাঘ মেলা বসে। মসজিদগুলির মধ্যে বলুহাটি গ্রামের দু'মাইল দক্ষিণে পীর গয়েসউদ্দিনের নামাঙ্কিত মসজিদ ও মুন্সীডাঙ্গার জুম্মা মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য। উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত বানীবনের জঙ্গল পীরতলায় আছে জঙ্গল পীরসাহেবের আস্তানা। কবি ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গলে জঙ্গলপীরের উল্লেখ আছে। অনুমান-একটি পরিত্যক্ত মন্দিরই এখানে মসজিদে রূপান্তরিত হয়েছে। বীরশিবপুরের কাছে কানসোনা গ্রামে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা ও পুকুর আছে। রোগমুক্তির আশায় সব সম্প্রদায়েরই লোকই এই পুকুরে স্নান করেন।

ইরাণ দেশের অধিবাসী মানিকপীর হাওড়ায় পশু সম্পদ রক্ষকরূপে কল্পিত হ'য়ে লৌকিক পীরে পরিণত হয়েছেন। মানিকপীরের আশীর্বাদে গরু-ছাগলের মড়ক হবে না ও দুধ বেশী হ'বে এই বিশ্বাসে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভক্তগণ পীরের নজরগাহ বা থানে গরুর প্রথম দুধ নিবেদন করেন, পীরের নামে সিরণী ও সন্ধ্যায় ধূপ দেন। নজরগাহগুলির সেবাইত [খাদেম] গণ সাধারণতঃ মুসলমান ফকির। মানিকপীরের নজরগাহগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হ'ল সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত মানিকপুরেরটি, এটির অবস্থান গঙ্গার পশ্চিম তীরে ডেল্টা জুট মিলের কিছু দক্ষিণে। উরস উৎসবের সময় এখানে কাঁওয়ালী, গজল ও ধর্ম সভার আসর বসে। নজরগাহটির বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক বিখ্যাত ইট ব্যবসায়ী সেখ ব্রাদার্স। পাঁচলা থানার অন্তর্গত মানিকপীর গ্রামে নজরগাহের ভিতর পীরের কল্পিত কবর আছে। বছর কুড়ি আগেও এখানে জাত বা মেলা বসত। হাওড়া—উলুবেড়িয়া এবং হাওড়া—আমতা বাস রুটে খাঁপাড়া ষ্টপেজের কাছে সন্ধিপুর বাজারের অনতিদূরেই আছে একটি মানিকপীরের থান। সাঁকরাইল থানার মির্ধা পাড়ায় মানিকপীরের দরগায় মাটির ঘোড়া উৎসর্গ করা হয়। প্রবাদ অতীতে এখানে জ্যান্ত ঘোড়াই উৎসর্গ করা হত। ডোমজুর থানার প্রসস্ত গ্রামে, মানিকপীরের সমাধির প্রতীক একটি ক্ষুদ্রস্তুপ দেখা যায়।

মানিকপীরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক পাঁচালী রচয়িতাগণের মধ্যে আছে মুন্সী মহম্মদ পিজিরদ্দিন, ফকির মহম্মদ, জয়রদ্দিন ও আরো

অনেকে। পাঁচালীগায়কগণ মূলতঃ ফকির সম্প্রদায়ের। তাঁরা মানিকপীরের গীত গেয়ে ভিক্ষা করেন, কেউ কেউ মাদুলি ও তাবিজ দেন। মুন্‌শী মহম্মদ পিজিরদ্দিনের মানিকপীরের কেচ্ছা নামক পাঁচালীর কয়েকটি পংক্তি—

এলাহি চাহা কামরদ্দিন সাহা
যে ছুরাত গোজারিল
আল্লার দোয়ায় দুই লেড়কা হয়
শাহ কামরদ্দিন ঘরে
গঞ্জ মানিক নাম দিছে ছোবহান
বাড়ে তারা দিনে দিনে।

বালির দেওয়ান গাজীপীরের আস্তানায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সমবেত হ'ন।

হিন্দু প্রতিষ্ঠিত মানিকপীরের দরগা

দরগার মাথায় স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে—

"মানিকপীর ভরসা, সন ১২০৪ সালে তপস্বী বাঞ্ছারাম রায়ের স্বনামধন্য পুত্র স্বর্গীয় রামজয় রায় স্থাপিত দরগা তদীয় বংশধরগণ কর্তৃক সংস্কার হইল। সন ১৩৫৬ সাল ২রা বৈশাখ"।

প্রয়ে ১৮২ বছর আগে ১২.০৪ সালে [ইং ১৭৯৭] বাংলার ধর্মীয় আন্দোলনের যুগ-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায়ের বয়স যখন মাত্র ২৫, তখন হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির নজীর

হিস'বে উল্লেখ করার মত কীর্তি রেখে গেছেন আমতা থানার রাউতাংা গ্রামের কেরানী বাটীর প্রতিষ্ঠাতা রামজয় রায়। সেই পীরের দরগার সংস্কার সাধন করে তাঁর বংশধরেরা আজও ধর্ম-নিরপেক্ষতার যে ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন তা হাওড়ার গর্ব।

দো-চালা রীতিতে তৈরী বেতাই বন্দর—ঝিকিরা বাস রাস্তার ধারে ঝিকিরার আ'গর বড় গ্রাম রাউতারার মানিকপীরের দরগার প্রধান বাৎসরিক উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ২রা বৈশাখ। সেই সময় এখানে একটি মেলাও বসে। উৎসবটির নাম সয়লা। রামজয় কেরানী শুধু দরগাই প্রতিষ্ঠা করেননি, এটির পরিচালন ব্যয় নির্বহার্থ বেশ কিছু জমিও বরাদ্দ করে গেছেন।

গীর্জা

আমাদের শেষ বিদেশী প্রভুগণ তাঁদের প্রভুকে ভজনার জন্য হাওড়ায় বেশ কিছু উপাসনালয় স্থাপন করেন। ১৮২০ খ্রীঃ-এ টুলহ্যাম সাহেব হাওড়ায় যে চার্চটি তৈরী করান সে জায়গাটি রেলের দখলে চলে গেলে চার্চটির বিলুপ্তি ঘটে। ১৮৩১ খ্রীঃ-এ কুলেন প্লেসে [বর্তমানে মুখরাম কানোরিয়া রোড] পল, ডি, গ্রাডোলির উদ্যোগে একটি ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠা হয়। চার্চটি তৈরী করতে খরচ হয়েছিল ৪০০০০ টাকা, যার অধিকাংশই দিয়েছিল কলকাতার তৎকালীন পর্তুগীজরা। ১৮৩২ খ্রীঃ-এ চার্চটির নূতন নামকরণ হয়—চার্চ অফ আওয়ার লেডী অফ

ছাপী ভয়েজ। ১৮৩১ খ্রীঃ-এ বিশপস্ কলেজ প্রাঙ্গনে সরকার প্রদত্ত পাঁচবিঘা জমির উপর গথিক স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের প্রথম গীর্জাটির স্থপতি উইলিয়াম জোন্স। উনবিংশ শতকের শুরুতে দি মিশন অফ দি সোসাইটি ফর দি প্রোপাগেশন অফ দি গস্পেল খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করার পর দু'জন ব্রাহ্মণ মহিলা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ-এ বালীগ্রামের জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে রেভারেণ্ড ফিলিপ গাঙ্গুলী হয়ে সমুদ্র পারে গিয়েও যে হাওড়ার কথা ভুলতে পারেননি তা তাঁর Life and Religion of the Hindoos with a sketch of my life exprience গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। ত, চার্চ রোডের সেন্ট টমাস চার্চ স্কুল কর্তৃপক্ষের সন্দেহ-সম্ভবত হাওড়া শহরের মাটিতে সেন্ট টমাস চার্চ-টিই বর্তমানে সবচেয়ে প্রাচীন ইমারৎ। এটির নির্মাণকাল ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ। অবশ্য ১৭, মৌলানা আবুলকালাম আজাদ রোডস্থ হাওড়া ব্যাপটিষ্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা বৎসরও ১৮২৬ খ্রীঃ বলে দাবী করা হয়।

জৈন মন্দির

বালীর ১° নং জটিয়া রোডে একটি দিগম্বর জৈন মন্দির আছে। লিলুয়ায় সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে একটি শ্বেতাম্বর মন্দির।

মন্দির

আমাদের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় মন্দির

গাত্রে ও দেবমূর্তি নির্মাণে। হাওড়ায় যে কয়টি পুরাতন মন্দির—বর্তমানে ব্যবহৃত অথবা পরিত্যক্ত আছে সেগুলির অধিকাংশই আটচালা ধাঁচের, দু-একটি চারচালা অথবা নবরত্ন। টেরাকো'টা [পোড়ামাটির] কাজের নিদর্শন প্রচুর। পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি সংগ্রহশালা এবং নবাসনের আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালায় টেরা-কোটা কাজের নিদর্শন সংরক্ষিত আছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত ১২টি দেবালয়ের তালিকায় দেখা যায় ৬টি শিবের, ১টি ধর্মের, ৩টি গোপাল, কৃষ্ণ বা শ্যামসুন্দরের, ১টি চণ্ডীর এবং ১টি ভুবনেশ্বরীর। মন্দির ও সেগুলির প্রতিষ্ঠা বৎসর হ'ল—

(১) আমতার মেলাইচণ্ডী (১৬৪৯) প্রবাদ-সতীর বাঁ-পায়ের মালাইচাকি এখানে পড়েছিল। (২) মেল্লকের মদন গোপাল জীউ (১৬৫১)' (৩) সুলতানপুরের ঘটিয়ালশিব (১৬৬৫)। (৪) মহিষামুড়ির ভুবনেশ্বরী (১৬৭৯) (৫) খড়িয়পের খজোশ্বর শিব (১৬৮১)। (৬) গড় ভবানীপুরের মণিনাথ শিব (১৬৮৪)। (৭) জয়পুরের মতিলাল ধর্ম্মরাজ (১৬৮৫)। (৮) খালনার কৃষ্ণরায় জীউ (১৬৮৫) (৯) ঝিকিরায় শ্যামসুন্দর জীউ (১৬৯১)। (১০) কল্যাণচকের রামেশ্বর শিব (১৬৯২)। (১১) বরইপুরের রঘুনাথ শিব (১৬৯৪)। (১২) গাজীপুরের পরিত্যক্ত শিব মন্দির (১৬৯৫)।

হাওড়ার পুরাকীর্ত্তির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীতারাপদ সাঁতরা মহাশয় কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সিদ্ধান্তগুলি হল জেলার সাধারণ ধর্ম মত, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাণকারীদের উপজীবিকা, বাসস্থান এবং মন্দির নির্মাণের উপাদান সম্পর্কে। জেলায় মহাযানী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের শাসন প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় না; পক্ষান্তরে নাথ জৈনদের প্রভাব লক্ষণীয়। হাওড়ায় মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের বৃহৎ অংশই ছিলেন জমির উপস্বত্বভোগী অথবা ব্যবসায়ী ধনিক সম্প্রদায়, অল্প অংশ পূজারী, পুরোহিত প্রভৃতি। সীমিত বিত্তের অধিকারী ছিলেন বলে মন্দির গুলির মধ্যে টেরাকেটা কাজের নিদর্শন অপ্রচুর—২৩৪টি মন্দিরের মধ্যে মাত্র ৬৮টিতে—অবশিষ্টগুলি চূণ বালির পলস্তারাবৃত। কতকটা বাদামী রঙের জোংড়া শামুক পুড়িয়ে চূণ তৈরী করে সেই অর্দ্ধতরল চূণের সংগে কলি মিশিয়ে ঠাকুরবাড়ী এবং বসতবাড়ী অলংকৃত করার প্রথা আঠারো থেকে বিশ শতকের প্রথমদিক পর্য্যন্ত দেখা যায়। পঙ্খের কাজের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন দেখা যায় প্রায় তিনশ বছর আগে তৈরী গড় ভবানীপুরের মণিনাথ শিবমন্দিরে। কারিগররা ছিলেন প্রধানত সূত্রধর বা মিস্ত্রী সম্প্রদায়ের, পদবী চন্দ্র, রাম, দে, সেন, দাস, মাইতি, রক্ষিত ইত্যাদি। অধিকাংশের বাসস্থান—থলে, রাউতারা, ঝিখিরা, রায়চক, ভোজান, কেশবপুর, ক্ষেমপুর, বিনোলা, কৃষ্ণবাটি, নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি গ্রাম।

কয়েকটি গ্রামীণ মন্দিরের কথা

অমড়াগড়ি—এখানের গজলক্ষ্মী মন্দিরটির [১৭২৯ খ্রীঃ] দেওয়ালে কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণের চিত্রাদি লক্ষণীয়। দধিমাধবের মন্দিরটি শিকার ও লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্যাদি দ্বারা অলংকৃত। উভয় মন্দিরেই আজ ভগ্নাবস্থা।

আসণ্ডা—১৭৭৭-এ নির্মিত শ্রীধরের বিরাট নবরত্ন মন্দির গাত্রে লঙ্কাযুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত আছে। ভগ্ন মন্দিরেও নিত্য নারায়ণ-শিলা পূজিতা হ'ন।

কল্যাণপুর—নবরত্ন ধাঁচের দামোদর [১৭৮৬] এবং পুরাতন কালীমন্দির আছে।

গাজীপুর—ভুবনেশ্বরী মন্দির [১৬৮৯] গাত্রে কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণের চিত্র দৃশ্যমান।

গড়ভবানীপুর—গ্রামটির পশ্চিমাংশে বিলুপ্ত রাজৈশ্বর্য্যের সাক্ষ্য দিতে ভগ্ন অবস্থায় ইঁটের দোতলা মন্দিরটির কিছু অংশ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরটি নবরত্ন ধাঁচের ও টেরাকোটা কাজ সমন্বিত পশ্চিমবঙ্গে ইঁটের তৈরী এরূপ বিশাল মন্দির বিরল। অনুমান সেজন্যই উঁচু কিছুর উপমা দেবার জন্য "উঁচু যেন পেঁড়োর মন্দির" এই প্রবাদ বাক্যটির সৃষ্টি হয়েছে।

দোতলা মন্দিরটির একতলায় ছিল, চতুর্ভুজ গণেশ, দ্বিভুজা ইন্দ্রাণী, দ্বিভুজা অভয়া, চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী, দশভুজা দুর্গা,

গঙ্গাধর শিব, গোপাল, গোপীনাথ, দামোদর (চক্র), রাধিকা ও কাশীনাথ শিব। ভবানীপুরের বাজারের পিছনে আছে মণিনাথ শিবের মন্দির। ভুরশুট—রাজ নরনারায়ণ মন্দিরের সেবাকার্য্যের জন্য যে ১০১ বিঘা জমিদান করেন, তার হিসাবটি হল—গড়-ভবানীপুর সহস্তবাটী—১০, সোনাতুলা—২৷৷, আড়গড়ি—৪৷৷, অহল্যাবিধিচন্দ্রপুর—১৫, চাঁপাডাঙ্গা—৩২, সহরা—৩, কোঙর-চক—৬, কানুপ'ট—৬৷৷, প্রতাপনারায়ণপুর দক্ষিণ—২, হায়াত-পুর—৮, খাদানি—১৪, চুণীহিট—৮, এবং দিগবাই—২ বিঘা।

জগৎবল্লভপুর—পাল পরিবারের আটচালা শিবমন্দিরটির নির্মাণ সময়—১৬৮৪ খ্রীঃ। প্রায় ৬০০ গজ দূরে আর একটি শিব মন্দির আছে। নিকটেই আছে ১৮৯২ খ্রীঃ-এ নির্মিত মহেন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দির। সেন বাড়ীর হর-গৌরী মন্দিরটির গঠন কুটীরের ন্যায়। বর্তমানে বিগ্রহদ্বয় অপহৃত। রথের আকৃতি বিশিষ্ট আর একটি মন্দিরেও কোন বিগ্রহ নাই। এই থানার উত্তর গোবিন্দপুর গ্রামে আঃ ১৭০০ খ্রীঃ-এ হরনাথ বসু নির্মিত ৭০ ফুট উঁচু শিব মন্দিরের চূড়া পাঁচটি, আদিতে নাকি নয়টি ছিল, পরে চারটি ভেঙে ফেলা হয়।

জয়পুর—টেরাকোটা কাজ সমৃদ্ধ মতিলাল ধর্মের মন্দিরের নির্মাণকাল ১৬৪৮ খ্রীঃ। জয়চণ্ডীতলার শ্রীধরের মন্দির তৈরী হয়েছিল ১৭৮২ খ্রীঃ-এ। ১৭০৫-এ কালীরাম রায় তৈরী করেছিলেন দোতলা লক্ষ্মী-জনার্দ্দন মন্দির।

দেউলপুর—হয়ত কোন সময় বহু দেব দেউলের অস্তিত্ব হেতু গ্রামটির নাম হয়েছে দেউলপুর। প্রায় একশ বছর আগে সিংহবাহিনী দেবীর ভোগ মন্দিরসহ পাকা মন্দিরটি বর্ধমান রাজের অনুকুল্যে নির্মিত হয়। দেবীর মূর্তি দারু নির্মিত। পশ্চিম-পাড়ায় আছে—জটিরাম ঘোষ [১২৫০ সাল] নির্মিত টেরাকোটা কাজ সমৃদ্ধ তিনথাক ছাদ যুক্ত বারোচালা ইঁটের তৈরী শিব মন্দির। এ-ধরণের মন্দির পশ্চিম বাংলায় খুবই বিরল।

নিজবালিয়া—জগৎবল্লভপুর থানার এই গ্রামে আছে প্রায় বারশ বছরের পুরাণো সিংহবাহিনীর মন্দির। দেবীর মন্দিরের উঃ পূর্বে বাবা পিপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

বালটিকুরী—১৩২৩ সালে এখানের সদানন্দ মঠটি নির্মিত হয়।

বাগনান [মেল্লক]—জেলার সর্ব পুরাতন পূজিত মন্দিরটি হল বাগনানের [মেল্লক] মদন গোপালের বিরাটাকৃতি মন্দিরটি। রামায়ণে বর্ণিত রাম-মারীচ কাহিনীটি টেরাকোটা কাজের মাধ্যমে মন্দির গাত্রে চিত্রিত আছে।

রতনপুর—শ্যামপুর থানার রতনপুর গ্রামে ভৈরব মহাকালের উপর দণ্ডায়মানা দ্বিভুজা রতনমালা দেবীর। মন্দিরটির চাল টালির চৈত্র সংক্রান্তিতে রতনমালা দেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে গাজন হয়। সেদিন গ্রামস্থ অন্য একটি শিবমন্দিরেও গাজন হয়। কথিত আছে—শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্য যাত্রাকালে দেবীদর্শন

করেছিলেন। তখন দামোদর নদের প্রবাহ পথ ছিল মন্দিরের পূর্বদিকে, এখন নদী ত্বু'মাইল দূরে।

রায়তুরা—ঘোষ পরিবারের আটচালা সীতারাম মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৭০০ খ্রীঃ। মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণলীলা ও সপ্তদশ শতকের সামাজিক চিত্র অঙ্কিত আছে। কেরানী বাটীর আটচালা দামোদর মন্দিরে (১৭১৬ খ্রীঃ) মূর্ত্তি নাই, ঘটে পূজা হয়। রায় পরিবারের আটচালা দামোদর মন্দির (১৭৬২ খ্রীঃ) গাত্রে কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণ কাহিনী চিত্রিত আছে।

শ্যামপুর—সুলতানপুরের চারচালা শিব মন্দির (১৬৬৬ খ্রীঃ) গাত্রে টেরাকোটা কাজের রাম-মারীচ চিত্র অংকিত আছে।

সিংটি—এই গ্রামের লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের আটচালা মন্দিরটি আনুমানিক (১৭৭৭ খ্রীঃ) আকারে ছোট কিন্তু কৃষ্ণলীলা বিষয়ক টেরাকোটা চিত্রে সমৃদ্ধ। নিকটস্থ শীতলা মন্দিরের টেরাকোটা কাজে রামায়ণ ও পৌরাণিক দৃশ্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়।

মেলা—শ্রীঅশোক মিত্র সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বন ও মেলা (২য় খণ্ড) অনুসারে হাওড়া জেলার মেলার সংখ্যা দেড়শতাধিক। মেলাগুলিকে (১) পূজা-দেব-দেবী ও ধর্মমূলক (২) উৎসব পর্ব-পার্বনমূলক এবং (৩) কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব বা ব্যক্তি মহাত্মা স্মরণে এই তিনভাগে ভাগ করে ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—লোকমানসের স্তরে স্তরে যে আচার-

ব্যবহার, রীতি-নীতি, সংস্কার-কুসংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রবাহিত হয়ে চলেছে মেলা পূজা পার্বনগুলিকে অনুসন্ধান করলে তার একটি পরিপূর্ণ রূপ আমাদের চোখে পড়ে। কোন আদিমকাল থেকে বিভিন্ন রূপান্তরের মধ্যেও মানুষের আদিম ধারণাগুলি এই সব লোক জীবনের কেন্দ্র বিন্দুতে সংহত হয়ে আছে তারও পরিচয় জানা যায় এই সব পূজা-পার্বনাদিগুলি অনুসন্ধান করলে।

সারা বছর ধরে যে সব বিভিন্ন ধরণের পূজা-পার্বন উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা বসে তারমধ্যে প্রধান হল রথের মেলা এবং চড়কের বা গাজনের মেলা। এছাড়া আছে জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্রির মেলা। সীতা নবমীতে মেলা হয় নিজবালিয়া গ্রামের পিপিলেশ্বর শিবের। চৈত্র মাসে শিবায়ন হয় আমতা থানার কুশবেড়িয়া গ্রামের বাণেশ্বর শিবের।

পীরের উরস কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব বা ব্যক্তি মাহাত্ম্য স্মরণে অনুষ্ঠিত মেলার উদাহরণ। শ্যামপুর থানার পিছলদহ-গ্রামের মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় শ্রীচৈতন্যদেবের অবির্ভাব স্মরণে। পৌষ সংক্রান্তি বা ১লা মাঘ অনেক গ্রামে পীরের মেলা বসে। কয়েকটি পীরের মেলার নাম ও গ্রাম—মুন্সিরহাট—ফতেয়ালী পীর, বেতুয়া-গুজারপুর—মাজ্রী পীরসাহেব, ইসলামপুর, নয়াচক—মাণিকপীর, বানীবন—জঙ্গল বিলাসপীর, ইসলামপুর—গাজীপীর, নলপুর—সরেঙ্গা পীর, শিবগঞ্জ—মহম্মদপীর, গয়েসপুর—গিয়াউদ্দীনপীর,

সীতাপুর—দেওয়ানপীর, বামুনপাড়া—কতোয়ালীপীর। মেলাগুলির স্থায়িত্বকাল স্থান বিশেষে একদিন থেকে একমাস পর্যন্ত।

উদয়নারায়ণপুরের সিংটি গ্রামের ভাই খাঁ পীরের উরস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মেলাটিই জেলার সর্বপ্রাচীন মেলা—প্রায় সাতশ' বছরের পুরানো। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী মেলা সাঁত্রাগাছির রামরাজা-তলার মেলা। শুরু চৈত্রমাসের শুক্লানবমীতে, শেষ শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবারে। সর্বাধিক জনসমাগম হয় ডোমজুর থানার মাকড়দহ গ্রামে দোল পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠিত মাকড়চণ্ডীর পঞ্চম দোল উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায়, প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

মেলাগুলির পর্য্যালোচনায় স্পষ্ট হয় পূজা-পার্বনের ক্ষেত্রে বৈদিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতির পূজার সাথেপৌরানিক শিব, দূর্গা, কালী এবং লৌকিক ধর্মদেবতা, চণ্ডী, শীতলা পূজার এক সমন্বয় ঘটেছে। মেলা উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমান একত্রে মিশেছে, তাদেরসংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছে।

গ্রামীণ অর্থনীতিতে একসময় মেলাগুলির অবদান ছিল অসামান্য। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি এবং শহরমুখী জীবনযাত্রার জন্য মেলার অর্থ নৈতিক গুরুত্ব আজ অনেক কমে এসেছে।

আবার মেলারচ রিত্র বদলও শুরু হয়েছে। নূতন মেলাগুলির উপাস্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি। পাণিত্রাসের শরৎমেলা, পেঁড়োর ভারত মেলা, সারেঙ্গার গ্রামীণ মেলা এই জাতীয় মেলার উদাহরণ।

এই সব মেলাতেও নানা ধরণের দোকান বসে—আমোদ—প্রমোদের উপকরণ থাকে; সম্ভব হয় গ্রাম-গ্রামান্তরের অধিবাসীদের মেলা-মেশা, বেচাকেনা, ভাববিনিময়ের।

শহরের ও আশেপাশের কয়েকটি মেলা

হাওড়া ময়দানের রথের মেলা, সালকের জটাধারী পার্কের ১৫ দিন ব্যাপী কালীপূজার মেলা, অধুনালুপ্ত দাশনগরের একমাস ব্যাপী জন্মাষ্টমীর মেলা ব্যতীত হাওড়ার অন্য পাঁচটি জায়গার রাসমেলা বিখ্যাত যথা—বেলগাছিয়ায় বেনারস রোডে মধুসূদন পাল চৌধুরী প্রবর্ত্তিত রাসমেলা, মধ্য হাওড়ার চক্রবেড়িয়ার বাগুই বাড়ীতে [এই মেলায় পুতুল নাচ অন্যতম আকর্ষণ], ১২৯৭ সালে পূর্ণচন্দ্র দাঁ প্রতিষ্ঠিত বালি ব্যারাকপুরে [মেলায় পুতুলের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কথা প্রচার করা হয়], মৌড়ীতে আন্দুল রাজবাড়ীতে এবং উলুবেড়িয়ার গঙ্গারধারে কালীবাড়ীতে। বালীতে দয়ারাম বসু প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন কল্যাণেশ্বর মন্দিরের বৈশাখী মেলায় বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

বেলুড় মঠ

স্বামী বিবেকানন্দ ১৯.১০.১৮৮৬ তারিখে বরানগরে রামকৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। শিকাগো ধর্ম মহাসভা থেকে ফিরে ১.৫.১৮৯৭ খ্রীঃ-স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় বরানগরের মঠটি আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়।

১২.৫. ১৮৯৭ তারিখের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার পর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বেলুড়ের নীলাম্বর মুখার্জীর বাগানবাড়ীতে মঠটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী বর্তমান জায়গাটিতে মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে জমি কেনার ব্যবস্থা পাকা হয় এবং ৩৯০০ টাকা দিয়ে জমিটি কেনা হয়। হাওড়া শহরে পূণ্যসলিলে ভাগীরথী তীরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় ৯.১২. ১৮৯৮ তারিখে। মঠ নির্মাণে দুই বিদেশী মহিলার—একজন ইংরাজ এবং একজন আমেরিকান—অর্থ সাহায্য শ্রদ্ধার সংগে স্মরণীয়। মঠস্থ রামকৃষ্ণ মন্দিরের নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৯৩৫-এ এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৪. ১. ১৯৩৮ তারিখে। মন্দির মধ্যে মর্মর প্রস্তর নির্মিত উপবিষ্ট রামকৃষ্ণের মূর্তি আছে। প্রার্থনা কক্ষ সমেত মন্দিরটি লম্বায় ২৩৩ ফুট, চওড়ায় ১০৯ ফুট প্রার্থনা কক্ষটি ১৫২ ফুট লম্বা, ৭২ ফুট চওড়া এবং ৪৮ ফুট উঁচু। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বর্তমানে এটিই সব-চেয়ে বড় মন্দির।

শ্রীশ্রীসারদা মা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিনটি মন্দিরও এখানে আছে। মঠে রামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে একটি বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

অভিনয়

গ্রামাঞ্চলে আজও আছে এবং হাওড়া শহর যখন গ্রাম ছিল তখন প্রত্যেক পাড়াতেই থাকত একটা করে বারোয়ারী মাঠ এবং সাঁঝের আটচালা। কোন বাড়ীতে বিয়ে হলে বর বা কন্যা পক্ষের কাছ থেকে গ্রাম-ভাটি হিসাবে চাঁদা আদায় করে যা পাওয়া যেত তার সঙ্গে আরও কিছু চাঁদা তুলে যাত্রা-গান, কথকতা, তর্জা বা কবি-গানের আসর বসত বারোয়ারী মাঠে। সাঁঝের আটচালায় হ'ত অষ্টম প্রহর কিম্বা চব্বিশ প্রহর নাম গান। বড়লোকদের বাড়ীতে পূজা-পার্বন, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে গান বা যাত্রার আসর বসত।

সখের যাত্রাদলকে এক সময় বলা হ'ত অপেরা পার্টি। এক গ্রামে যাত্রা হলে পাশের গ্রাম ত বটেই দূরের গ্রাম থেকেও উৎসাহী দর্শকরা আসতেন। এই উপলক্ষে রচিত একটি ছড়া—

যাত্রা-গান শুনতে গেছি, গ্রামটি নয়ত কাছাকাছি,
গঙ্গা থেকে মাইল পাঁচেক, নামটি সাঁত্রাগাছি।

সাঁত্রাগাছি সঙ্গীত সমাজের প্রাণ-পুরুষ ছিলেন কিশোরী মোহন চৌধুরী। কিশোরীবাবু'র ডাক'নাম খুস্তেবাবু। সাধারণে তাই সাঁত্রাগাছি সঙ্গীত সমাজকে বলত খুস্তে অপেরা। মোহনলাল ভট্টাচার্য্যের প্রচেষ্টায় সাঁত্রাগাছি অবৈতনিক বন্ধু সম্মেলন [মোহন অপেরা নামে পরিচিত] কর্ত্তৃক দুর্লভ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ১৩৩৫ সালে অভিনীত হয় "ভারত সমর", "নরমেধ" ছিল এ দলের একটি নামকরা পালা।

উনিশ শতকের মানুষ বাঁ্যাটরার কবি ঠাকুরদাস দত্ত ছিলেন যাত্রাদলের নামকরা পালাকার। তাঁর নিজের যাত্রাদলের লক্ষ্মণ-বর্জন ও রাবণ বধ খুব জমাটি পালা ছিল। অন্য দলের অধিকারীরাও তাঁর নাটক অভিনয় করে খ্যাতিমান হয়েছেন। বোকা আর সাধু—মাকড়দা গ্রামের দু'ভাই—বোকা'র যাত্রাদল খুলে ঠাকুরদাসের বিদ্যাসুন্দর ও হরিশচন্দ্র পালা অভিনয় করে বেশ নাম করেছিলেন। ধর্মে মুসলমান হলেও এঁরা পৌরাণিক পালা গান-ই করতেন। একই গ্রামের গোপীনাথ দাসের দলের বিখ্যাত পালা ছিল ঠাকুরদাসের লেখা হরিশ্চন্দ্র ও রামযাত্রা। ১৮৭২-এ শিবপুরের উমাচরণ বসু'র সখের দলের জন্য ঠাকুরদাস শ্রীবৎস চিন্তা রচনা করেন। ফুলেশ্বরের আশুতোষ চক্রবর্তীর লেখা "চন্দ্রহাস"-এর প্রকাশকাল ১৩১০ বঙ্গাব্দ। আশুতোষ বাবু কলকাতার একটি বিখ্যাত পেশাদারী যাত্রাদলের পরিচালক হিসাবে সাফল্যের সংগে ঠাকুরদাসের লক্ষ্মণ-বর্জন পালা পরিবেশন করতেন। যে বাড়ীতে ঠাকুরদাস দত্ত ১২৮৩ সালের ২৫শে বৈশাখ ৭৫ বৎসর বয়সে মারা যান, বাঁাটরার সেই বাড়ীটির বর্তমান ঠিকানা—৯, ঠাকুরদাস দত্ত ফার্স্ট লেন। উলুবেড়িয়াতে এই সময়ই প্রতিষ্ঠিত হয় রাজকুমার ন্যায়রত্নের গ্রেট বেঙ্গল অপেরা।

বিশ শতকের আরও কয়েকটি যাত্রাদল হ'ল—সালখে'র বঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ষষ্ঠী অপেরা, আন্দুলের বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীগৌরাঙ্গ অপেরা, বাগনান থানার পাতিনান গ্রামের ভগবান

মণ্ডলের যাত্রাদল এবং সামতা গ্রামের মণি রায়ের মনসামঙ্গল অপেরা। সমালোচকদের অভিমত—মণি রায়ের যাত্রাদলের সাজ-সরঞ্জাম কলকাতার মথুর সা'র যাত্রাদলের চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না। ১৯০৫-এ বাঁ্যাটরার অবৈতনিক আর্যাভিনেতৃ সমিতি'র যাত্রাভিনয় শুরু হয় উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাবিনোদের "হরধনু ভঙ্গ" নাটক দিয়ে। যাত্রা জগতে সুপরিচিত ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ [বড ফণী] 'ত বটেই তাঁর বাবা রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন কুশলী অভিনেতা। ফণীবাবু নট্ট কোম্পানীতে অভিনীত রাজা সুরথ পালায় অহিভূষণ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে যুগ্ম-পালাকার ছিলেন। ফণী-বাবুর লেখা অন্যান্য নাটকের মধ্যে আছে সাধু-তুকারাম, কুশধ্বজ, বসু-ধারা প্রভৃতি।

কল্যাণপুর গ্রামের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নাট্যকার এবং গৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। দলের পরবর্তী কর্ণধার তাঁর পুত্র পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। ১৩১১ সাল থেকে বাংলাদেশে যাত্রায় নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্ত্তনের শুরু হরিপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত' ভৃগুচরিত' পালা থেকে। তিনি যাত্রাব্যালে রচনার পথিকৃৎ। সুরকার ভূতনাথ দাসের সহায়তায় হরিপদবাবু যাত্রায় থিয়েটারী ঢঙের কয়েকটি গান ও বিবেক চরিত্রের প্রবর্ত্তন করেন। যাত্রা জগতে তাঁর আখ্যা ছিল "বাংলার বিবেক"। ১৪ বছর বয়সে তিনি রচনা করেন লবণ সংহার নাটক। তাঁর জয়দেব নাটকটি বহুদিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়।

বঙ্গ নাট্য সাহিত্যে তিনি প্রথম ঐতিহাসিক নাটক রচয়িতা না হলেও তার লেখা পদ্মিনী [১৩১২] কে যাত্রায় প্রথম উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নাটক বলা যায়। তাঁর "রণজিৎ রাজার জীবন যজ্ঞ" নাটকটিকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

বাঙ্গালপুর গ্রামের বিভূতি ঘোষ ছিলেন একটি স্বদেশী যাত্রা-দলের প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতার বিখ্যাত আর্য অপেরার প্রতিষ্ঠাতা চাকুরে গ্রামের পরেশ রায়। পরবর্তীকালে আর্য অপেরার দায়িত্ব নেন কল্যাণপুর গ্রামবাসী নাট্যকার অতুল কৃষ্ণ বসু মল্লিক। নব-রঞ্জন অপেরার বিশেষ দায়িত্বভার বর্তমানে আছে গড়ভবানীপুরের নিকটস্থ পাঁথিয়াগড়ী গ্রামের সু-অভিনেতা অবনী বাগ মহাশয়ের উপর।

১৯১৪ খ্রীঃ-এ কদমতলায় কালীপ্রসন্ন পাইন, রাজকুমার দেউটি, ব্যোমকেশ অধিকারী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় পারি-জাত সমাজ নামে একটি যাত্রাদল, যেখানে ব্যোমকেশবাবু দ্রৌপদী, সুভদ্রা, কুন্তী প্রভৃতি মহিলা চরিত্রে অভিনয় করতেন। অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রকাশ মুস্তাফী, বিভূতি গাঙ্গুলী এবং ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ। ভাণ্ডারী অপেরার অন্যতম অভিনেতা ছিলেন নিজবালিয়া গ্রামের নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের পিতা ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহানুভূতিতে হাওড়া সমাজ তাঁদের হারকোর্টস্

লেনের বহির্বাটিতে স্থান পায়, সমাজের সর্বাধিকখ্যাত নাটক নদের নিমাই-এর পরিকল্পনা বিশ্বরঞ্জনবাবুর। নিতাই, নিমাই এবং জগাই চরিত্রে অভিনয় করতেন যথাক্রমে—হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গোপালবাবু এবং বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়। এঁদের অভিনয় সম্পর্কে বসন্ত কুমার পালের স্মৃতির অর্ঘ্য [১৩৪৬ খৃঃ-এ প্রকাশিত] গ্রন্থে লেখা আছে—"........আজ ছয়-সাত বৎসর হোলো হাবড়া ও শিবপুরের অনেকগুলি ভদ্রলোক মিলে নদের নিমাই যাত্রাভিনয় করতে আরম্ভ করলেন। তাদের rehearsal বা পরীক্ষা রজনীর তারিখ ছিল—৯ই নভেম্বর ১৯৩১ সাল। এই যাত্রার নূতন ধারা কীর্তন গানে পূর্ণ হোলো আর অল্পদিনের মধ্যেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের মনোরঞ্জন করে দেশ-বিদেশে বেশ সুনাম অর্জন করলো। নদের নিমাই তিন ভাগে অভিনয় হয়—(১) নদীয়া-লীলা—যার দুই শতের বেশী অভিনয় হয়েছে (২) বৃন্দাবনলীলা—নূতন আরম্ভ হয়ে কয়েকদিন অভিনয় হয়েছে (৩) নীলাচললীলা—পরে আরম্ভ হলেও চল্লিশের বেশী অভিনয় হয়েছে। ....'নদের নিমাই-এর অধিকাংশ গানের রচয়িতা ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৩৪৩ সালের ১লা মাঘ ৩১/৫, বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেনে নদের নিমাই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের শ্বেত পাথরের মূর্তিটির পরিকল্পনা বিশ্বরঞ্জনবাবুর। ভাস্কর—কুমারটুলীর গোপেশ্বর পাল।

বিগ্রহ-নির্মাণ ব্যয় ২৫০০০ টাকার সংস্থান হয় অভিনয়ের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে। নর্দের নিমাই-এর অনুকরণে শিবপুরে গৌর-গরিমা, নিমাই-সন্ন্যাস, গৌর-লীলা প্রভৃতি যাত্রা শুরু হয় এবং অল্পদিনেই লোপ পায়।

বালীর ৪৩, ডিংসাই পাড়া লেন নিবাসী শ্রীতারাপদ সাউ সঙ্গীত জগতে সাউবাড়ীর ঘরানা সৃষ্টি করা ছাড়াও পারিবারিক যাত্রাভিনয়ে নূতন দিগন্ত রচনাকারী। বামাক্ষ্যাপা নাটকে তিনি নাম ভূমিকায় রূপদান করেন। অন্যান্য চরিত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন—তাঁর পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ ও পৌত্র-পৌত্রীগণ। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে সঙ্গীত ও নাট্যপ্রতিভার জন্য নাট্যশ্রী ও সঙ্গীত রত্নাকর উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

১৯১২ খ্রীঃ-এ প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাকালীন নাম শালিখা সঙ্গীত সমাজ। অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনের পর তাঁর অনুরাগীবৃন্দ সংস্থাটির নূতন নামকরণ করেন—গোবর্ধন সঙ্গীত সমাজ। সমাজের সভাগণের নাট্যাভিনয় ও বালক নর্তকেদের নিপুণতার কথা এতদূর বিস্তৃত হয়েছিল যে—সুদূর পল্লী অঞ্চল হতেও অভিনয় রসিকগণ সমাজকে আহ্বান জানাতেন। কিছু সময়ের জন্য সমাজের নাট্যাচার্যরূপে শিশির ভাদুড়ীর যোগদান এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সমাজের বিশিষ্ট সভ্য কান্তিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মূক চলচ্চিত্রাভিনয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন।

১৯৪৫-এ আমতা থানার রসপুর গ্রামে গঠিত হয় তারা নাট্য সমাজ। পরবর্তীকালে এটির নূতন নাম হয় রসপুর ইউনিয়ন ক্লাব। জগৎবল্লভপুরের অভিযাত্রী নাট্য সমাজ একটি সুপরিচিত গ্রামীণ নাট্য সংস্থা। বাল্যশিশু সমিতির যাত্রাপার্টির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শালুকের তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একজন খ্যাতনামা অভিনেতা। শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনায় সীতা নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে ইনি শত্রুঘ্নরূপে মঞ্চাবতরণ করেন। তুলসী চক্রবর্তীর বাস ছিল রামকৃষ্ণপুরে। বালীর দাওনাগাজী রোডের প্রভাস সেনগুপ্ত এবং শৈলেন্দ্র মিশ্রও অভিনয়ে খ্যাতিলাভ করেছেন।

সে যুগের যাত্রায় খরচের পরিমাণ কি রকম ছিল তার এক হিসাব প্রকাশ পেয়েছে শ্রীতারাপদ সাঁতরা'র এক প্রবন্ধে। হিসাবটি এইরকম—১১৮০ সালের ৩০শে পৌষ রসপুর (আমতা) গ্রামে এক যাত্রা বাবদ [ক-রাতের জন্য তা বোঝা যায় না] খরচ হয়েছিল ১৮ টাকা ৩ পয়সা এবং রোশনাই তেল পুড়েছিল আট টাকার। ১২৬৯-এ দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাগনান গ্রামের এক জমিদার বাড়ী থেকে যাত্রাদলের অধিকারী শ্রীগঙ্গারাম দাস সাং মনোহরপুর ছয় রাত্রির জন্য বিদায় করণ পেয়েছিলেন ২৪ টাকা।

এক সময় হাওড়াতেও বিবর্তনের পথ মাড়িয়ে যাত্রার পর এল থিয়েটার। কলকাতার মত হাওড়াতেও মঞ্চাভিনয়ের শুরু শখের

দলগুলির দ্বারা। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এবং হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা গিরীশ চন্দ্র ঘোষ একত্রে বাঙ্গালবাবুর [রামরতন ঘোষের বংশধরদের বাড়ী, যেটি ছিল চাঁদমারী ব্রীজের নিকট] বাড়ীতে অভিনীত নাটক সমূহ উপভোগ করতেন। অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ পাঠে জানা যায় ১৮৬৫-৬৬তে শিবপুরে বাঁধা ষ্টেজে রামাভিষেক নাটক অভিনীত হয়। রাধামাধব করের বক্তব্য—শিবপুরের সখের দলের ষ্টেজ শোভাবাজারের রাজবাটীতে বেণী সংহার নাটক অভিনয় করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আনাইয়া ছিলেন। ....সেই ষ্টেজ আনাইয়া আমরা মিত্র মহাশয়ের [রায় রমাপ্রসাদ মিত্র বাহাদুর] দালানে খাটাইলাম।

সাঁত্রাগাছির রাধামাধব কর [১৮৫৩] প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন গিরিশ ঘোষের সঙ্গে ১৮৬৮-তে সধবার একাদশী নাটকে। "শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব কর থিয়েটারে শিক্ষকতার দাবী রাখেন।" মন্তব্যটি গিরিশ ঘোষের। ভারত সঙ্গীত সমাজ থেকে একমাত্র রাধামাধববাবু-ই নাট্যাচার্য উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। ১৮৭৯-তে তিনি গদ্যে ও পদ্যে বসন্তকুমারী নাটক রচনা করেন।

৬.৪.১৮৭৮ তারিখের ষ্টেটসম্যানে-এ এক ভদ্রলোক চিঠি লিখে জানান যে, প্রায় একমাস আগে রামকৃষ্ণপুর থিয়েটার হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেজে হাওড়া গার্লস স্কুলের সাহায্যার্থে মুস্তফীর থিয়েটারে

নাম দিয়ে এক অভিনয়ের আয়োজন করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত বালিকা বিদ্যালয়টি এযাবদ কোন অর্থ সাহায্য পায় নাই।

১৮৮০ খ্রীঃ-এ কালীবাবুর বাজারের প্রতিষ্ঠাতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় হরিষে-বিষাদ নাটকটি লেখার পর এটির পরিচালনা এবং অভিনয়েও কৃতিত্ব দেখান। হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাবের নাট্য-পরিচালক ছিলেন কদমতলার মোক্তার দে লেনের সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। দল পরিচালনা ও অভিনয় কুশলতার জন্য রসরাজ অমৃতলাল বসু সুরেনবাবুকে ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার হিসাবে যোগদানের আহ্বান জানান। শিবপুরের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীয়া ও অভিনেতা নিকুঞ্জবাবুর অভিনয় অনুরক্ত ছিলেন দানীবাবু। এই সময়ের অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্দ্র বিশ্বাস (১৯, নীলমণি মল্লিক লেন), বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি গাঙ্গুলী, হীরেন বসু প্রভৃতি। কালী ব্যানার্জী লেনে নিজেদের বাড়ীর ঠাকুর দালানে অভিনয়ের জন্য ১৮৯৫ খীঃ-এ জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় (টুনুবাবু) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্যান্সী থিয়েটার। দু-বছর পর ১০৫, এম. সি. ঘোষ লেনে এরিয়ান থিয়েটারের জন্ম হয় মোক্তার শিবচন্দ্র বসুর অধ্যক্ষতায়। বাড়ীর সামনে স্টেজ বেঁধে এই দলটি যে সব বই মঞ্চস্থ করেন তার মধ্যে গিরীশ চন্দ্র ঘোষের বই-ই ছিল বেশী। সেই অভিনয় দেখতে ইউরোপীয় অফিসাররাও ভীড় জমাতেন। অভিমন্যু বধ নাটকটি শত রজনী অভিনীত হয়। দলে ভাঙন দেখা দেয় ললিত চট্টোপাধ্যায়ের জয়দেব নাটকে মহিলা

শিল্পী নিয়োগ করা নিয়ে। প্রসন্ন মিত্র, ললিত চট্টোপাধ্যায়, হীরেন বসু, নন্দীরাম বসু, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা ছিলেন এই মঞ্চের নিয়মিত অভিনেতা। সম্ভবতঃ এটিই হাওড়ার সর্বপ্রথম স্থায়ী থিয়েটার মঞ্চ। পাঁচবছর চলার পর দলটির বিলুপ্তি ঘটলে ১৯০৩-এ খ্রীঃ কান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন দলের অভিনয় সুরু হয় গঙ্গাধরবাবুর বাড়ীতে টিকিট বিক্রী করে।

হাওড়ার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় কমলা থিয়েটারের জন্ম ১৯১১ খ্রীঃ চিন্তামণি দে রোডে প্রসন্ন মিত্রের নবজাত কন্যা কমলার নামানুসারে। শেয়ার বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহের পর কেবলমাত্র হাওড়াবাসী কলাকুশলী সমবায়ে এই দল গঠন করা হয়। দলে মহিলা শিল্পী নিয়োগের ব্যাপারে মতভেদ ঘটায় সুরেনবাবু দলত্যাগ করেন। পঞ্চাননতলা রোড নিবাসী ললিত মাষ্টার নামে পরিচিত ললিত চট্টোপাধ্যায় নাট্য প্রয়োগ কর্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন প্রসন্ন মিত্র, প্রফুল্ল রায়, সুধাংশু রায়, হিরণ বসু, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষ-বাবু, বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ ভট্টাচার্য, সুমতি, খেঁাদন বালা, হরিমতী, পাঁচুবালা দাসী প্রভৃতি। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন চারু চন্দ্র সিংহ ও নিত্যধন মুখোপাধ্যায়। জয়দেব, অতুল মিত্রের শিরী ফরহাদ, অমৃত লালের বিজয় বসন্ত প্রভৃতি নাটক এঁরা মঞ্চস্থ করেন। হাওড়া টাউন হল ভাড়া নিয়ে প্রথম

অভিনয় সুরু হয়। অভিনয় হত প্রতি শনিবার ও রবিবার। দৈনিক টিকিট বিক্রীর পরিমান ছিল ২৫০ টাকার মতন। পরে দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চারুচন্দ্র সিংহের পরামর্শে বনমালী বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী হয়ে শিবপুর এলাকার পার্কস গার্ডেন লেনে (বর্তমান নাম অতীন্দ্র মুখার্জী লেন) এঁরা স্থায়ী রঙ্গালয় নির্মান করেন। এখন যেখানে বঙ্গবাসী সিনেমা কমলা থিয়েটার সেখানে রঙ্গালয় নির্মানের নিষ্ফল চেষ্টা করেন। পার্শি ব্যবসায়ী ম্যাডান তখন কলকাতায় সিনেমা-থিয়েটারে অর্থ বিনিয়োগ করে বেশ লাভবান হয়েছেন। কমলা থিয়েটারের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে ম্যাডান সাহেব হাওড়ায় রঙ্গালয় নির্মানে সচেষ্ট হন। ম্যাডান সাহেব বাংলা থিয়েটার স্থাপনে ব্যর্থ হয়ে বিজু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে হিন্দী নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সে প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। যে জায়গাটির ওপর এত কাণ্ড হল সেই জায়গায় এখন বঙ্গবাসী সিনেমা।

জেলাজজ জ্ঞানাঙ্কুর দে ছিলেন কমলা থিয়েটারের নিয়মিত দর্শকবৃন্দের একজন। ললিতবাবু যে সব ভূমিকায় অভিনয় প্রতি-ভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন সেগুলি হল—আবদাল্লা [আলিবাবা], ফরহাদ [শিরী ফরহাদ], রাজা [বিজয় বসন্ত] প্রভৃতি। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে—সুমতি [মর্জিনা] এবং পাঁচুবালা দাসী [শিরী] সুনাম অর্জন করেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কমলা থিয়েটারের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে ষ্টারে অপরেশবাবুর সঙ্গে

ললিত মাষ্টারের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। প্রথমে কথা দিয়েও পরে কোন কারণে ললিতবাবু ষ্টারে কর্ণার্জ্জুন নাটকে অংশগ্রহণে অসম্মত হওয়ায় শরৎবাবুর উক্তি: হাওড়ার রাস্তায় তোমাদের প্রতিভার অপমৃত্যু হবে। ১৯২০ খ্রীঃ থিয়েটারের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। মুগকল্যাণ গ্রামে সত্যধন ঘোষালের অভিনয়েও শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হন। বালীর তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিশির যুগের নাট্যকার। শালকিয়ার যোগীন্দ্রনাথ মুখার্জী নামক জনৈক ব্যক্তি মঞ্চাভিনয়েব ব্যবস্থাপক হিসাবে এককালে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ১৯৬৭ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর উত্তর হাওড়ার কল্পরূপ নাট্য সম্প্রদায় শালকিয়ার অরবিন্দ রোডের ওপর অরবিন্দ মার্কেটে মাইকেল থিয়েটার স্থাপন করেন। থিয়েটার হলটির উদ্বোধক ছিলেন নাট্যকার মন্মথ রায়। অভিনয় হত রবিবার ও ছুটিরদিন মাইকেল থিয়েটার বিলুপ্ত হবার পর একই মঞ্চে শীশমহল থিয়েটার নাম দিয়ে কিছুকাল পেশাদারী মঞ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। কদমতলার নবরূপম সিনেমা হলে প্রতি রবিবার সকালে জহর রায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ কিছুকাল "আমি মন্ত্রী হ'ব" নাটকটি নিয়মিত ভাবে মঞ্চস্থ করেন। বর্তমানে পঃ বাংলার স্থায়ী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের মানচিত্রে হাওড়ার নাম নাই।

জেলায় সৌখীন নাট্যগোষ্ঠির সংখ্যা প্রচুর এবং বহুদলই অভিনয় গুণে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। এইরকম একটি দল হল চেতনা নাট্যগোষ্ঠী। এই সংস্থার অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত

ও পরিচালিত রামযাত্রা, মারীচ সংবাদ, জগন্নাথ প্রভৃতি নাটক রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হাওড়া দ্বান্দিক নাট্যগোষ্ঠীর বিষণ্ন মধ্যাহ্নও একটি মঞ্চ সফল নাটক, যার নাট্যকার ও পরিচালক হলেন অচিন্ত্য চৌধুরী। নট-নাট্যম সংস্থা প্রতি রবিবার হাওড়া টাউন হ'লে জগমোহন মজুমদারের পরিচালনায় অশনি সংকেত নাটকটি মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করেছেন।

নিয়মিত নাট্যানুশীলনে রত বহু সংস্থার মধ্যে কয়েকটি হ'ল কালপুরুষ (কাসুন্দিয়া), মানচিত্র [শিবপুর] শৈল্পিক [কদমতলা] ইউ. টি. সি [সালকিয়া] অলকধারা, বলাকা, অন্বেষণ, অঙ্কুশ, মারুতি নাট্য সমিতি (বালী), সন্ধ্যা নাট্যসমাজ (বালী) এবং অনুশীলণী (শিবপুর)। এক সময় বালী সান্ধ্য সম্মিলণীর সভাপতি ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী এবং অন্যতম প্রাণপুরুষ শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [শচে কানাই]। তারক গোস্বামী, গোবিন্দ পান, ধ্রুব গাঙ্গুলী এবং দাশু গাঙ্গুলী সান্ধ্য সম্মিলনী কর্তৃক মঞ্চস্থ বিভিন্ন নাটকে অভিনয় দক্ষতা প্রকাশ করে গেছেন। বেতার শিল্পী অপরেশ চট্টোপাধ্যায়ের [সেতার] হরিদাসের ভুমিকায় অভিনয় বালীর দর্শকবৃন্দ এখনও মনে রেখেছেন। বিভিন্ন সময়ে মশাল নাট্য গোষ্ঠী আমতায় চাকপোতা গ্রামে মঞ্চস্থ করেছেন বেশ কিছু প্রগতিশীল নাটক। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গণনাট্য সংঘের কয়েকটি শাখা আছে।

হাওড়া নর্থ ক্লাবের [হাওড়ায় প্রথম] ঘূর্ণায়মান রঙ্গ মঞ্চটিতে এখন চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় প্রথমে হরিদাস মিত্রের ব্যয়ে নির্মিত পরে কিরণচন্দ্র সিংহের অর্থানুকুল্যে সংস্কৃত হয়ে শিবপুর ট্রাম-ডিপোর নিকট ননীভূষণ সিংহ মেমোরিয়াল হলটি শিবপুর এলাকার অপেশাদার নাট্য গোষ্ঠীর মঞ্চাভাব মেটায়। রেলওয়ের ই. আই-আর ইনষ্টিটিউট মঞ্চ [গোলমোহর ও সাঁত্রাগাছি], সুভাষ ইনষ্টিটিউট [লিলুয়া], হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের রামগোপাল মঞ্চ এবং হাওড়া টাউন হ'লে সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় সম্প্রদায়গুলি প্রতি বছর বহু নাটক মঞ্চস্থ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ মঞ্চে সংস্কৃত নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ের আসর বসে এরূপ আরও কয়েকটি হলের নাম—আর্য্যসমাজ হল [সালকিয়া], বাণীনিকেতন [রামরাজাতলা] গুরুদাস স্মৃতি হল [আন্দুল], অনাথবন্ধু সমিতি হল [কদমতলা] ব্যাঁটরা ও বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী হল।

সংগীত

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা-পথের একটি ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে মনসা-মঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই লিখেছেন :

পূজিল বেতাই চণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর।
হরষিতে সারি গায় নায়ের নফর ॥

সারিগান: নৌকা বাইবার সময় গাওয়া একটি সমবেত সংগীত। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—বিপ্রদাস পিপলাই খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ

শতাব্দীর লোক বলিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছেন। যদি তাহাই সত্য হয় তবে নৌকা বাইচের গান-কথার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম।

সমবেত সংগীত ব্যতীত আছে একক সংগীত, লোক সংগীত ব্যতীত আছে মার্গ সংগীত। সংগীতে সঙ্গে ধর্মীয় উৎসবের এক নিগূঢ় যোগসূত্র আছে। হরি সংকীর্তন, মনসার ভাসান, গাজনের গান প্রভৃতির মাধ্যমে এই যোগসূত্রের প্রকাশ স্পষ্ট বিভিন্ন ধর্মীয় এবং সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সংগীত সমূহ আজ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয়রূপে পরিগণিত হচ্ছে। এবং যাঁরা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্বের আলোকে এগুলির বিশ্লেষণ করতে চান না, তাঁরাও এগুলির মধ্যে খুঁজে পান বিচিত্র রসের সন্ধান।

বাংলার সংগীত জগতে নিজের এবং সেই সঙ্গে জন্মভূমির গৌরবজনক স্থানটি যিনি প্রথম সুনির্দিষ্ট করে গেছেন তাঁর নাম ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। জন্ম সূত্রে হাওড়ার অধিবাসী হলেও কবি জীবনের মধ্যাহ্নে ভারতচন্দ্র ছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হয়। নবযুগের এই সূচনা কালেই ১৭৬০ খ্রীঃ-এ শেষ হয় হাওড়ার সংগীত প্রভাকর ভারত চন্দ্রের মানব জীবন শুধু শেষ হল না— বাংলার গ্রামে গঞ্জে রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গানের রেশ। রবীন্দ্রনাথের মতে—ভারতচন্দ্র ব্যতীত আমাদের

সঙ্গীত-সাহিত্যের এই সময়ের মধ্যে এত উন্নতি সম্ভব হত না। এক সময় অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের গান কলকাতার শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মুখে মুখে ফিরত। বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারলে সে যুগের কলকাতার বাবুরা বড়ই তৃপ্তি পেতেন। অতএব একথা বলা অত্যুক্তি নয় যে দেহত্যাগের আগেই ভারতচন্দ্র সংগীত জগতে হাওড়ার অগ্রগতির সূচনা করে যান।

পাঁচালী এবং হাফ-আখড়াই তখনও বাংলাদেশে খুব বেশী প্রসার লাভ করেনি, বহুল প্রচলিত ছিল রামযাত্রার গান, কৃষ্ণলীলা, তর্জা প্রভৃতি। নিত্য সন্ধ্যা সংকীর্তনের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে সাঁঝের আটচালা শুধু শালকে থেকে শিবপুর পর্যন্তই নয়, জেলার প্রায় প্রতিটি গ্রামেই ছিল। গাজনের গানের প্রবাহ হাওড়ার গ্রামগুলিতে এখনও বহমান। এক সময় জগৎবল্লভপুর থানার সেকরাহাটী গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির দিন শিবের গাজন উপলক্ষে শতাধিক লোকের সংগীত সহ সং-এর শোভাযাত্রা বের হত। গাজনের উপবাসী সন্ন্যাসীর দল শিবের মাথা থেকে ফুল পড়লে তবে জলগ্রহণ করে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে তবু শিবের মাথা থেকে ফুল পড়ছেনা—মানকুর অঞ্চলের গাজন সন্ন্যাসীরা এই অবস্থায় গান ধরেন :

রক্ত নয়ন ডুবিল তপন না পেয়ে কুল।
তবুও পড়েনা শিবের মাথার ফুল।
বল সন্ন্যাসী, বল কে কোথা ডুবিয়া খেয়েছিস জল ?

যাত্রার সময় কদর ছিল সে যুগে কবিগানের। কবি ভারত-চন্দ্রের মৃত্যুর ২৬ বছর পর শালিখা গ্রামে জন্মগ্রহন করেন কবি রাম বসু—যাঁর বিষহরি বিষয়ক (মনসার) গানগুলি অতি মধুর ও বহুল প্রচলিত।

এই সময় একই জায়গায় আর এক রাম বসুর আবির্ভাব হয়। ইনি কবিয়াল রামবসু [১৭৮৩-১৮২৮]। যতদিন শারদ-প্রাতে বাংলার আকাশ বাতাস রামবসুর গাওয়া আগমনী গানে মুখরিত হবে ততদিন বাংলার মানুষ রাম বসুকে ভুলতে পারবে না। স্বামী গৃহে অবস্থিতা কন্যার জন্য বঙ্গজননীর আকুতি রাম বসুর গানে আজও মূর্ত হয়ে আছে।

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী উমা কেমনে আজ রয়েছে।
আমি শুনেছি শ্রবণে নারদ বচনে মা মা বলে উমা কেঁদেছে॥

রামবসু বিরহের সর্বাঙ্গীন সুপরিপাটী ভাব বর্ণনায় অদ্বিতীয় এবং লহরা রচনাতেও সিদ্ধ হস্ত দিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম ইংরাজী জানা কবিওয়ালা। আসরে বসেই প্রতি পক্ষের প্রশ্নের উত্তর রচনা করার প্রথাটির তিনিই প্রবর্ত্তক। তাঁর এ বিষয়ে সাফল্য লাভের মূলে ছিল দ্রুত রচনা শক্তি এবং সম্যক রচনা কৌশল জ্ঞান।

ডঃ অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—বস্তুত পুরাতন যুগের কবিগানের তিনিই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।

রামবসুর সম সাময়িক বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ অধিকারীর বাস ছিল শালিখায়—যদিও তাঁর জন্ম কৃষ্ণনগরের কাছে জাঙ্গিপাড়ায়। তিনি কীর্তন শেখেন হাওড়ার ধুরখালি গ্রামের গোলক অধিকারীর কাছে। গোবিন্দ বাবু যাত্রাদলের মালিক বা অধিকারী ছিলেন। তাঁর রচনার নমুনা—

নূপুর শোনরে শোন, বিনে সুজন সুজনের বেদন 'জানে না'
অবোধ যদি উচ্চভাষে সুবোধ বুঝায় মৃদু ভাষে
ভাষের আভাষে ভাসে কভু ডুবে না॥
বড়র বড় দায় তাতে কি বড়ত্ব যায় পেলে একদিন বড়ই পায়
বড় ঝড় বড় গাছে বই লাগে না॥

শুকসারীর পালা এবং চূড়া-নূপুরের দ্বন্দ তাঁর দু'টি নামকরা যাত্রাপালা। এক সময় মাজু অঞ্চলে যজেশ্বর কবিয়ালের বড় নামডাক ছিল। ব্যাঁটরার ঠাকুরদাস দত্ত [আঃ ১৮০১-১৮৭৬] ছিলেন প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার, ঠাকুরদাসী গানের নমুনা—

সামান্য ধন দিয়ে বল পরম ধন ভুলতে
শ্যামরূপ ত্রিভঙ্গ বাঁকা হৃদয়ে রয়েছে আঁকা
জল দিয়ে পাথরের লেখা পারবে না তুলতে
যে ধনে ভক্তি কপাটে যতনে রেখেছি এঁটে
[আজি] ও কপাটে সে কপাটে পারবে না তুলতে

তিনি কবিগান রচনা করে কবিওয়ালাদের দিতেন। নিজেও একটি পাঁচালী গানের দল তৈরী করেছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকটি

গ্রন্থের নাম—সাহিত্য মঙ্গল, সাতনরী, উদ্ভটকাব্য, বিজনবালা, মালঞ্চ, শারদীয়া সাহিত্য প্রভৃতি। যশস্বীটপ্পা গায়ক কালীপদ পাঠক এবং শিবপুরের নিকুঞ্জ দত্ত [খেয়াল ও ধ্রুপদ] হাওড়ার সংগীত জগতের অমূল্যরত্ন। নিকুঞ্জবাবুর শিক্ষা ও আত্মীয়া শিবপুরের উত্তরাদেবী একজন প্রসিদ্ধা কীর্ত্তন গায়িকা। ১৯৩৩-এ তিনি বেতার যোগদান করেন। কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করা প্রথম গান দু'টি হ'ল—"মাধব তুঁহু রহাল মধুপর" এবং "তুমি এসেছ হে নাথ"। সাঁত্রাগাছির ভট্টাচার্য্য পাড়া লেনে রামঠাকুরের পূজারী বংশে আবির্ভূত হ'ন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী দুর্লভ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। তাঁর সময়ে এমন কোনো ধ্রুপদীয়া ছিলেন না, যাঁর সংগে দুর্লভবাবু পাখোয়াজনা বাজিয়েছেন। শোনা যায় বারাণসীর এক সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি পর পর যে ক'জনের সংগে বাজিয়েছিলেন তার মধ্যে কোন বোল-পড়ন দু'বার বাজান নি। ৬৯ বছর বয়সে কলকাতার ৪৬, পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রিটে ভূপেন ঘোষের বাড়ীতে ললিত মুখোপাধ্যায়ের সংগে সঙ্গত করতে করতে সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হ'য়ে তিনি মারা যান। তাঁর বহু শিষ্য আজ খ্যাত কীর্তি। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস শালিখায়। বেলুড়ের ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য এবং বালীর সনৎ সিংহ বাংলার সঙ্গীত জগতে সুপরিচিত।

বোলান গান নামে এক ধরণের গানের প্রচলন সে যুগে ছিল। হাওড়ায় বহুলপ্রচলিত বোলান গানগুলির একটি হ'ল—

মাকে বল সাজাইতে ধড়াচূড়া দিয়ে
অলকা তিলকা ভালে পদে নূপুর লয়ে
একবার নেচে আয়রে, দেখ গোষ্ঠের সময় যায় রে

ধর্মের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগাযোগ দেহের সঙ্গে মনের যোগাযোগের মত। নাথধর্মানুসারে দেহতত্ত্বের গান গেয়ে হাওড়া বাসীদের যিনি মনোহরণ করেছিলেন—সাধারণের কাছে তিনি "হাওড়ে গোঁসাই" নামে পরিচিত ছিলেন। প্রেমিক আখ্যাধারী পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য রচিত কালী কীর্ত্তনের সংখ্যা হাজারেরও বেশী। তাঁর রচিত একটি গান—

বড় ধূম লেগেছে হৃদিকমলে, মজা দেখিছে আমার মন পাগলে
করতেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপিতে মিলে
[আবার] আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে চলে
দেখে অবাক লেগেছে তাক ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে
[আবার] পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ, আমার জ্ঞানের কপাট
গেছে খুলে
প্রেমিক পাগল বলে সকল সে বলে কি মন টলে
[ও বার] পিতা মাতা বন্ধ পাগল ভাল হয় কি তাদের ছেলে
শোন মা তারা ভূভারহরা এইবেলা মা রাখছি বলে
যখন ভাসব জলে অন্তকালে করিস কোলে।

এই গানের জন্ম আন্দুলে কালী কীর্ত্তন সম্প্রদায় ব্যতীত শিব-

পুরেও একটি বাউল সম্প্রদায় গঠিত হয়। শিবপুরে গানের সুর দিতেন কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক।

যাঁর ভক্তি সঙ্গীতে "বুক ভরে যায়, অভাব মিটায়, স্বভাব জাগায় মহাসুখে" সেই ৩৯, বিবেকানন্দ রোড বাসী ব্রজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত সরস্বতী সঙ্গীতের কয়েক পংক্তি—

মনের কালি মুছিয়ে মা তোর
সাদা রঙে দে না ভরে
হৃদয় নিরস কর মা সরস
তোর ঐ মধুর বীণার সুরে

*   *   *   *

অভয় দিয়ে বীণার তানে
জাগাও মা গো সুপ্ত প্রাণে
ভরিয়ে বিশ্ব সুরে গানে
মিথ্যা বিচার দে দূর করে।

সারেঙ্গাসহ আরও কয়েকটি অঞ্চলে ভাইয়া গান নামে এক ধরণের গান শোনা যেত। ঘেঁটুর গানও এখনও কোথাও কোথাও শোনা যায়।

সেকালের বরদা দত্ত [উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত], হরেন্দ্র দত্ত [রবীন্দ্র সঙ্গীত] এবং একালের, তরুন বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্তিক সান্যাল [পাখোয়াজ], বিনয় অধিকারী, বাসন্তী ঘোষাল, স্বপ্না ঘোষাল, শংকরলাল মুখোপাধ্যায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত,

কনকলতা ঘোষ, পঞ্চানন রায়চৌধুরী [বীণকার] এবং তবলায় কানাইলাল পাল প্রভৃতি আরও অনেকে হাওড়ার সংগীত, সাধনার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন ?

"একাকী গায়কের নহে ত গান।" কোন সময়েই হাওড়ায় সঙ্গীতের সমঝদারের যে অভাব ছিল না এবং এখনও নাই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আন্দুলের জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিক শাস্ত্রীয় সংগীতের পৃষ্ঠপোষক এবং টপ্পা গান ও ভক্তি সংগীতের রচয়িতা ছিলেন।

রামকৃষ্ণপুরের মল্লিক বাড়ীর গোকুলনাথ মল্লিক কবিয়াল ভোলা ময়রার উপর একবার কোন কারণে বিরক্ত হয়ে ভাই শ্রীনাথ মল্লিকের সাহায্যে নিজের বাড়ীতে ভোলা ময়রাকে আটক করে রাখেন। কবিয়াল পরিবেশ উপযোগী একটি গান শোনাতে খুশী হয়ে গোকুলবাবু তাঁকে মুক্তি দেন। গানটি হ'ল—

শ্রীনাথ আনালেন, গোকুল বাঁধালেন
কিসে কি যে হয়ে গেল, তাতো জানি না
ভোলানাথের মান তো গেছে, প্রাণ' ত' যাবে না
প্রাণ' ত যাবে না।
যা হবার তা হয়ে গেছে, আর ত হ'বে না;
মান'ত গেছে, প্রাণ' ত যাবে না।

সত্যই যায়নি, হাওড়ার সংগীত প্রাণ কাল স্রোতে ভেসে যাওয়া ত দূরের কথা ক্রমশঃ তা আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে।

সং-এর গান

সং-এর গান। কিছুটা গান, কিছু অভিনয়, কিছুটা সাঙ্গীতিক ভাব, কিছুটা সামাজিক ভাবনার এক অপূর্ব সমন্বয়। কলকাতার জেলেপাড়ার সং-এর কথা এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

হাওড়াতেও এজাতীয় সং-এর গান বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে বহু-দিন ধরে প্রচলিত আছে। তবে বেশীরভাগ জায়গাতেই লোপ পেয়েছে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে দোলের দিন হাওড়া শহরের খুরুট অঞ্চলের জয়নারায়ণ বাবু আনন্দ দত্ত লেনের শীতলা সঙ্গীত সমাজ থেকে সতীশচন্দ্র দাশের পরিচালনায় ও মহাদেব শী'র অর্থানুকুল্যে একটি সং-এর গানের সূত্রপাত হয়। 'রং ঢং সং' এই আখ্যায় প্রায় এগার বছর ধরে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানটি চলে।

সতীশবাবু ছিলেন এই দলের সঙ্গীত রচয়িতা ও শিক্ষক। পেশায় তিনি ছিলেন মনোমোহন থিয়েটারের হারমনিয়াম বাদক, এবং পাড়ায় ভূতি মাষ্টার নামে পরিচিত। গানগুলিতে থাকতো সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক কুরুচির প্রতি কটাক্ষ এবং সমাজ সংস্কার মূলক কাজগুলির প্রতি সমর্থন। যেমন, গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের সমর্থনে রচিত হয়েছিল একটি সমবেত নাচের গান— 'বারে গান্ধী বাবা।'

শিবপুরের কালীকুমার ব্যানার্জী লেন এবং রামমোহন

মুখার্জী লেনের সংযোগস্থল থেকে কয়েক বছর সরস্বতী পূজার বিজয়ার দিন অমূল্য মাষ্টারের পরিচালনায় এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ইউনিক ক্লাব একটি সং-এর গান বের করতেন। এখানকার সং ছিল প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের দোষ ত্রুটিগুলির সমালোচনা। এ সম্পর্কে পরবর্তীকালে শিবপুর সং-এর সঙ্গীত রচয়িতা অমূল্যবাবুর মন্তব্য—তিনি শিবপুরের মানুষ তাই এই অঞ্চলের ভালমন্দের আলোচনাই ছিল তাঁর সং-এর লক্ষ্য। আঞ্চলিকতার গণ্ডী অতিক্রম করতে না পারার ফলেই তাঁর সং-এর গানগুলি জনপ্রিয় হয়নি। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সহযোগী।

খুরুটের রং ঢং সং-এর আয়ুকালের প্রায় শেষের দিকে আরম্ভ হয়েছিল কাসুন্দিয়ায় সংবাহার। ১৩৩৬ সালের ১লা বৈশাখ শুরু হয়ে [২য় বছর থেকে চৈত্র সংক্রান্তিতে হত] তের বছর চলার পর ২য় বিশ্ব যুদ্ধের সময় কয়েক বছর বন্ধ হয়ে যায়। পরে দেশ স্বাধীন হবার পর এটির পুনরুজ্জীবনের সম্পর্কে দলের সঙ্গীত রচয়িতা বিভুতিভুষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা—

ভদ্রমহোদয় ও মায়েদের করি নমস্কার।
বহুদিন পরে পুনঃ এল সংবাহার ॥
১৩৩৬ সনে এমনি একদিনে
সংবাহারের প্রথম প্রকাশ হল শুভক্ষণে।
১৩৩৬ থেকে একাধিক্রমে

১৩ বছর চৈতালী গান শুনিয়েছি সজ্জনে।
তারপর প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ এসে
সংবাহারের কণ্ঠরোধ করল অবশেষে।
তদবধি দীর্ঘদিন নীরব থাকার পর
আজকে আবার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে।
'সংবাহারের দু'এক খণ্ড পড়বে সবার চক্ষে।

গানে উল্লিখিত পঞ্চাশ বছর পূর্তিটি হল কাসুন্দিয়ার ১২, গণেশ মাঝি লেনের শীতলা মন্দির বা মায়ের মন্দিরের [১৩২৮ সালে স্থাপিত হয়] পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব। গানের দলটি যখন সমস্ত কাসুন্দিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করতো তখন বাউলের সাজে এক-জন গাইতেন—

দেশের দশা দেখিয়ে মোরা বাউল সাজিয়ে
বলব হেথা দু'এক কথা শুনুন মন দিয়ে।

একটি কথায় বক ধার্মিকদের প্রতি কটূক্তি—

দিনের বেলায় গেরুয়া পরে ধর্মের কথা কই
হলে পরে রাত্রি কত যে ফুর্তি কেবা জানে আমা বই।

শিক্ষা বিষয়ক গানও থাকতো—

ধন্য এই সাহেবদত্ত বিলাতি বীজমন্ত্র
মানুষ থেকে যাচ্ছি হয়ে পুতুল কিংবা যন্ত্র।

এই সমস্ত সং-এর গানের উদ্দেশ্য ছিল নির্মল ও নির্দোষ আনন্দের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দেওয়া এবং আপামর জনসাধারণের

নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ বুদ্ধিকে উজ্জীবিত করা। মাঝে মাঝে গানের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার প্রচারও করা হত বলে এই দলটিকে অনেকে স্বদেশী সং-এর দল বলতো এবং দলটির কার্য-কলাপ একবার পুলিশের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে। এই জাতীয় একটি গান—

তোদের জারিজুরি ভারিভুরি চলবে নাকো আর
চোখ ফুটেছে ঘুম ভেঙেছে এখন সবাকার।
টলছে তোদের রাজ্যাসন দুঃশাসন অবসান
দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে করতে হবে পিছটান।

পল্লী প্রদক্ষিণ পথের মাঝে মাঝে আসর করে এই গানের প্রদর্শন চলতো। সত্যচরণ মাঝি ছিলেন এই দলের এক উদ্যোগী পুরুষ।

["মায়ের মন্দির" নামে এই গানের দলটির অস্তিত্ব আজও আছে। শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (বুটাইদা) ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহা-মানবদের জীবনী প্রচারের নিরলস প্রচেষ্টায় এই গানের দলটি ব্যাপৃত।

বাগনানের ১৬ মাইল দক্ষিণে রাধাপুর গ্রামের চৈত্র মাসের সং-এর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। আলোচনার উপসংহারে উদ্ধৃত করি সংবাহারেরই দুটি পঙক্তি—

আজকের মত এই পর্যন্ত সং শেষ হল,
একবার সবাই মিলে প্রাণ খুলে হরি হরি বল॥

চিত্রকলা

জন্মসূত্রে হাওড়ার চিত্রশিল্পীদের তালিকায় নন্দলাল বসুর নামও সংযুক্ত হয়ে গেছে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বাসুপুর গ্রাম। হাওড়ার চিত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রথম সারির প্রথম নাম শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাসের। পৈত্রিক নিবাস মাজু, জন্ম—২৫.৮. ১৮৮৩। রাজবল্লভ সাহা লেনবাসী সুরেন্দ্র নাথ দাস গভর্ণমেন্ট আর্টস্কুলে ভর্তি হ'ন ১৮৯৮ খ্রীঃ-এ। হ্যাভেল সাহেবের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে তিনি অন্যতম। মাত্র ১৯ বছর বয়সে সপ্তম এডওয়ার্ডের যে প্রতিকৃতিটি তিনি আঁকেন হাওড়ার তদানীন্তন জেলা শাসক সেটি ২০০ টাকায় কিনে হাওড়া টাউন হলে রাখেন। ১৯১৯-এ তাঁর বিখ্যাত ছবি দুষ্মন্তের দরবারে শকুন্তলা [৬'×৮'] । পাতিয়ালার রাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক চিত্র প্রদর্শনীর ক্যাটালগ সাক্ষ্য দেয়—যেখানে অতুল বসুর ছবির দাম ৫০ টাকা, হেমেন মজুমদারের ছবির দাম ২৫০ টাকা যেখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা ছবিটির দাম ৪০০০ টাকা। এই ছবিটি ও তাঁর অন্যান্য শিল্পকীর্তির জন্য ১৯২৫-এ কাশীর ভারত ধর্ম মহামণ্ডল তাঁকে শিল্পরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। 'বস্তুতঃ একাডেমিক কাজে তিনি তুলনারহিত। তাঁর ছবি সম্পর্কে অতুল বসুর মন্তব্য—একটি মাটির ঘরের দাওয়ায়, স্নিগ্ধ বর্ণ সমাবেশ।

১৯০৪ খ্রীঃ-এ শালকিয়ার ১৯১, বাবুডাঙ্গা রোডে [বর্তমানে

শ্রীরাম ঢ্যাং রোড] নিকুঞ্জ চৌধুরীর পুত্র সুধাংশু চৌধুরীর জন্ম। দেশ ভাটোরা গ্রাম। অবনীন্দ্র নাথের ছাত্ররূপে তিনি চার বছর কলকাতার করপোরেশন ষ্ট্রীটের [সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড] সমবায় ম্যানসনে Indian society of oriental Arts—এর উপরতলায় একটি মেঝে থেকে তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর আঁকা ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ ও একটি নৈসর্গিক চিত্র কলকাতার যাদুঘরে এখনও আছে। রণদা উকিল, ললিত সেন ও ধীরেন্দ্র দেব বর্মণের সংগে তিনিও লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউস-এর দেওয়ালচিত্র আঁকতে যান। এই কাজের শেষে ১৯৩৪ খ্রী:-এ লণ্ডনে তাঁর একটি চিত্র প্রদর্শনী রসিকজনের প্রশংসা লাভ করে। কলকাতার মেট্রো সিনেমাতে ম্যুরাল পদ্ধতিতে আঁকা গৃহ-অলঙ্কার চিত্রগুলির জনক তিনি-ই। বসুশ্রী, রাধা, উত্তরা, শ্রী, উজ্জলা প্যারাডাইস, মেনকা প্রভৃতি চিত্রগৃহের অঙ্কন বিন্যাস তাঁরই। বর্তমানে তিনি বেহালাবাসী।

বসবাস পৈত্রিক নিবাস সূত্রে এই জেলার সাথে যুক্ত চিত্রশিল্পীদের কয়েকজন হ'লেন, সর্বশ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী [বাগনান শ্যামপুর রোডের উপর নাউর গ্রাম], শৈল চক্রবর্তী [মৌড়ী] রেবতী ভূষণ ঘোষ, নিখিলেশ দাস সুফী [নরেন রায়] প্রকাশ কর্মকার, অনীতা রায় চৌধুরী, প্রভাত কর্মকার, নারায়ণ দেবনাথ ও রবীন মণ্ডল, শান্তিনিকেতনের ছাত্র চিত্রশিল্পী ধর্মনারায়ণ দাশগুপ্ত কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন হাওড়ার একটি বিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত।

হাওড়া জেলা লেখক সম্মেলন আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ কারীদের কয়েকজন হ'লেন—দেবনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় অনাথবন্ধু সেন, স্বপ্না রায়চৌধুরী, মীনাক্ষী ঘোষ, রীতা নন্দী, সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন মণ্ডল, নিতাই বসু এবং শঙ্কর মজুমদার। ব্যাতড়ের মোড়ে থাকেন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী গণেশ বসু। বালিগঞ্জের আর্ট একাডেমি নামক অঙ্কন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার নিত্যানন্দ ভকত হাওড়াবাসী। বাটিক পদ্ধতিতে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা দেশ-বিদেশের সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

খেলা-ধূলা

হা ডু-ডু বা কপাটী, তীর ছোঁড়া প্রভৃতি দেশীয় রীতির খেলাধূলা গুলিতে আজ আবার নতুন মর্য্যাদা দানের প্রচেষ্টা দেখা গেলেও ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাধূলা গুলিই এখনও জেলায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কলকাতার মত হাওড়াতেও ফুটবল খেলার আদি পুরুষ ছিলেন ইউরোপীয়ানরা। ক্যালকাটা, ডালহৌসী প্রভৃতি সাহেবী ফুটবল টীমগুলি যখন গড়ের মাঠের মধ্যমণি তখন ভাল ফুটবলার হিসাবে হাওড়ায় কর্মরত ম্যাকলেল্যাণ্ড সাহেবের নাম ডাক ছিল। অবশ্যই সাহেবের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল কলকাতা।

আই. এফ-এ শীল্ডের আগে শুরু হয় ট্রেডসকাপের খেলা

১৮৮৯ খ্রীঃ-এ। প্রথম বছর যে কয়টি দল প্রতিযোগিতা করে তার মধ্যে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ফুটবল টীমও ছিল। ঐ শতকের শেষার্ধে ট্রেডসকাপ বিজয়ী দলের মধ্যে এই কলেজের নামও আছে। হাওড়ার রেলওয়ে কর্মচারীগণ একসময় একটি ক্রিকেট ক্লাব ও একটি বোটক্লাবের পত্তন করেছিলেন। দেশীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হাওড়ার সর্বপ্রথম খ্যাত কীর্তি ক্রীড়াসংঘ হল—হাওড়া স্পোর্টিং ক্ল'ব [১৮৮৯]। সম্ভবতঃ জন্মক্ষণে এটি হাওড়া ক্রিকেট ক্লাব নামেই পরিচিত ছিল এবং ক্রিকেট খেলাতে সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে সে যুগে M. c. c. of Bengal—এই খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৯০২-তে তেলকল ঘাট রোডে [বর্ত্তমানে নিত্যধন মুখার্জী রোড] ক্লাবের নিজস্ব বাড়ী হয়। বেঙ্গল জিমখানা পরিচালিত ক্রিকেট লীগে দু'বার এবং সি. এ. বি পরিচালিত ক্রিকেট লীগের প্রথম বছর যুগ্ম চাম্পিয়ান হয়ে পর পর তিন বছর বিজয়ীর সম্মান অর্জনকারী ক্লাবটির কয়েকজন নামকরা ক্রিকেটার হলেন মণি দাস, বামাচরণ কুণ্ডু, বাদল ঘোষ, নাকু পাইন, মোহিনী দত্ত এবং মণি ব্যানার্জী।

কলকাতার গড়ের মাঠ থেকে হাওড়া ষ্টেশন পেরিয়ে শিবপুরের সাধারণ মানুষের পায়ে ফুটবলের অনেকদিন সময় লেগেছিল। এ সম্পর্কে জনৈক শিবপুর বাসীর আত্মজীবনীতে লেখা আছে—"১৮৯২ সালে আমরা ফুটবলের প্রথম নাম শুনলাম। মনে পড়ে যেদিন আমাদের প্রথম বল কিনে আনলো তখন রাত্রি বোধহয়

৯।। টা হবে। যে যেথা ছিল দৌড়ে এল.........বাড়িতে খাবার জন্য ডাকাডাকি করছে খেয়াল নেই। যখন শিবপুর হনুমন্তার ঘাটের চড়ায় খেলা আরম্ভ হোলো তখন ক্লাবের নাম হোলো Shibpur Riverside sporting club." আই. এফ. এ শীল্ডের প্রথম বছরে [১৮৯৩ যে বারটি দল অংশগ্রহণ করে তার একটি হল হাওড়া ইউনাইটেড।

১.৪.১৯০০ তারিখে ১৭ জন সদস্য সমবায়ে শিবপুরে গঠিত হয় Riverside Institute—যার তিনটি বিভাগের নাম হ'ল—সাহিত্য শাখা, নৈতিক শাখা এবং ক্রীড়া শাখা। খেলাধূলা ছাড়াও—The object of the Institute is to promote the cultivation of useful knowledge amongst the young men of shibpur to foster a feeling of mutual confidence and sympathy amongst them to elevate their moral character as also to provide suitable means of physical culture for them."

একই বছরে বেটন কাপ ও হকি লীগ জয়ীদের তালিকায় প্রথম নাম বি. ই. কলেজ, সাল ১৯০১।

১৯১৮ খ্রীঃ-এ ৫/৬টি ক্লাব মিলে হাওড়া লীগ নামে যে ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয় সেটিই জেলার সংগঠিত ক্রীড়া পরিচালনার প্রথম প্রয়াস। সংগঠনের প্রথম সভাপতি জেলা শাসক মিঃ হার্টলে। পরবর্তীকালে বরদাপ্রসন্ন পাইন, বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত প্রমুখেরা

এ দায়িত্ব বহন করেন। হাওড়া টাউন ক্লাব, হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাব, হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাব প্রভৃতি হাওড়ার দলগুলি ব্যতীত হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার কিছুদল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতো। সালকিয়ার সুধাংশু ব্যানার্জী [গোবরা] এবং জটাই মিত্র [এনা] ছিলেন এই সময়ের দুই নাম করা খেলোয়াড়। হাওড়া লীগের পরবর্তী সংগঠন হাওড়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন। প্রথম সভাপতি মৌড়ির জমিদার জীবন কৃষ্ণ কুণ্ডু চৌধুরী। সংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন ডোমজুরের শিব-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মাকড়দার ভূধর বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া শহরের ডাঃ রমেন মিত্র, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ব্যানার্জী, বলাই ব্যানার্জী প্রভৃতি কর্মীগণ। ১৯৩৮ খ্রীঃ-এ হাওড়া জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন প্রধানতঃ আন্দুল স্পোর্টিং ক্লাব, মহিয়ারী স্পোটিং ক্লাব, মাকড়দহ ইউনিয়ন ক্লাব, খাটোরা তরুণ সংঘ, ডোমজুর ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশন, পার্বতীপুর মিলন সংঘ প্রভৃতি কয়েকটি ক্লাবের প্রচেষ্টায় অন্যান্য খেলাধূলার সংগঠনের দায়িত্ব নিয়ে হাওড়া জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন নামে আত্ম-প্রকাশ করে। এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি সদর মহকুমা হাকিম বি. কে. দাশ, যুগ্ম-সম্পাদক—রুক্মাঙ্গদ রায় ও ডাঃ আর মিত্র। জেলা স্পোর্টস্ এসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় প্রতিটি থানা অঞ্চলকে নিয়ে থানা স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন গঠিত হওয়ার পর থেকে থানা লীগ এবং অনেক নক-আউট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা

হয়েছে। জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন প্রধানত ফুটবল, ক্রিকেট সাঁতার, হকি, ব্যাডমিন্টন, এ্যাথলেটিকস্ বাস্কেটবল, ইত্যাদি খেলার আয়োজন করে থাকে। অন্যান্য খেলা যেমন, ভলিবল, জিমন্যাষ্টিক, খো-খো, কবাডি, ভারোত্তোলন, যোগব্যায়াম, বক্সিং হ্যাণ্ডবল, থ্রো-বল ইত্যাদির জন্য পৃথক জেলা সংস্থা আছে।

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই জেলাতেই সর্বপ্রথম উইমেন্স স্পোর্টস এসোসিয়েশন গঠিত হয়—মুখ্যতঃ শ্রীমতী সবিতা এ্যামবেট, প্রফুল্ল দাশগুপ্ত প্রমুখের প্রচেষ্টায়। হাওড়া জেলা অলিম্পিকের প্রথম অনুষ্ঠান হয় ১৯৭৭ খ্রীঃ-এ।

কয়েকটি ক্লাবের কথা—বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকের হাওড়া-হুগলীর কয়েকটি খ্যাতকীর্তি ক্লাব হ'ল—১ম পর্য্যায় —হাওড়া ইউনাইটেড, হাওড়া স্পোর্টিং, শিবপুর বি. ই. কলেজ ও চন্দন নগর স্পোর্টিং ক্লাব। ২য় পর্য্যায়—বালী ওয়েলিংটন, উত্তরপাড়া পিকউইক, চন্দননগর অলিম্পিক, রিষড়া জগন্নাথ স্পোর্টিং এবং হুগলী কলেজ।

আই. এফ. এ. পরিচালিত লীগের বিভিন্ন বিভাগের খেলায় সালকিয়া ফ্রেণ্ডস্, হাওড়া ইউনিয়ন, বালী প্রতিভা ও ইণ্টার-ন্যাশনাল প্রভৃতি হাওড়ার টীমগুলি অনেক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। সি. এ. বি ক্রিকেট লীগে হাওড়া থেকে খেলছে হাওড়া স্পোর্টিং, সালকিয়া ফ্রেণ্ডস, শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউট, ব্যাঁটরা ক্রিকেট ক্লাব এবং বাণীনিকেতন।

সালকিয়া ফ্রেণ্ডস ক্লাব—১৯১৮ খীঃএ ষ্টলকার্ট লেনে স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি—পান্নালাল কুণ্ডু, সম্পাদক—মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী। এক সময় মুসুরিতে গঙ্গার ধারে ষ্টলকার্ট পরিবারের মাঠে ক্লাবের খেলা ধূলা হ'ত। বর্তমান ক্লাব-প্যাভি-লিয়ন রামপ্রতাপ চামেরিয়া পার্কে। মণিলাল আটা, নরনারায়ণ চ্যাটার্জী, বলাই অধিকারী ও আরো অনেকের সক্রিয় সহযোগি-তায় ক্লাবটি বর্তমান রূপ পেয়েছে।

শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউট॥ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটকে আদর্শকরে ১৯১৪ সালে খ্রীষ্টাব্দে মন্মথ নাথ নিয়োগী (ভারত ও বর্মা সরকারের প্রধান কেমিষ্ট), অধ্যক্ষ বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রবোধ বোস, অধ্যাপক ভোলানাথ রায়, হরিপদ রায়চৌধুরী (জমিদার), প্রবোধলাল মুখার্জী, অক্ষয় কুমার সরকার ও আরও কয়েকজন কৃতবিদ্য পুরুষ ছাত্রাবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করেন। প্রথম প্রেসিডেণ্ট জেলা শাসক মিঃ হপকিন্স, সাঃ সম্পাদক মন্মথ নাথ নিয়োগী। হাওড়া লীগ, পাওয়ার লীগ, এলেন লীগ, আই. এফ এ. প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় ফুটবল ও হকি খেলায় অংশ গ্রহণ করলেও ক্লাবটি সবিশেষ কৃতিত্ব দেখায় ক্রিকেটে। এই প্রশংসার সব টুকুই প্রাপ্য অনিল মোহন ব্যানার্জীর। ১৯৩৪ খ্রীঃ-এ জার্ডিনের একাদশের সঙ্গে খেলার পর লালা অমরনাথ, খুঁটে ব্যানার্জী প্রমুখ ক্রিকেটারগণ শিবপুরে এসে ক্লাবটির সঙ্গে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪২ খীঃ-এ শিবপুরের গঙ্গার

ধারের মাঠ ও প্যাভিলিয়ন হাতছাড়া হওয়ায় ক্লাবের খেলাধুলার বিশেষ অসুবিধা ঘটে।

অতীতের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় হলেন—শৈলেন মিত্র, শংকরী দত্ত, সত্যেন রায়, সোন্টি ব্যানার্জী, প্রভাস পাল, ক্যাবলা দত্ত এবং শৈলেন ব্যানার্জী।

বাজে শিবপুর ইনষ্টিটিউট॥ অধুনা মৃতপ্রায় এই প্রতিষ্ঠানটির একদা সহঃ সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ক্লাবটির গঙ্গার ধারে নিজস্ব খেলার মাঠ ছিল।

বাণী নিকেতন—সাঁত্রাগাছী॥ প্রতিষ্ঠা বৎসর—১৯২১। ক্লাবের কয়েকজন কুশলী খেলোয়াড়—শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, সুন্দরীলাল ভট্টাচার্য, সচ্চিদানন্দ চৌধুরী এবং অজিত চৌধুরী।

রাজা শীল্ড—বালীর শশাঙ্ক ব্যানার্জীর পুত্র রাধানাথ ব্যানার্জী (ডাকনাম—রাজা) খেলার মাঠে যে আঘাত পান তার ফলেই মারা যান। তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে বালীতে রাজা শীল্ডের প্রবর্তন হয়। পরবর্তীকালে এটি কলাকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এটি এখন ময়দানের একটি আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা।

কয়েকজন ক্রীড়াবিদের কথা—হাওড়ার ক্রীড়াকুশলীগণের মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ৫৪/১, হারকোর্টস লেন (অধুনা চিন্তামণি দে রোড) নিবাসী মনি দাস। ফুটবল ও ক্রিকেটে তাঁর কৃতিত্ব অনন্য সাধারণ। এছাড়াও খেল-

তেন লন টেনিস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় Bengal Light Horse Auxiliary Force-এ মিলিটারী ট্রেনিং নেন।

মনি দাস (১৮৯০-১৯৬৪) হাওড়া জিলা স্কুলের ছাত্র থাকা-কালীন ফুটবলে বাংলা স্কুল দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। হাওড়া স্পোর্টিং ক্লাবে যোগদান—১৯০৭ খ্রীঃ-এ। দীর্ঘদিন এই ক্লাবের ক্রিকেট পরিচালক ছিলেন। এ সম্পর্কে ৭. ১০. ১৯২৮ তারিখের ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় লেখা আছে—'Howrah Sporting will again be led by Moni Das perhaps the most experienced Bengali cricketer in the province.'

মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ (কুচবিহার) এবং মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ (নাটোর) এই ক্রিকেট প্রতিভাটির যথেষ্ট পৃষ্ঠ-পোষকতা করায় মণিবাবু বহুবার কুচবিহার ও নাটোর দলের হয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। মিঃ গিলিগান পরি-চালিত প্রথম ভারত সফরকারী এম. সি. সি দলের বিরুদ্ধেও তিনি খেলেছেন। মনিবাবু ১৯১৩ সালে পাতিয়ালা ক্রিকেট ক্লাবে এক-মাত্র বাঙালী হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী হাওড়া স্পোর্টিং-এর পক্ষে হেষ্টিংস এ. সি-র বিপক্ষে এবং প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে মোট সেঞ্চুরীর সংখ্যা-২৭, যার মধ্যে—কুচবিহারের মহারাজের একাদশের পক্ষে ৫টি। প্রথমে তাজ-হাট ক্লাবে পরে মোহনবাগানে [১৯২৪-২৫] এবং শেষে ইষ্টবেঙ্গলে [১৯২৫-২৮] ফরওয়ার্ড, লেফট হাফ্ ও ব্যাক হিসাবে ফুটবল খেলেছেন।

১৯২৪-এ তিনি নাগপুরে আন্ত-প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলাদলকে এবং ঐ বৎসরই প্রথম বিদেশগামী [জাভা প্রভৃতি দেশে] ভারতীয় ফুটবলদলকে নেতৃত্ব দেন। ১৩, মধুসূদন বিশ্বাস লেনের বিজন বোস [১৯২০-২৩.১.৭৭] মোহনবাগানের পক্ষে ১৯৪৭ খ্রীঃ-এ আই. এফ. এ. শীল্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ক্রীড়া-জীবনের শুরুতে তিনি ১৯৩১-৩৪ এবং শেষে ১৯৪২-৪৩ হাওড়া ইউনিয়ন, দু'বছর স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং কিছু সময় মোহনবাগানে খেলেন। ক্রিকেট খেলতেন হাওড়া স্পোর্টিং-এ। বিবেকানন্দ রোডের অশোক চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৯-এ প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১৭টি গোল করে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করেন। ঝাউতলার দাশু মিত্র ছিলেন এরিয়ান্সের একজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়। বাঁ্যাটরার সামন্ত পরিবারের ভাগ্নে শৈলেন্দ্র নাথ মান্না মামাদের সঙ্গে যেদিন বাঁ্যাটরা ডিসিপ্লিন ক্লাবে প্রথম যান সেদিন কেউ কল্পনা করেননি ইনিই উত্তরকালে একদা কলকাতার ফুটবল মাঠে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'বেন। প্রায় ১৬ বছর বয়সে ১৯৪০-৪১ খ্রীঃ-এ হাওড়া ইউনিয়নের দ্বিতীয় ডিভিসনে যোগদান, ১৯৪২ থেকে মোহনবাগানের নিয়মিত খেলোয়াড় হওয়া, ১৯৪৪ থেকে ৫৪ পর্যন্ত বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা, ১৯৫২-তে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতীয় ফুটবলদলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন এবং ১৯৫৩-৫৪ এফ. এ. ইয়ারবুকে প্রথম সারির খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি লাভ শ্রীমান্নার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়গণের মধ্যে মোহনবাগানের আদিত্য রায়ের নাম উল্লেখ্য। উত্তর জীবনে পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্ত্তিক চন্দ্র দত্ত ছিলেন নামী ক্রিকেটার। সাঁত্রাগাছির নীরদ [পুঁটু] চৌধুরী বোলার হিসাবে টেষ্ট দলে অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলেন। বর্ত্তমান শতকের চতুর্থ দশক থেকে বালীর কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়, শচীন [ল্যাংচা] মিত্র, সমর [বদ্রু] ব্যানার্জী এবং শিবপুরের অরুণ ঘোষ, বাগনানের রতন সেন, সর্বভারতীয় ফুটবলে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। সমর ব্যানার্জী অলিম্পিকদলের এবং অরুণ ঘোষ ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। শৈলেন মান্না এবং অরুণ ঘোষ ইংল্যাণ্ড থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফুটবল প্রশিক্ষক হয়েছেন। মধ্য হাওড়ার জীবনকৃষ্ণ ঘোষ নামী ক্রিকেট আম্পায়ার।

অলিম্পিক সাতারু শচীন নাগ [শিবপুর], তীরন্দাজীতে প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ান চন্দ্রকুমার দাস, ভারত্তোলনে অর্জুন পুরস্কার প্রাপক লক্ষ্মীকান্ত দাস, প্রখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় বিশু ব্যানার্জী হাওড়ার অধিবাসী। চন্দ্রকুমার দাস রোম থেকে আন্তর্জাতিক কোচিং নিয়ে আসার পর এশিয়ান গেমস্-এ ভারতীয় দলের কোচ নিযুক্ত হয়েছেন।

বিশ্বনাথ সিং, সুনীল ঘোষ, সুনীল দেয়াশী, চঞ্চল পাল প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্র-শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবৎ হাওড়ায় এ্যাথলীট শিক্ষণে নিয়োজিত আছেন। এন. আই. এস কোচ অশোক নাগ ও নবম দাস এবং প্রখ্যাত খেলোয়াড় অশোক চট্টোপাধ্যায়, কীর্তিশ

বড়াল, অজিত দাস, অজয় দাস, অমর নাথ দে, শ্যামল দাস এবং রাম মিত্র তরুণদের প্রশিক্ষণে বিশেষ দায়িত্ব বহন করে চলেছেন।

হাওড়ার মহিলা এ্যাথলীটদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল—উমা দাস, কণিকা পল্লে্যা, নীতা দেয়াশী ও সুব্রতা দেবনাথ। অপেক্ষাকৃত তরুণ তরুণীদের মধ্যে কয়েকটি নাম হ'ল উলুবেড়িয়ার স্বপ্না সোম, বালীর রাখাল দে, চৈতালী দত্ত, দীপাল্লি রায় [মল্লিক], শুভাশ্রী গাঙ্গুলী, চন্দ্রা পাত্র, অপরেশ সরকার, শংকর দে।

রাইফেল ও গান ক্লাব—১০৮ জন সভ্য নিয়ে ২৮.৮.১৯৪৮ তারিখে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির পশ্চিম দিকে প্রতিষ্ঠিত হয় হাওড়া রাইফেল ক্লাব। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন—জেলা শাসক অথিক্রেম মজুমদার, পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেণ্ট বি. চ্যাটার্জী, পৌর-সভার চেয়ারম্যান শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার। এই জায়গাটি রাজ্যসরকার প্রস্তাবিত শরৎসদনের জন্য অধিগ্রহণ করায় ক্লাবটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে।

আজ আর নেই কিন্তু একদা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গান ক্লাবটির ছিল দাশনগরে। উদ্যোক্তা—দাশনগরের প্রতিষ্ঠাতা আলামোহন দাশের তিন পুত্র শিশির, প্রভাত ও রবীন দাশ। প্রভাতবাবুর তত্ত্বাবধানে এখানে স্কিট সুটিং-এর যন্ত্রপাতিও তৈরী হত।

শরীর চর্চা ও সমাজসেবা কেন্দ্র—শরীর চর্চার ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতি—১৮১, রামকৃষ্ণপুর লেন (১৯২৭), অন্ন-

পূর্ণা ব্যায়াম সমিতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ খ্রীঃ-এ রামকৃষ্ণপুর ব্যায়াম সমিতির বাদ্য বিভাগ গঠিত হয়। ১৯৭৬ খ্রীঃ-এ সমিতির চা঩জন সদস্য রূপকুণ্ড অভিযানে সাফল্য লাভ করেন।

হাওড়ায় সামরিক বাদ্যের প্রবর্তক—হাওড়া সেবা সংঘ। সংঘের সদস্যগণ ধনুবিদ্যার চর্চা এবং জিম্‌ন্যাসটিক প্রভৃতি শরীরচর্চা ও খেলাধূলাতেও অগ্রণী। সংঘের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হলেন স্বর্গত হরেন ঘোষ।

হাওড়া গ্রামাঞ্চলেও শরীরচর্চার অনেকগুলি কেন্দ্র আছে। এই প্রসঙ্গে খাসমহল বালিচকে সুনীল কুমার পাত্র প্রতিষ্ঠিত বালিচক যোগব্যায়াম মন্দিরের (১৯৫২) নাম উল্লেখ্য।

তাসের বাজীতে দেড়লাখ টাকা—তাসের প্রতিযোগিতা ব্রিজ এখন একটি আন্তর্জাতিক খেলা। হাওড়াতেও এ খেলার সমাদর খুব। বাবু কালচারের যুগে কলকাতায় তাসের বাজীর যে খেলাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার নাম প্রমারা। সালকিয়ার বিখ্যাত ধনী রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রমারা নামক তাসের বাজীর খেলার অনুরক্ত। বর্ধমান রাজ তেজচাঁদ সালকিয়াতে রাধামোহনবাবুর বাড়ীতে প্রমারা খেলতে আসতেন। তাঁদের খেলায় একদিন বাজীর ডাক ওঠে দেড়লাখ টাকা। বর্ধমানরাজ খেলায় জিতে হাওড়া থেকে দেড়লাখ টাকা বর্ধমানে নিয়ে যান।

প্রসঙ্গক্রমে বলি—দেড়লাখ টাকা হেরে রাধামোহনের আর্থিক অবস্থা কতখানি শোচনীয় হয়েছিল তা জানা না গেলেও এই খেলায় সর্বস্বান্ত হন কলকাতার শ্যামবাজারের নবীন বসু, যিনি মাহেশের রথের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পৌত্র। ইনি বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রেও এক স্মরণীয় পুরুষ।

সার্কাস

এখন যেখানে হাওড়া বাসষ্ট্যাণ্ড আগে সেখানে শীতকালে পড়ত সার্কাসের তাঁবু, এখন বসে গোলমোহর মাঠে।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা, হাওড়া চ্যাপেলের মিশনারী মিঃ উইলিয়াম কেরী গ্রামাঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য গিয়ে দেখেন ডিঙ্গাখোলা গ্রামের মেলায় সার্কাসের তাঁবুর সামনে প্রচণ্ড ভীড়। প্রবেশ মূল্য—মাত্র এক পয়সা।

যাদুবিদ্যা

একই আসরে ছোট ও বড় পাশাপাশি বসে অবসর বিনোদন করতে পারেন একমাত্র যাদুবিদ্যার প্রদর্শনী দেখেই। যাদুবিদ্যার চর্চ্চায় খুব বেশী সাফল্য দেখাতে না পারলেও অতীতে ও বর্তমানে অনেক হাওড়াবাসীই বিদ্যাটির চর্চা করে থাকেন।

হাওড়া ম্যাজিসিয়ান ক্লাবের ঠিকানা—১৭ কে. পি. কুমার ষ্ট্রীট, বালী। প্রতিষ্ঠাতা—সভাপতি—কানাইলাল কুমার [১৯২০-২৯.৭.৭২]। যাদুবিদ কানাই কুমার ভোজরাজ নামে আখ্যাত

ছিলেন। ক্লাবের বর্তমান সভাপতি—যাদুকর কুবের হাজরা।

প্রবীণদের মধ্যে শম্ভু রায়, এস ব্যানার্জী, দিলীপ সেন শর্মা, মনোরঞ্জন ঘোষ, এস. মজুমদার, ভোলা অধিকারী এবং নবীনদের মধ্যে তন্ময় কর্মকার, লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা যাদুবিদ্যা প্রদর্শনে সুনাম অর্জন করেছেন। তরুণ নয়নরঞ্জন বিশ্বাস এখন আর ম্যাজিক দেখান না, শুধু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ম্যাজিকের কলা-কৌশল বিষয়ে লেখেন।

হাওড়া জনজীবনের নানাক্ষেত্রে প্রভাববিস্তারকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা।

১। রামকৃষ্ণপুর সংসদ—১৯০, রামকৃষ্ণপুর লেন। প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন—নৃসিংহ বসু।

২। হাওড়া সেবা সঙ্ঘ—৩৩/১ এবং ১২৩ নরসিংহ দত্ত রোড, ১৯২৩।

৩। তরুণ সঙ্ঘ—বাকসাড়া, জগাছা—১৯২৪।

৪। হাওড়া সঙ্ঘ—২৫/১, নীলমণি মল্লিক লেন, ১৯২৫।

৫। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম—৪, নস্কর পাড়া লেন।

৬। হাওড়া নর্থ ক্লাব—২৪, সুবার্বণ পার্ক রোড, ১৯২৮।

৭। বালক সঙ্ঘ—৭৬, কাসুন্দিয়া রোড, ১৯৩১।

৮। ব্যাঁটরা ব্যায়াম সংঘ—১৯, শরৎ চ্যাটার্জী লেন, ১৯৩৫।

৯। সালকিয়া তরুণ দল—১৯, সালকিয়া স্কুল রোড, ১৯৩৬।

১০। মহিয়াড়ী বান্ধব সমিতি, থানা-ডোমজুড়, ১৯৩৮।

১১। হাওড়া ডিষ্ট্রিক্ট ওয়েট লিফটারস্ এণ্ড বডি বিল্‌ডার্স এসোসিয়েশন—৩৭, রাজবল্লভ সাহা লেন, ১৯৩৯।

১২। দেশ গৌরব সেবা ও সংস্কার সমিতি—১৬/১, সিদ্ধেশ্বরীতলা লেন।

১৩। মাতৃ সমিতি—১০২/১, কাসুন্দিয়া রোড, ১৯৪১।

১৪। আনন্দ সম্মিলনী—৪৩, চন্দ্রকুমার ব্যানার্জী লেন, শিবপুর, ১৯৪২।

১৫। বাণী মন্দির—আমতা, ১৯৪৬।

১৬। সংগ্রামী দল—৬/৩, শ্রীবাস দত্ত লেন, ১৯৪৬।

১৭। শিবপুর তরুণ ব্যায়াম সমিতি, ১৯৪৭।

১৮। বীণাপাণী সংঘ, বামুনপাড়া, জগৎবল্লভপুর, ১৯৪৭।

১৯। কানপুর সেবা সংঘ—কানপুর, আমতা, ১৯৫১।

২০। গান্ধী স্মারক নিধি—দূর্গাপুর, আমতা, ১৯৫৩।

২১। জগাছা মহিলা সমিতি—১৯৫৩।

২২। সরোজিনী শিল্পমন্দির—৫৭, বাকসাড়া রোড, ১৯৫৯।

২৩। সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র—মাকড়দহ—১৯৬১

২৪। রাজগঞ্জ মহিলা সমিতি—১৯৬৪

২৫। হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ-২০, শিবপুর রোড, ১৯৬৮

২৬। বালী মারুতি ব্যায়াম বিদ্যালয়—৩, শ্যাম সুন্দর ঘোষ লেন, বালী।

২৭। অসহায় বান্ধব গীতা আশ্রম—জগাছা।

২৮। বিশ্ব কল্যাণ সংঘ—৪৬/১/১, রামকৃষ্ণপুর লেন।

২৯। বঙ্গীয় সমাজসেবী পরিষদ—৩৯০-এ ধর্মতলা লেন।
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক—শ্রীহৃষীকেশ ঘোষ।

৩০। শ্রীঅরবিন্দ সাধক সংঘ—৪/১, রামমোহন
মুখার্জী লেন।

৩১। হাওড়া সায়েন্স এসোশিয়েশন
২৮০/১ নেতাজী সুভাষ রোড।

৩২। ব্যাঁটরা অনাথবন্ধু সমিতি—বৃন্দাবন মল্লিক লেন [১৯১২ খ্রীঃ-এ প্রতিষ্ঠিত ব্যাঁটরা হিতসাধিনী সমিতির পরিবর্তিত নাম]।

৩৩। হাওড়া মেডিকেল ক্লাব—৩/২ চার্চ রোড।

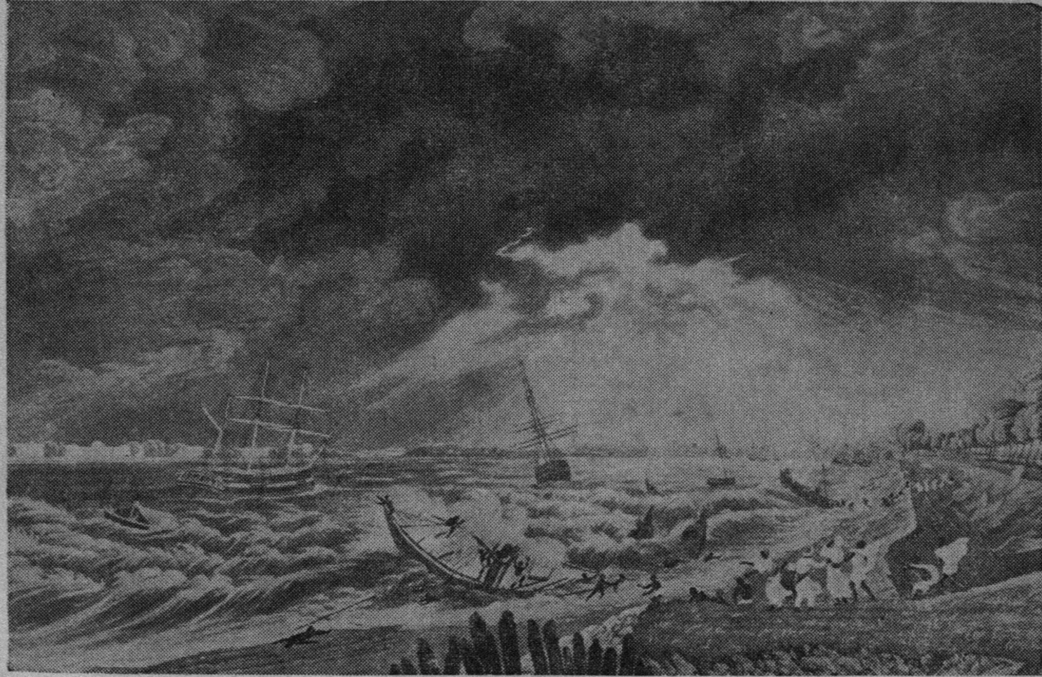
৩৪। হাওড়া লায়ন্স ক্লাব।

সংযোজন

১৬৬ পৃষ্ঠায় হাওড়া শহরের বাহিরের কলেজগুলির তালিকায় উলুবেড়িয়া কলেজ ('৪৮-৪৯), বাগনান কলেজ ('৫৮) এবং শ্যামপুর সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয় ('৬৪)-এর নাম যুক্ত হইবে।

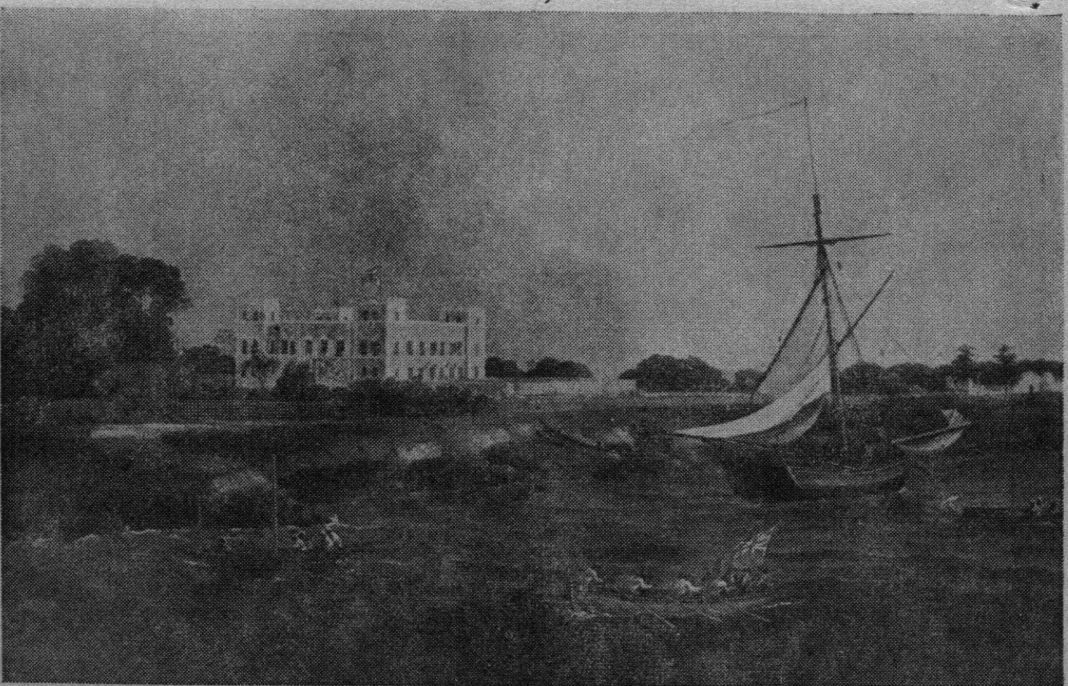
বিদেশীর দৃষ্টিতে

হাওড়া



সালকিয়া'র গঙ্গার তীর

এন্‌গ্রেভিং—জেমস্ ফ্রেজার [আঃ ১৬৭৫ খৃঃ]



মিলিটারী অরফ্যান হাউস, হাওড়া

অয়েল পেন্টিং—টমাস্ ড্যানিয়েল [১৭৮৭ খৃঃ]



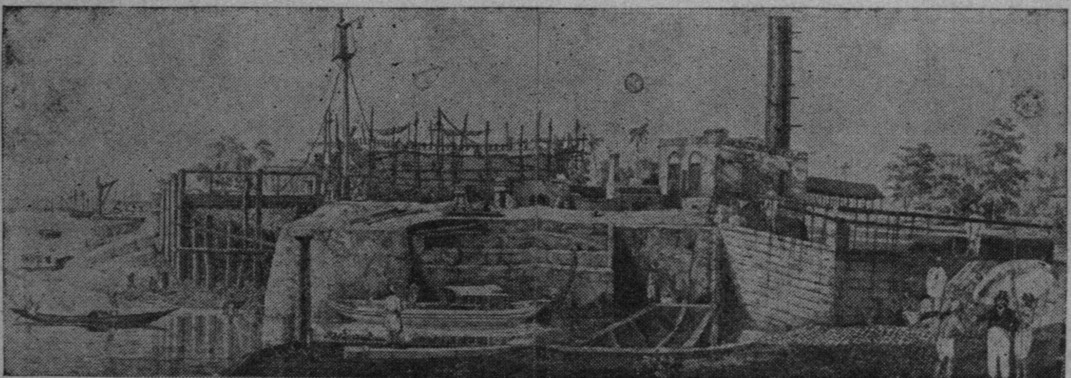
বোটানিক গার্ডেন হাউস। এন্‌গ্রেভিং—জেমস্‌ ফ্রেজার [আঃ ১৬৭৪ খৃঃ]



বিশপস্ কলেজ — চার্লস ড'য়েলী [আঃ ১৮৪৮ খৃঃ]



হাওড়ার মাড ডক। স্কেচ চার্লস ড'য়েলী [আঃ ১৮৩৫ খৃঃ]



হাওড়া ডক ইয়ার্ড—চার্লস ড'য়েলী [আঃ ১৮৩৫ খ্রীঃ]



শিবপুর গ্রাম—চার্লস ড'য়েলী [আঃ ১৮৪৮ খ্রীঃ]